হৃষীকেশ সিরিজ নং ১৮

বঙ্গ পরিচয়

প্রথম খণ্ড

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা ৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে
শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মূল্য—২॥০ টাকা

উৎসর্গ-পত্র

ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা
মহাশয়ের করকমলে

লক্ষ্মীর যাঁরা বরপুত্র, দেখ্‌তে পাই, মা সরস্বতী তাঁদের প্রতি বিমুখ। মা সরস্বতী যদি বা কা'কেও কৃপা করেন, তা'হলে মা লক্ষ্মী তাঁর দিকে তাকান না। কিন্তু আপনার বেলা, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি—

"বাঁধা প'ল এক মাল্য বাঁধনে লক্ষ্মী সরস্বতী"।

সার্থক হয়েছে ধন, সার্থক হয়েছে জ্ঞান।

ইতি—
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন
১১ই শ্রাবণ ১৩৪৩

ভূমিকা

'ভারত পরিচয়ে'র প্রথম সংস্করণ যখন হৃষীকেশ সিরিজ হইতে প্রকাশিত হয়, রবীন্দ্রনাথ বইখানির অধিকাংশই পাঠ করিয়াছিলেন। নানা স্থানে টিপ্পনী ও মন্তব্য লিখিয়া লেখককে বঙ্গদেশ সম্বন্ধে সবিস্তারে একখানি অনুরূপ গ্রন্থ লিখিবার জন্য বলেন। মাঝে মাঝে তিনি 'বঙ্গ পরিচয়ে'র জন্য তাগিদও দিয়াছেন; এতদিন পরে তাঁহার ইচ্ছা পূরণ করিতে পারিলাম বলিয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি। তবে সুবৃহৎ গ্রন্থ লেখা এক জিনিষ ও তাহাকে প্রকাশ করা আর এক ব্যাপার। সুহৃত্তম ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের সহায়তা ব্যতীত এ গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে পারিত না। সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার মত ভাষা আমার নাই। এই গ্রন্থ প্রকাশের প্রধান উদ্যোগী হইতেছেন ডক্টর নলিনাক্ষ দত্ত মহাশয় এবং সহায় হইয়াছেন শ্রীসুধাকান্ত দে মহাশয়। সুধাকান্তবাবু ও প্রিয়নাথ দাশ মহাশয় গ্রন্থখানির সমুদায় প্রুফ ও ভুলভ্রান্তি খুঁটিনাটি দেখিয়া দিয়া আমাকে সবিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে বাঁধিয়াছেন। গ্রন্থের দুইটি প্রবন্ধ—'বাঙলার ভূ-তত্ত্ব' ও 'বাঙলার নৃ-তত্ত্ব'—শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার বসু কর্তৃক লিখিত। আমার পরম দুর্ভাগ্য বহু চেষ্টা ও অনুরোধ করিয়া অপর বন্ধুদের কট কোনো প্রকার সহায়তা লাভ করিতে সক্ষম হই নাই; পাইলে অবশ্যই খানি সর্বাঙ্গসুন্দর হইত; কারণ এই গ্রন্থে যে বিচিত্র বিষয়ের আলোচনা ছে, তাহা একজন লেখকের হস্ত হইতে নিখুঁতভাবে আশা করা কঠিন।

বইখানিতে নানা বিষয় আলোচিত হইয়াছে। তবে আরও অনেক বিষয় তে পারিত; কিন্তু এবার তাহা সম্ভব হইল না। বইখানির বানানের আমি দায়ী। দ্বিত্ব সমস্তই বাদ দিয়াছি, ধর্ম, কর্ম 'সূর্য' 'পর্যন্ত' এইরূপ য়াছি। 'বর্দ্ধমান' স্থানে 'বর্ধমান' দিয়াছি; তবে 'ঊর্ধ্ব-র' তলার ব-ফলা খিয়াছি।

গ্রন্থখানিকে তাড়াতাড়ি প্রকাশ করিবার জন্য প্রথমার্ধ এক খণ্ডে প্রকাশ করিলাম। দ্বিতীয় খণ্ডের পত্রাঙ্ক সমানে চলিবে। সুতরাং বইখানি সম্পূর্ণ

হইলে, পাঠকগণ একত্র বাঁধাইয়া ফেলিতে পারিবেন। সেই সময়ে সূচীর অবশিষ্টাংশ ও নির্ঘণ্ট বা Index দেওয়া হইবে। গ্রন্থের অপরাংশ প্রেসে রহিয়াছে এবং সত্বর প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করি।

পাঠকগণকে অনুরোধ, তাঁহারা যেন ভুল-ত্রুটিগুলি আমাকে জানান, যাহাতে দ্বিতীয় সংস্করণ করিবার সৌভাগ্য হইলে ভুল-ত্রুটিগুলি শুধরাইতে পারি।

দেশভক্তি আমাদের কাছে উচ্ছ্বাসের বিষয়; উচ্ছ্বাস আবেগ ক্ষণস্থায়ী। দেশ সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানের উপর দেশ-প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। বাঙলা-দেশ সম্বন্ধে সাধারণ লোকের জ্ঞান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। দেশকে ভাল করিয়া জানিবার জন্যই এই গ্রন্থ রচনা। আমরা Indian Economics পড়ি—সেখানে যেসব তত্ত্বকথা পাই বাঙলাদেশ সম্বন্ধে সেকথাগুলি প্রয়োগ করিতে পারি না। এ গ্রন্থে বাঙলাদেশকে সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে পৃথক্‌ভাবে ও অন্যান্য প্রদেশের সহিত তুলনামূলকভাবে বিচার করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বাঙালী পরপ্রদেশে লাঞ্ছিত, নিজদেশে সে পদে পদে পরাভূত; তাই বাঙালীর নিজ দেশকে খুব ভাল করিয়া জানিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। আজ বিহারে রব উঠিয়াছে Bihar for Biharis, আসামে উঠিয়াছে Assam for Assamese, উড়িষ্যায় সেই বাণী আজ ঘোষিত হইতেছে। অথচ বাঙলাদেশে সে বাণী উঠিতেই পারে না; তার কারণ বাঙালীর উদারতাও বটে, ঔদাসীন্যও বটে; সর্বোপরি শারীরিক শ্রম-বিমুখীনতা ইহার জন্য দায়ী। শহরের ব্যবসাদার, কলকারখানার মজুর, কলিকাতার বাস্ ট্যাক্সি-চালক, নদীর মাঝিমাল্লা, সবই পরদেশী। বাঙলার কৃষিসম্পদ্ আজ যে রক্ষা পাইতেছে তাহা সাঁওতাল শ্রমিকদের কৃপায়—অথচ এবার দেখিলাম তাহারা কি ভয়া[illegible] বঞ্চিত। সাঁওতাল ত' পরদেশী, তার ভাষা ধর্ম সব আলাদা; অথচ তা[illegible] আমরা পরদেশী বলিয়া দূর করিব—একথা আজ বলিতে পারি না। কা[illegible] তাহাকে আমরা exploit করিতেছি এবং সে নীরব। অন্য প্রদেশের পরিশ্র[illegible] লোকেরা আজ আমাদের exploit করিতেছে বলিয়া আমরা সজাগ হ[illegible] উঠিতেছি এবং অ-বাঙালী ধনিক, শ্রমিক, মহাজন সম্বন্ধে সজাগ হ[illegible] উঠিয়াছি। কিন্তু দিন আসিবে যখন এই সাঁওতালরাও সজাগ হইয়া exploit[illegible] হইতে আর রাজি হইবে না; তখন সমস্যা আরও জটিল হইবে।

শ্রম ও ধন বিষয়ে যেমন বাঙালীর সম্মুখে সমস্যা, জ্ঞান ও বিদ্যা সম্বন্ধেও তেমনি সমস্যা তাহার সম্মুখীন। বিদ্যার ক্ষেত্রে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান এক কণ্ঠে বলিতে পারিতেছে না যে, বাঙলা ভাষাই বাঙালীর একমাত্র ভাষা। অথচ রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় জোর করিয়া স্থির করিয়াছেন যে ইংরেজই হৌক, আর ভারতীয়ই হৌক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে হইলে বর্মী ভাষা জানা আবশ্যক। বর্মী ভাষায় পাশ না করিলে সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। বাঙালীর বিশ্ববিদ্যালয় জোর করিয়া বলিতে পারেন না, বাঙলাই পড়িতে হইবে।

এইভাবে জীবনের প্রত্যেক কোঠায় আমরা হার স্বীকার করিতেছি। বাঙালার কারবারের মূলধনের মালিক বা পরিচালকগণ বিদেশী অথবা পরদেশী। খুব কম জায়গায় তাঁহাদের দেশীয় লোকের প্রতি প্রীতি বা শ্রদ্ধা আছে। বর্তমানে ধনিকদের ধনাগম নির্ভর করে efficiencyর উপর; অর্থাৎ প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইবার জন্য কত কম পয়সায় কত বেশী কাজ শ্রমিকের কাছ হইতে আদায় করা যায় তার উপর। মুনফার অঙ্ক বেশি করিয়া অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন করা হইতেছে বর্তমান ধনতন্ত্রবাদের মূলকথা। সেই উপলক্ষে বাঙলার কলকারখানায় বাঙালী নির্বাসিত। অধিকন্তু পরদেশী লোকের জীবনযাত্রার আদর্শ বাঙালীর মতো নয়; তাহারা অল্প পারিশ্রমিকে অধিক শ্রম করিতে রাজী; অস্বাস্থ্যকর অসুন্দর পারিপার্শিক তাহাদের তত পীড়া দেয় না; সুতরাং efficiencyর অজুহাতে কম মজুরীতে পরদেশী শ্রমিক আমদানী করা বিদেশী ধনিকদের পক্ষে স্বাভাবিক; কারণ, দেশ ও দেশবাসী তাহাদের কাছে অবাস্তব; ধনোপার্জনই একমাত্র কাম্য। তবে যেখানে বাঙালী শ্রমিকরা কলকারখানার কাজে লাগিয়াছে—সেখানে তাহারা সাধারণত সুখ্যাতিই অর্জন করিয়াছে।

বাঙালীর সম্মুখে অসংখ্য সমস্যা; তাহার সমাধান বাঙালীকেই করিতে হইবে। এই গ্রন্থে বাঙলাকে একটি রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছি; সে রূপে শরীর-তত্ত্ববিদের বিশ্লেষণ প্রকাশ পাইয়াছে; শিল্পীর রূপসৃষ্টি হয় নাই।

বাঙালী ষ্ট্যাটিষ্টিকস্ ঘাঁটিতে চায় না; অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার-সম্পাদিত এবং ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা-পরিচালিত 'আর্থিক উন্নতি' এ বিষয়ে

বাঙালীকে অনেকটা তৈয়ারী করিয়াছে। বাঙালী উচ্চ সংখ্যাতত্ত্ব আলোচনায় মন দিয়াছে,—তাহার প্রমাণ অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের চেষ্টায় Statistical Society স্থাপন। সংখ্যাতত্ত্বের দ্বারা দেশের অবস্থা যত বিশদরূপে জানা যায়, এমন বোধ হয় আর কোনো বিজ্ঞানের দ্বারা হয় না।

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বাঙালী জীবনের প্রগতি নানাভাবে আলোচনা করিয়াছেন; তাঁহার মন ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক স্বাদেশিকতার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে; তিনি বাঙালী যুবককে নানাভাবে সচল করিবার চেষ্টা করিতেছেন—সেজন্য দেশবাসী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। বাঙালী কতখানি বাড়তির পথে চলিয়াছে, সে-সম্বন্ধে হয়ত মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহার কথাকে হঠাৎ উড়াইয়া দেওয়া কঠিন। বাঙালী চাষী ও শ্রমিকের দশা যে আজ কি দাঁড়াইয়াছে—তাহা গবর্মেণ্টকেও ভাবাইয়া তুলিয়াছে। বহু শতাব্দীর অবহেলায় তাহারা আজ এমন জীর্ণ হইয়াছে যে, আজ জমিদার ও গবর্মেণ্ট আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন, কারণ স্বর্ণপ্রসবিনী হংসী আর বুঝি স্বর্ণ ডিম্ব প্রসব করিবে না বলিয়া সকলে সন্দেহ করিতেছেন।

আজ সর্বত্র গণশক্তি জাগিতেছে, বাঙলার প্রজাশক্তি নীরব নহে; আজ যাহা Communalism তাহা Communism-এর আকার ধারণ করিতে পারে—একথা ধনিক জমিদার, বণিক্ কলওয়ালা, বণিক্ মহাজন ভাবিতে পারিতেছেন না। শুভবুদ্ধি, সর্বজন কল্যাণ চিন্তা দেশকে রক্ষা করিবে। গবর্মেণ্টের সহানুভূতি ও ধনিকদের স্নেহ দেশকে কল্যাণের পথে লইয়া যাইবে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

বিষয়		পত্রাঙ্ক
একাদশ পরিচ্ছেদ		
প্রবাসী ও 'পরদেশী'	...	৬৬-৭০
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ		
স্বাস্থ্য ও ব্যাধি	...	৭১-৭৪
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ		
শহর ও গ্রাম	...	৭৫-৮০
চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ		
বাঙলার উপজীবিকা	...	৮১-৯৩
কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে নিযুক্তের অনুপাত	...	৯২
কৃষি ও শিল্পে নিযুক্ত অধিবাসীর অনুপাত	...	৯৩
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ		
অক্ষম ও অকর্মণ্য	...	৯৪-৯৬
ষোড়শ পরিচ্ছেদ		
বাঙলার সমাজ	...	৯৭-১১৩
বাঙলার বর্ণ	...	১০৫
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ		
বাঙলার ইতিহাস	...	১১৪-১৩৫
বাঙলার ফোর্ট উইলিয়মের গবর্ণরগণ	...	১২৭
বাঙলার ফোর্ট উইলিয়মের গবর্ণর-জেনারেলগণ	..	১২৮
ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারেলগণ	...	১২৯
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ		
বাঙলায় জাতীয় জীবন	...	১৩৬-১৪২
ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ		
বাঙলার শিক্ষা	...	১৪৩-১৮০
শিক্ষামন্ত্রী	...	১৪৭
ডিরেক্টর অব্ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন	...	১৪৭

বিষয়		পত্রাঙ্ক

বিষয় | পত্রাঙ্ক

বিষয় | পত্রাঙ্ক

দ্বিতীয় খণ্ডে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইবে :

দ্বিতীয় খণ্ড

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

আয়-ব্যয়ের ইতিহাস ; বাঙালাদেশের সরকারী আয় ; বাঙলার রাজস্ব ;

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বাঙলার আয় ; কেন্দ্রীয় আয় ; শুল্ক ; আয়কর ; লবণ কর ; বাঙলাদেশের লবণ কর হইতে আয় ১৮৮১-১৯৩৩ পর্যন্ত ; প্রাদেশিক আয় ; আবগারী ; ষ্ট্যাম্প ; বনভূমি ; রেজিষ্ট্রেশন ; শেড্যুল ট্যাক্স ; বাঙলাদেশের আয় ১৮৮১—১৯১২ ; বাঙলাদেশের আয় ১৯১১-১৯২১ ; বাঙলাদেশের আয় (বিস্তৃত) ১৯২১-১৯৩২ ।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বাঙলার ব্যয় ; ১৮৮১—১৯৩১ সন পর্যন্ত ব্যয় ; সাধারণ শাসনের ব্যয় ১৯৩০-৩১, ১৯৩২-৩৩ ।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কৃষি ও শিল্প (১) ; বাঙলার কৃষি ও শিল্প : ধান্য ।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কৃষি (২) ; তৈলবীজ ; ফলের চাষ ; চিনি ও গুড় ; তুলা ; তামাক ; গাঁজা ; চা ।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

গৃহপালিত পশু ; গোপালন ; হাঁস ও মুর্গী পালন ।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পাট চাষ ও পাট শিল্প ।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বয়ন শিল্প ; ভারতবর্ষে কাপড়ের কলের সংখ্যা ; বাঙলার কাপড়ের কল ।

বঙ্গ পরিচয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাঙলাদেশ

ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত প্রধান দশটি প্রদেশের অন্যতম হইতেছে বঙ্গদেশ। মানচিত্রে বঙ্গদেশের যে-ছবি আমরা আজ দেখিতেছি, বরাবর তাহার সে-রূপ ছিল না। প্রাচীনকালে বঙ্গ বলিতে বুঝাইত পূর্ববঙ্গ; উত্তরবঙ্গের নাম বরেন্দ্রভূমি বা বারীন্দ,—গৌড় নামেও পরিচিত ছিল; পশ্চিমবঙ্গের নাম ছিল রাঢ়; মধ্যবঙ্গকে বলিত বাগ্ড়ী। এই নামগুলিও যে সর্বদা প্রচলিত ছিল, তাহাও নহে। মুসলমান যুগে সমগ্র দেশের নাম হয় 'বঙ্গল', তাহা হইতে ইংরেজি হইয়াছে 'বেঙ্গল'। 'বঙ্গল' দেশের অধিবাসীকে 'বঙ্গাল' বলিত, সেই শব্দ হইতে বাঙালী হইয়াছে।

আমরা বাঙালী, বাঙলা দেশ আমাদের দেশ; হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান, আদিম—যে-কেহ বাঙলা ভাষা বলে, বাঙলা সাহিত্যকে সমাদর করে, বাঙলাদেশকেই নিজের একমাত্র দেশ বলিয়া স্বীকার করে ও এই দেশের রাজনৈতিক ও আর্থিক স্বার্থ যাহার জীবনে চরম—সেই বাঙালী।

ভারতবর্ষের কোনো প্রদেশই একটি জাতি বা একই ভাষাভাষী জাতির দ্বারা গঠিত হয় নাই। কংগ্রেস ভাষাগতভাবে ভারতের প্রদেশগুলিকে ভাগ করিবার জন্য বহুকাল হইতে আন্দোলন করিতেছেন, কিন্তু তাহা এ-পর্যন্ত হইয়া উঠে নাই; বর্তমানে সিন্ধু ও উড়িষ্যাকে পৃথক প্রদেশ করা হইয়াছে। বাঙলাদেশ ও বাঙলাভাষাভাষীর বাঙলাদেশ এক নহে। রাজনৈতিক বঙ্গদেশের উত্তরে নেপাল, সিকিম, ভুটান; পূর্বদিকে আসাম, ব্রহ্মদেশ; পশ্চিমে বিহার-উড়িষ্যা-প্রদেশ। এখন এই যে চিহ্নিত রাজনৈতিক সীমানা হইয়াছে, ইহার বাহিরে বাঙালী আছে, সুতরাং বাঙলাদেশও

আছে। আসামের অন্তর্গত সুরমা উপত্যকায়—শ্রীহট্ট ও কাছাড়—সম্পূর্ণরূপে বাঙালীর বাস; বাঙলাদেশের উত্তর-পূর্ব কোণে গোয়ালপাড়া জেলার বাসিন্দা বাঙালী। পশ্চিমদিকেও তেমনি করিয়া বাঙলাকে কাটিয়া বিহার ও ছোটনাগপুরের মধ্যে ঠাসিয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ণিয়া জেলার পূর্বাঞ্চল, সাঁওতাল পরগণার অনেকখানি, মানভূম ও সিংভূম জেলা বাঙলারই অন্তর্গত। প্রাচীনকালের মিথিলার আরম্ভ দ্বারবঙ্গ হইতে; মৈথিলীরা বাঙালীই ছিল; তাহার অন্যতম প্রমাণ, বাঙালী ও মৈথিলী ব্রাহ্মণ ছাড়া মাছ কোনো ব্রাহ্মণে খায় না। মৈথিলী লিপি হিন্দী নহে, উহা সম্পূর্ণরূপে বাঙলা; ইহাদের ভাষা ও পূর্ণিয়া-মালদহের ভাষার মধ্যে পার্থক্য কম। বিহারের অন্তর্গত হইয়া তিরহুত বা মিথিলা এখন হিন্দীভাষী হইয়া যাইতেছে। সাঁওতাল পরগণায় সাঁওতালরা আসিয়াছে ১৮শ শতাব্দীতে; তৎপূর্বে ইহার অনেকখানি বীরভূম রাজ্যের অন্তর্গত ছিল; এখনো সাঁওতাল পরগণায় বাঙলা ভাষাই বেশি চলে। মানভূম ও সিংভূমেও বাঙলা ভাষা চলে। কথিত আছে, বীর মানসিংহ যখন বাঙলাদেশ জয় করেন, তাঁহার নামের অংশ লইয়া বীরভূম, মানভূম ও সিংহভূমের নামকরণ করা হয়। মোট কথা, বর্তমান রাজনৈতিক বাঙলাদেশ হইতে বাঙালীর বাঙলা বৃহত্তর।

বাঙলাদেশ নদীমাতৃক, অর্থাৎ এদেশের ধন ও প্রাণের নির্ভর নদীর উপর। ইহার উত্তরে হিমালয়, পশ্চিমে ছোটনাগপুরের পার্বত্য মালভূমি, পূর্বদিকে লুসাই প্রভৃতি পর্বতশ্রেণী বর্মা ও ভারতের মাঝে খাড়া। এই তিন দিক হইতে নদী বহিয়া বাঙলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ইহাদের প্রধান হইতেছে পূর্ববাহিনী গঙ্গা ও পশ্চিমবাহিনী ব্রহ্মপুত্র। গঙ্গা পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে বহিয়া আসিয়া বাঙলাদেশে রাজমহল পাহাড়ের পাশ দিয়া ঘুরিয়া দক্ষিণবঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে। ব্রহ্মপুত্রও তেমনি পূর্বদিক হইতে পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়া আসিয়া গারো-খাসি পাহাড় ঘুরিয়া দক্ষিণ দিকে নামিয়া আসিয়াছে। পণ্ডিতদের কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এককালে রাজমহল পাহাড় খাসিয়া পাহাড়ের সহিত যুক্ত ছিল; অতীত কোন যুগে ভূমিকম্পের ফলে বরেন্দ্রভূমির পাহাড় মাটির তলায় চলিয়া যায় ও হিমালয় হইতে নির্গত নদীসমূহের পলিমাটিতে দহ-পড়া জমিগুলি ভরাট হয়।

নদীর গতি চিরদিন সমভাবে চলে না; এবং ইহার গতির উপর নির্ভর করে স্থান-বিশেষের স্থিতি বা অবনতি। এককালে গঙ্গার প্রধান খাদ ছিল ভাগীরথী এবং বোধহয় তাহার বিপুল জলরাশিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য হিন্দু রাজারা খাল কাটিয়া দিতেন। রাজা সগরের গঙ্গা-আনয়ন উপাখ্যানের মধ্যে সেই ইঙ্গিতটি আছে। বর্তমানে ভাগীরথী ও সেই সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের অনেক নদী মজিয়া আসিতেছে; গঙ্গার অধিকাংশ জল ছুটিয়াছে পদ্মার খাদ দিয়া। সেখানে সে প্রলয়ঙ্করী মূর্তি ধরিয়া চলে; তাহার প্রতাপে চারকোটী টাকা খরচ করিয়া তৈয়ারী হার্ডিঞ্জ ব্রীজ আজ কাঁপিতেছে। এই নদীর জল নিকাশের খাদ পরিবর্তিত হওয়ায় দক্ষিণবঙ্গ জলাভাবে কষ্ট পাইতেছে, আবার মধ্যবঙ্গ অতিরিক্ত জলের জন্য উপদ্রুত হইতেছে। পদ্মা ছাড়া মধুমতী দিয়া অনেকখানি জল নির্গত হয়; ইহা ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জেলার পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত। ব্রহ্মপুত্র পূর্বে যাইত মৈমনসিংহের মধ্য দিয়া; এখন সে বহিতেছে ঐ জেলার পশ্চিম দিয়া। ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা মিশিয়াছে গোয়ালন্দের কাছে। মেঘনা পূর্ববঙ্গের নদী; শ্রীহট্ট, কাছাড়, মৈমনসিংহ, ত্রিপুরা ও ঢাকা জেলার জলরাশি সুরমা, বরাক, ধলেশ্বরী প্রভৃতি নদী দিয়া আসিয়া মিশিয়া মেঘনা নাম লইয়াছে। মেঘনার মোহনা সমুদ্রের মত বিশাল।

উত্তরবঙ্গের নদীগুলি হিমালয় হইতে উঠিয়াছে। তিস্তা অত্যন্ত খরস্রোতা; পূর্বে উহার জল পদ্মায় আসিয়া পড়িত; হঠাৎ গতি পরিবর্তন করিয়া ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। উত্তরবঙ্গের অন্যান্য নদীগুলির মধ্যে আত্রাই, যমুনা, নাগর উল্লেখযোগ্য। কিন্তু নানা অস্বাভাবিক উৎপাতে উত্তরবঙ্গের নদীগুলি দেশের লোকের কালস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে; অথচ সেগুলি লোপ পাইলেও দেশের সর্বনাশ।

পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলি সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। ইহাদের উৎপত্তি তুষারাবৃত পর্বতে নহে; ছোটনাগপুরে উচ্চ পর্বতও নাই, পূর্ববঙ্গের ন্যায় বৃষ্টিবহুল দেশও নহে। বৎসরের মধ্যে নয় মাস এদেশের নদীগুলি থাকে শীর্ণ, হাঁটিয়া পার হওয়া যায়; কিন্তু বর্ষার সময় কয়েক ঘণ্টা বা দিনের জন্য প্রলয়ঙ্করী রূপ গ্রহণ করে; ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর ও রূপনারায়ণ এই শ্রেণীর নদী। সঙ্গমের

কাছে কোনো কোনো নদীর জলে নৌকা চলে; তাহা না হইলে ইহারা নৌ-অত্যার্য্য। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, এগুলি বৃষ্টির জল যাইবার নিমিত্ত প্রকৃতির নালা।

দক্ষিণবাঙলা পদ্মা, ভাগীরথী ও মেঘনা দিয়া ঘেরা। ইহার মধ্যে অসংখ্য নদ, নদী খাল, বিল, দহ। শিলাইদহ, খড়দহ, পোড়াদহ, শিয়ালদহ, কালীদহ প্রভৃতি স্থানগুলি এককালে 'দোয়া'-পড়া জায়গা ছিল বলিয়া অনুমান হয়। দক্ষিণবঙ্গের উত্তরাংশ যশোহর, নদীয়া, খুলনা, ২৪-পরগণায় মানুষ বহুকাল হইতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে; বর্তমানে আরও দক্ষিণে মানুষ চলিয়াছে; এই জায়গাটিকে বলে 'সুন্দরবন'; আসলে সুঁদরি গাছ আছে বলিয়া ইহার নাম সুঁদরিবন।

বাঙলাদেশ সমতল-ভূমি। হিমালয়ের পাদমূলে সিলিগুড়ি সমুদ্রতল হইতে ৩০০ ফিট্ উচ্চ। কলিকাতার দক্ষিণে উচ্চতা মাত্র ১০।১২ ফিট্। নদীগুলি সমতল ভূমিতে আসিয়া এমনি ক্ষীণস্রোতা হইয়া পড়ে যে স্বল্প বাধা পাইলেই উহারা চর বা দ্বীপ গঠন করিতে থাকে। এই চর পড়িয়া পড়িয়া দক্ষিণবাঙলা গড়িয়া উঠিয়াছিল ও সুন্দরবন গড়িয়া উঠিতেছে। একদিকে পূর্ববঙ্গের নদীগুলিতে প্রতিবৎসর নূতন চর পড়িতেছে, অপরদিকে প্রাচীন গ্রামজমি ধ্বংস হইতেছে।

পূর্বে বাঙলার নদনদীর বহতা যেমন সহজ বাধাহীন ছিল, বর্তমানে সেরূপ নাই, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। ইহার প্রধান কারণ উপযুক্ত পরিমাণ জল নিকাশের পথ না রাখিয়া মাটি উঁচু করিয়া রেলপথ নির্মাণ। উত্তরবঙ্গে বর্ষাকালে প্রথমত নদীর জল বাড়ে, তারপর বৃষ্টির জল দেশময় যাহা পড়ে, তাহাও নির্গত হইবার পথ খোঁজে। পূর্বে নদীর বাঁধ, রেলের বাঁধ না থাকায় এই জল সহজভাবে দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইত; বাঁধের বাধা পাইয়া জল সঞ্চিত হয় ও বাহিরে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে; সেই সময় বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায় ও বন্যা হয়; অথবা প্রচুর বা অতিরিক্ত বৃষ্টি হইলে সারি সারি রেলের বাঁধ জল বাহির হইতে দেয় না, তখন দেশে বন্যা হয়। উত্তর-বঙ্গের রেলের মানচিত্র দেখিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

বাঙলাদেশের ভূপ্রকৃতির মধ্যে বিশেষ কোনো বৈচিত্র্য নাই। সারাদেশ ঘুরিলে একটা পাহাড় বা এক টুক্‌রা পাথর চোখে পড়ে না। কেবল পশ্চিম-

বঙ্গের পশ্চিমে, উত্তরবঙ্গের উত্তরে ও পূর্ববঙ্গের পূর্বে পাহাড় দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গ বর্তমান বর্দ্ধমান বিভাগ, প্রাচীন রাঢ়, ভাগীরথীর পশ্চিমে অবস্থিত। এদেশ ক্রমশই পূর্ব হইতে পশ্চিমে উঁচু হইয়া গিয়া উত্তরে রাজমহল পাহাড় ও পশ্চিমে ছোটনাগপুরের পাহাড়ের সঙ্গে মিশিয়াছে। বীরভূম, বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়ার পশ্চিম দিকটায় ভূপ্রকৃতি, গাছপালা, সবটাই ছোটনাগপুরের সঙ্গে অধিক মেলে। রাঢ়ের মাটি লাল, কাঁকুরে; এখানে কয়লা, লোহা, পুটিং চূণ, আলুমিনিয়ামের মাটি পাওয়া যায়। এখানকার নদী কোপাই, বক্রেশ্বর, ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর; বর্ষার সময় ছাড়া ইহাদের শীর্ণ বক্ষে সামান্যই জল যায়। এদেশে বন কম; ঝাঁটি গাছ, শাল, তাল, খেজুর, জামের বন দেখা যায়।

উত্তরবঙ্গ বা বর্তমান রাজসাহী বিভাগ; প্রাচীনকালের বারীন্দ বা বরেন্দ্রভূমি—পূর্ণিয়া জেলা ও ব্রহ্মপুত্র নদের মাঝখানে অবস্থিত; উত্তরে হিমালয়ের তরাই বা ডুয়ারের জঙ্গল, দক্ষিণে পদ্মা। অনেকগুলি নৌতার্য্য নদী এখানে আছে। এখানকার বান বিখ্যাত ও ভীষণ ক্ষতিকর। বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট এই বন্যা সম্বন্ধে তদারক করিবার জন্য অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহালনবীশকে নিযুক্ত করেন। তিনি খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও গবেষণামূলক এক প্রতিবেদন সরকারে পেশ করেন। কিন্তু বন্যা নিরাকৃত করিবার কোনো সহজ উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই। বন্যা সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। দক্ষিণবঙ্গের নদী-সমস্যা আরও তীব্র; এখানে নদী মজিয়া আসিতেছে। মুর্শিদাবাদে ভাগীরথীতে শীতকালের পর আর নৌকা চলাচল করে না বলিলেই চলে। প্রাচীন সরস্বতী, যাহার তীরে সপ্তগ্রাম ছিল, তাহা এখন নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। যশোহর, খুলনা, নদীয়ার অনেক নদী মজিয়া আসিতেছে; উহার উপর কচুরীপানার উপদ্রব হওয়ায় দ্রুতবেগে নদীগুলি শীর্ণ হইতেছে ও ভরিয়া যাইতেছে। জলনিকাশের সুব্যবস্থা যতই নষ্ট হইতেছে বিবিধ রোগ বিশেষভাবে মেলেরিয়া ও কলেরার উৎপাত বাড়িতেছে।

মধুমতী নদীর পূর্বদিকে পূর্ববাঙলা সুরু। এখানে বড় বড় নদী, অসংখ্য খাল আছে; বর্ষাকালে দেশ জলের তলায় ডুবিয়া যায়; লোকে নৌকায় করিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যায়, এমনকি এ-বাড়ী হইতে সে-বাড়ী করে। স্থলপথ হইতে জলপথ সুগম; পশ্চিমবঙ্গ বা রাঢ়ের একেবারে বিপরীত।

রাঢ়ের এমন বহুলোক আছে, যাহারা কখনো নৌকা দেখে নাই। পূর্ববঙ্গের নদীখাল কচুরীপানার উপদ্রবে অনেক সময়ে নৌতার্য্য হয় না। এই বিষাক্ত পানার উৎপাতে মাছ কমিয়া আসিতেছে। এখন নদীখাল ছাড়িয়া পানা ক্ষেতের মধ্যে গিয়া আশ্রয় লইতেছে।

চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার পূর্বাঞ্চল পার্বত্য; ছোট ছোট গিরিপথ দিয়া বর্মায় যাওয়া আসা যায়; টিপ্‌রা, কুকি, লুসাই, চাক্‌মা, মগ বা আরাকানীরা এই সীমান্তের বাসিন্দা। পূর্বদিকের পাহাড়গুলির একটি শাখা আসাম দেশের মাঝে ঢুকিয়া গিয়াছে; সেই পাহাড়ে নাগা, খাসি, গারো প্রভৃতি জাতি বাস করে। পাহাড়গুলি পাত্‌কোই পর্বতের শাখা। মৈমনসিংহ, শ্রীহট্ট, কাছাড়, ত্রিপুরা, চট্টগ্রামকে ঘেরিয়া বৃত্তাকারে পর্বতমালা রহিয়াছে। এইসব পাহাড়ের নদী পূর্ববঙ্গ ও সুরমা উপত্যকা বহিয়া চলিয়াছে; ইহার উপরে বারিপাতও অজস্র; সুতরাং এই দেশটি যথার্থ নদীমাতৃক।

হিমালয় পাহাড় বাঙলার উত্তরে। দার্জিলিং, কাসিয়ঙ প্রভৃতি শহরগুলি পাহাড়ের উপর অবস্থিত; বাঙলার সহিত ইহাদের কোনো সম্বন্ধ ছিল না; ভুটানীরা মাঝে মাঝে উপদ্রব করিত বলিয়া এই অঞ্চলটি ও সিকিম ইংরেজদের হাতে আসে। দার্জিলিং লাটসাহেবের শৈলাবাস, ধনী-লোকের স্বাস্থ্যনিবাস। তা ছাড়া তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্যের একটি কেন্দ্র; চা-বাগিচার জন্যও বিখ্যাত। হিমালয়ের নীচেই গভীর বন। সেই ভীষণ বনে হাতী-গণ্ডার থাকে। এই স্থানকে বলে তরাই। জলপাইগুড়ির উত্তরকে বলে 'ডুয়ার'; এখন বন কাটিয়া অনেক চা-বাগিচা হইয়াছে। ভুটানীদের উপর খবরদারী করিবার জন্য ছোট ছোট দুর্গ এদিকে আছে; বক্সা দুর্গ তাহাদের অন্যতম।

বাঙলাদেশ নদীবহুল, তাই এখানকার বড় বড় প্রাচীন বা আধুনিক শহর বা গ্রাম নদীর উপর অবস্থিত। প্রাচীনকালে হিন্দু ও মুসলমানদের রাজধানী ছিল গৌড়—মালদহ জেলায়। বাঙলায় প্রবেশের মুখে রাজমহলের পাহাড়ের অপর পারে ইহার অবস্থান ছিল পাকা জায়গায়। এখান হইতে সমগ্র বাঙলা শাসন কঠিন ছিল না; পদ্মা বহিয়া পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের নদী দিয়া বারীন্দের নানা স্থানে যাওয়া সহজ ছিল; তেমনি ভাগীরথী দিয়া দক্ষিণ দিকে

আসাও সুগম ছিল। ভাগীরথীর খাদ যখন গভীর ছিল, তখন সমুদ্রগামী ঢাউস নৌকা গৌড় পর্যন্ত আসিত।

পরযুগে মড়কে গৌড় যখন উজাড় হয়, তখন রাজধানীর বদল হয়; প্রথমে রাজমহল, পরে ঢাকা, অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুর্শিদাবাদ। বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল সরস্বতী নদীতীরস্থিত সাতগাঁ বা সপ্তগ্রাম। তারপর গঙ্গানদী-তীরস্থিত হুগলী, বান্দেল, চন্দননগর, শ্রীরামপুর পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, দিনেমার প্রভৃতিদের ব্যবসার কেন্দ্র হইয়া উঠে; সর্বশেষে কলিকাতা ইংরেজদের ব্যবসার ও রাজ্যবিস্তারের কেন্দ্র ও (base) পীঠস্থান হয়। গঙ্গায় ঢুকিবার মুখেই ইংরেজদের এই নবীন শহরের সম্মুখ দিয়া প্রত্যেক য়ুরোপীয় জাতিকে তাহাদের বাণিজ্য-কেন্দ্রে যাইতে হইত। কলিকাতার বন্দর রক্ষা করা খুব ব্যয়সাধ্য ব্যাপার; কলিকাতার ন্যায় ধনী নগরের পক্ষে সেই ব্যয় বহন করিয়া তাহার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভবপর হইয়াছে। আমরা পূর্বে বলিয়াছি সমতল ভূমিতে আসিয়া নদীর বেগ অত্যন্ত মন্দ হয়; তখন পলিমাটি পড়িয়া নদীর মুখ বন্ধ হইবার আশঙ্কা হয়; সেইজন্য প্রায়ই ড্রেজিং কলের দ্বারা জল ঘুলাইয়া ঘুলাইয়া এই পলিমাটি পড়িতে দেওয়া হয় না। কলিকাতা সমুদ্র হইতে প্রায় ৯০ মাইল; এই পথটির কখন কোথায় চর পড়ে তাহা নিত্য নিয়ত নানা বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্থির রাখিতে হয়। সেইজন্য গঙ্গার মধ্যে সমুদ্রগামী জাহাজ পরিচালনার জন্য একদল বিশেষজ্ঞ পাইলট নিযুক্ত আছেন।

নদী যে কেবল দেশকে উর্বর করে তাহা নহে, সহজ ও সুলভ গতায়াতের পথ এমন আর নাই। ব্যবসা-বাণিজ্য ইহার তীরে, নগর গ্রাম ইহার ধারে; হাট-বাজার ইহার পাড়ে। নদীর আর্থিক দিক্ হইতেছে—ইহার মাছ। কত লক্ষ লক্ষ টাকার মাছ প্রতিবৎসর গ্রামে গ্রামে ধরা হয় ও স্থানীয় হাটে, শহরে বিক্রয় হয়, তাহার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। বাঙালীর প্রধান খাদ্যের অন্যতম হইতেছে মাছ।

নদী ছাড়া বাঙলাদেশে অনেকগুলি বিল আছে; রাজসাহীর চলন বিল এককালে বিশ ত্রিশ মাইল বা তাহারও অধিক বড় ছিল; এখন মাত্র ১০।১২ মাইলে দাঁড়াইয়াছে। ফরিদপুর অঞ্চলে অনেক বিল আছে, সেগুলি নাকি ভূমি-কম্পে দহ পড়িয়া বিলে পরিণত হইয়াছে। বাখরগঞ্জে, পাবনাতেও বিল আছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাঙলার ভূ-তত্ত্ব

বাঙলাদেশ মোটের উপর সমতল। ইহার উত্তরে হিমালয়, পূর্বে আসামের গারো এবং খাসিয়া পাহাড় অথবা ব্রহ্মদেশের পর্বতমালা এবং পশ্চিমে ছোটনাগপুর এবং সাঁওতাল পরগণার পার্বত্যভূমি। চারিদিকের উচ্চ ভূভাগ হইতে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, কুশী, দামোদর প্রভৃতি নদ-নদী যুগযুগান্ত ধরিয়া বালি, কাদা প্রভৃতি ধুইয়া আনিতেছে। সেই পলি পড়িয়া বাঙলার অধিকাংশ ভূভাগ নির্মিত হইয়াছে। ইহা যে কত গভীর তাহা ঠিক বলা যায় না। ১৩০০ ফুট খুঁড়িয়াও ইহার তল পাওয়া যায় নাই। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, ইহা আরও কয়েক সহস্র ফুট গভীর।

ভূ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতে হিমালয় পাহাড়-সৃষ্টির সহিত পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ বিহার ও বাঙলাদেশ গঠনের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। পৃথিবীর উপরে পাথরে তৈয়ারী যে খোসাটির উপর আমরা বাস করি, তাহা আপাতত স্থির হইলেও নিশ্চল নহে। পোড়া আলুর খোসার মত তাহা বহুবিধ কারণে ভাঁজ খাইয়া আছে। এই সকল ভাঁজই পৃথিবীর উপরকার পাহাড-পর্বত। লক্ষ বৎসর পূর্বে এমনি একটি ভাঁজ খাওয়ার ফলে হিমালয় পর্বতের সৃষ্টি হয়। মধ্য-এসিয়ার দিক হইতে একটি চাপের ফলে সম্মুখে দাক্ষিণাত্যের কঠিন প্রস্তরে বাধা পাইয়া হিমালয়ের সৃষ্টি হয়। এখন যাহা হিমালয়, পূর্বে তাহা সমুদ্রের গর্ভস্থিত পলিমাটি ছিল। অতএব কি প্রচণ্ড চাপে যে তাহা বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি।

চাপের ফলে হিমালয়ের ঠিক সম্মুখে ও দাক্ষিণাত্যের কোল ঘেঁষিয়া একটি গভীর খাদের সৃষ্টি হয়। এই খাদটি পরে নদীর পলিতে ভরাট হইয়া পঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে পরিণত হইয়াছে। পলির কোন কোন অংশ অপেক্ষাকৃত পুরাতন, কোনটি বা নূতন। পুরাতন পলির মধ্যে অধুনা-

লুপ্ত কোন কোন জন্তুর অস্থি বা দেহাবশেষ পাওয়া যায়। নূতন পলিতে যে-সকল জীবের চিহ্ন আছে, তাহারা এখনও জগৎ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই, নদ-নদীতে এখনও তাহাদেরই বংশধরগণকে দেখিতে পাওয়া যায়। ঢাকার নিকটে মধুপুর জঙ্গল নামে যে ভূখণ্ড আছে, তাহা প্রাচীন পলির দ্বারা নির্মিত, তবে সেখানে প্রাচীন জীবের অস্থি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই। যাহাই হউক, প্রাচীন ও নূতন পলির পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, এগুলিও নিশ্চল নহে। যে-গতির বশে হিমালয় উত্থিত হইয়াছিল, তাহা এখনও সম্পূর্ণভাবে স্থির হয় নাই। বাঙলাদেশের পলিমাটির কিছু কিছু ওঠানামা হইতেছে। তাহার ফলে পূর্বে যাহা মাটির উপরে ছিল, তাহা এখন ভূগর্ভে কিছুদূর প্রোথিত হইয়াছে। তবে ওঠানামার গতি এত সামান্য যে বহুযুগের সঞ্চিত ফল দেখিয়া মাত্র আমরা ইহা নির্দ্ধারণ করিতে পারি; এক-আধ বৎসরের কথা নয়।

বাঙলার পশ্চিমাঞ্চলে, অর্থাৎ রাঢ়দেশে পলির বদলে বেলেপাথর অথবা ছোট ছোট পাহাড় এবং কয়লার খাদ দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি বয়সে হিমালয় অপেক্ষা বহু প্রাচীন। যখন হিমালয় হয় নাই তখন দাক্ষিণাত্যের উপর দিয়া আড়াআড়ি ভাবে দুইটি বিশাল পর্বতশ্রেণী বর্তমান ছিল। জল-বৃষ্টির কারণে পাহাড়ের ক্ষয় হয়। সেই দুইটি পর্বতমালার একটি ক্ষইয়া শেষ পর্যন্ত আরাবাল্লী পর্বতশ্রেণীরূপে দাঁড়াইয়াছে, অপরটি একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় পর্বতমালা বিন্ধ্যগিরি যেখানে রহিয়াছে, সেখান হইতে প্রায় আসামের প্রান্তদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহার পূর্ব ও দক্ষিণ ভাগ দিয়া যে-সকল নদী প্রবাহিত হইত, তাহাদেরই পলি ক্রমে কঠিন হইয়া রাণীগঞ্জ-অঞ্চলের বেলেপাথর এবং কয়লার খাদের নানাবিধ পাথরে পরিণত হইয়াছে। বাঙলাদেশের বর্তমান পলিমাটির গভীরতা দেখিয়া আমরা আশ্চর্যান্বিত হই, কিন্তু রাণীগঞ্জের পলিমাটি তাহা অপেক্ষা কোন অংশে কম গভীর ছিল না। বস্তুত মাপিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহা ১১,০০০ ফুট, অর্থাৎ ২ মাইলেরও অধিক গভীর ছিল। অতএব সেই লুপ্ত পর্বতমালাও যে কত উচ্চ ছিল, তাহা সহজে অনুমান করা যায়। যুগযুগান্ত ধরিয়া ঝড়বৃষ্টির তাড়নায় পাহাড়টি নিঃশেষে এই পলিমাটির আকারে পর্যবসিত হইয়াছিল।

যে-যুগে ইহা ঘটে, তাহাকে পণ্ডিতগণ গণ্ডওয়ানা-যুগ বলিয়া থাকেন। গণ্ডওয়ানা-যুগের প্রথমভাগে দেশের আবহাওয়া খুব শীতল ছিল। বস্তুত পশ্চিম বাঙলায় তখন তুষারনদীর চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। হইবারই কথা। কাছে অত বিশাল পর্বতমালা থাকিলে দেশের আবহাওয়া যে শীতল হইবে, ইহাতে আশ্চর্য কি। যাহাই হউক, যত দিন যাইতে লাগিল, তত দেশের হাওয়া ক্রমে গরম হইতে লাগিল। এই সময়ে নদীর তীরে নানাবিধ গাছ-পালায় জঙ্গল হইয়া উঠিল। হিমালয়ের তরাইএ যেমন ঘন বন আছে, রাণীগঞ্জ-অঞ্চলেও তেমনই হইয়া দাঁড়াইল। শুধু পাহাড়ের পাশে নয়, নদীর দুই কূলে ঘন বনানী বিস্তৃত হইতে লাগিল। ক্রমে সেইসব গাছপালা মরিয়া গেল। তাহাদের কাণ্ড, পাতা মাটিতে পড়িয়া মিশিয়া গেল। আবার নূতন গাছ হইল আবার তাহাও মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল। এমনিভাবে যুগ-যুগান্ত ধরিয়া প্রকৃতির লীলা চলিতে লাগিল। শেষে একদিন যেখানে জঙ্গল ছিল, সেখানে তাহার চিহ্ন রহিল না, নদীর বালি এবং মাটির তলায় সব লুপ্ত হইয়া গেল। বহুলক্ষ বৎসর পরে মানুষ মাটির গর্ভে লুকান রত্নের সন্ধানে সেই প্রাচীন জঙ্গলের পচা মাটি খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছে। আমরা নিত্য যে কয়লা ব্যবহার করি, তাহা সেই লুপ্ত অরণ্যের কাঠ ও পাতাপচা মাটি। এখনও কয়লার খনিতে পুরাতন পলিমাটির মধ্যে গাছের পাতার দাগ, এমন কি মরা ফড়িংএর ডানার রেখা পর্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায়। সে-সময়ের আবহাওয়া কেমন ছিল, উষ্ণ না শীতল, বৃষ্টি কেমন হইত, কম না বেশী, পণ্ডিতগণ গাছের গঠন অথবা কোন্ কোন্ জীবের বাস ছিল, তাহা হইতে অনুমান করিতে পারেন।

বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর অঞ্চলে আমরা যে লালমাটি অথবা কাঁকর দেখিতে পাই, তাহার ইতিহাস বড় বিচিত্র। গণ্ডওয়ানা-যুগ রাণীগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের পলিমাটির অনেক পরের কথা। একসময়ে সমস্ত দাক্ষিণাত্য যুড়িয়া বহুকাল অগ্নুৎপাত হইয়াছিল। বোম্বাই হইতে বিহারে পালামৌ জেলা এবং উত্তরে বিন্ধ্যগিরি হইতে প্রায় হায়দ্রাবাদ ও মহীশূর পর্যন্ত প্রদেশ ভূগর্ভ হইতে উত্থিত আগ্নেয় প্রস্তরে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। রাজমহল পাহাড়ে আমরা এই শ্রেণীর পাথর দেখিতে পাই। যে-দেশে খুব গরম হয় ও বৎসরের কয়েক

মাস প্রচুর বৃষ্টি হয়—অর্থাৎ মৌশুমি বায়ুর দেশে—আগ্নেয় প্রস্তর বিশেষ-ভাবে ক্ষয়গ্রস্ত হয়। তাহারই ফলে রাঢ়দেশের রাঙ্গামাটি সৃষ্টি হইয়াছে। কোথাও বা রাঙ্গামাটি পাহাড়ের গা হইতে ধুইয়া নামিয়া নদীতীরবর্তী পলি মাটিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। সেখানে রাঙ্গামাটি খুঁড়িলে নীচে আবার নদীর পলি পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাঙ্গামাটির তলায় আগ্নেয়প্রস্তর, অথবা আরও প্রাচীন যুগের পাথর দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঙলার পলি ও পশ্চিমবঙ্গের কয়লার খাদ এবং রাঙ্গামাটি বাদ দিলে ভূ-তত্ত্বের দিক দিয়া বিচার করিবার মত দার্জিলিং এবং চট্টগ্রাম জেলার পর্বতমালা অবশিষ্ট থাকে। হিমালয়ের পশ্চিমাঞ্চলে ভূ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ যে-সকল তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, দার্জিলিং অঞ্চলে তেমন-কিছু হয় নাই। সেইজন্য বাঙলার ভূ-তত্ত্বে এই অঞ্চলকে বাদ দেওয়া যাইতে পারে।

তবে চট্টগ্রাম অঞ্চল সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। চট্টগ্রাম, আসাম ও ব্রহ্মদেশের পর্বতমালা হিমালয়ের সমসাময়িক বা কিছু পরবর্তী কালের। রাণীগঞ্জের কয়লার খনি যেমন নদীর পলি পড়িয়া হইয়াছে, চট্টগ্রাম বা আসাম প্রদেশের পাথরও তেমনই পলি পড়িয়া হইয়াছে বটে, তবে সে-পলি নদীর পার্শ্ববর্তী পলি নয়। বান আসিলে নদী সব-পলি দুইপাশে ঢালিয়া যায় না, স্রোতের জলে তাহার কিয়দংশ সমুদ্রগর্ভে লইয়া ফেলে। সেখানে পলির স্তরে স্তরে নানাবিধ সামুদ্রিক জীবের মৃতদেহ পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, দূর সমুদ্রের গর্ভেও নানাবিধ পাথরের সৃষ্টি হইয়া থাকে। সমুদ্রজলে শামুক ও ঝিনুক জাতীয় যে-সকল অসংখ্য জীব বাস করে, তাহাদের খোলস শত শত বৎসর পুঞ্জীভূত হইয়া কঠিন প্রস্তরে পরিণত হয়। নদীর পলি ও সমুদ্রের পলিতে প্রধান প্রভেদ হইল প্রথমটিতে সামুদ্রিক জীবের চিহ্নমাত্র থাকে না, অপরটিতে শুধু তাহাই পাওয়া যায়, পুষ্করিণীতে বা নদীতে যে সকল শামুক, গুগ্‌লি বা মাছ বাস করে, তাহাদের দেহাবশেষ কিছুই পাওয়া যায় না।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে আমরা যে-সকল পাথর পাই, তাহা প্রধানত ব্রহ্ম ও আসাম দেশের সামুদ্রিক পাথরের অনুরূপ। ইহাদের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে কোথাও কোথাও কেরাসিন-জাতীয় তৈল পাওয়া যায়। পলির বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সামুদ্রিক জীবের দেহ পচিয়া নানাবিধ তৈল ও বাষ্প উৎপন্ন হয়। পরে সমুদ্র

সরিয়া যায়, নীচের পাথর উপরে আসে এবং তাহার ফাটল দিয়া সঞ্চিত তৈল ও বাষ্প নির্গত হয়। এইসকল বাষ্প বায়ুর সংস্পর্শে জ্বলিয়া উঠে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাহাড়ের গায়ে এইজন্য কোথাও কোথাও অগ্নিশিখা দেখা যায়। স্থানীয় লোকে ইহাকে দেবীজ্ঞানে পূজা করে। পঞ্জাবে কাংড়া জেলায় জ্বালামুখীতীর্থেও এমনি অগ্নি অবিরাম জ্বলিতে দেখা যায়। পাথরের নীচে যে জৈব পদার্থ সঞ্চিত হইয়া আছে, ইহা তাহারই প্রমাণ। চট্টগ্রামে না হইলেও আসাম ও ব্রহ্মদেশ হইতে সমসাময়িক পাথর খুড়িয়া প্রতিবৎসর বহুলক্ষ টন তৈল চালান দেওয়া হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাঙলার জলবায়ু

বিষুবরেখা হইতে দেশের দূরত্ব ও অবস্থান, সমুদ্রতল হইতে উচ্চতা, সমুদ্রের নৈকট্য, পর্বত নদী বিল প্রভৃতির সংস্থানের উপর জলবায়ু নির্ভর করে। বাঙলাদেশের মধ্যদিয়া কর্কটক্রান্তির রেখা গিয়াছে; সে-হিসাবে এদেশের দক্ষিণাংশ গ্রীষ্মমণ্ডল ও উত্তরাংশ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের অন্তর্গত। আবার দার্জিলিং প্রভৃতি পার্বত্য শহরগুলির আবহাওয়া শীতমণ্ডলের ন্যায়। পশ্চিম বাঙলায় বীরভূমের আবহাওয়া ও তাপ ছোটনাগপুর বা 'পশ্চিমে'র ন্যায়, পূর্ববঙ্গের বৃষ্টিপ্রধান শৈত্যপূর্ণ আবহাওয়ার বিপরীত; দক্ষিণ-বঙ্গ সমুদ্রের জলবায়ুর অন্তর্গত। সুতরাং বাঙলাদেশে সকলপ্রকার জলবায়ুই দেখা যায়।

বাঙলা মতে ঋতু ছয়টি, কিন্তু আসলে শীত গ্রীষ্ম বর্ষাই গায়ে লাগে স্পষ্ট করিয়া। শীত ও গ্রীষ্মের মাঝে বসন্তকাল। বর্ষা ও শীতের মাঝে শরৎ ও হেমন্ত। সাধারণভাবে শীতকাল এদেশে তেমন তীব্র নয়, আবার গ্রীষ্মও উত্তর-পশ্চিম ভারতের ন্যায় অসহ্য নয়। বরং গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-বাঙলায় সমুদ্র-বাতাস বহে বলিয়া গ্রীষ্ম অসহ্য নয়। বসন্ত ও গ্রীষ্মের মোহনায় বাঙলাদেশে 'কালবৈশাখী' আসে। এই সর্বনেশে ঝড় প্রায় প্রতিবৎসরই বাঙলার কোনো না কোনো অংশের ক্ষতি করে। এই ঝড় বিশেষভাবে পশ্চিম বাঙলায় হয় ধূলিঝড়রূপে; ইহা আসে উত্তর-পশ্চিম হইতে; ইহাকে বলে 'Nor-wester'। ঝড় বা সাইক্লোন (ঘূর্ণিঝড়) দেখা দেয় বর্ষা ও শীতের মোহনায় সাধারণত শরৎকালে। তখন বৃষ্টি ও ঝড় মিলিয়া পাক খাইয়া খাইয়া একটা প্রলয় সৃষ্টি করে। বাঙলার অনেক ক্ষতি ও প্রাণহানির জন্য এই সময়ের সাইক্লোন দায়ী। গত শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বছরে বঙ্গসাগরে কোন মাসে কতগুলি ঝড় হইয়াছিল। তাহার তালিকা দিলাম :—

জা	ফে	মা	এ	মে	জু	জুল	অ	সে	অক্	ন	ডি
০	০	১	৪	১৩	২৮	৪১	৩৬	৪৫	৩৪	২২	৮

বাঙলাদেশের জলবায়ুর মধ্যে তিনটা জিনিষ লক্ষ্য করার আছে। প্রথম, হইতেছে বাঙলার কালবৈশাখী যাহা এখানকার বিশেষত্ব; দ্বিতীয়, সমুদ্রের ঝড় যাহা দক্ষিণ হইতে আসিয়া বাঙলার ভিতর ঢোকে অথবা আমরা যাহাকে সাইক্লোন বলি; আর তৃতীয় হইতেছে বাঙলার বর্ষাকাল।

কালবৈশাখী ব্যাপারটা কি, তাঁহা বাঙলার মেয়েপুরুষ এমন কেহ নাই জানেন না। কোথাও কিছু নাই, বেশ পরিষ্কার আকাশ, সূর্য্য প্রচণ্ড তাপে ধরিত্রী দগ্ধ করিতেছেন, আকাশের রঙ পাংশুটে, গাছের পাতা নিশ্চল। এমন সময় সন্ধ্যার দিকে আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণে গাঢ় ধোঁয়ার মত একটুক্‌রা কালো মেঘ হঠাৎ দেখা গেল। একটু পরেই জোরে একটা ঠাণ্ডা দমকা হাওয়া আসিল ও দেখিতে দেখিতে উহা প্রকাণ্ড ঝড়ে পরিণত হইল। কিছুক্ষণ পরেই সমস্ত শান্ত হইয়া গেল; গরম কাটিয়া গেল, ঠাণ্ডা হইল, আকাশে তারা উঠিল। নিমেষের মধ্যে এই ঝড় প্রলয় সৃষ্টি করে, কত পশুপক্ষী এমনকি মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়। এই ঝড়ের কারণ পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। কলিকাতা 'মেটিওরলজি' বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ শচীন্দ্রনাথ সেন এ বিষয়ে গবেষণা করিয়া একটি তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতটি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:*

"দুই দিক থেকে দুই প্রকাণ্ড বায়ুরাশি ছুটো দৈত্যের মত পরস্পরের বিরুদ্ধে এগিয়ে এসে যখন তাদের মধ্যে ঠোকাঠুকি লাগে, তখন এই কালবৈশাখীর সৃষ্টি হয়। ফাল্গুন চৈত্র মাস থেকেই আমাদের দক্ষিণে সাগরের উপর দিয়ে বহুদূর থেকে জলো হাওয়া উঠে উত্তর মুখো ব'য়ে এসে বাঙ্গলার ভিতর ঢুকতে থাকে। এর পূর্বে বাঙ্গলায় ঠাণ্ডা উত্তরে হাওয়ার রাজত্ব ছিল। কাজেই দক্ষিণে হাওয়া যখন বাঙলায় ঢুকতে চায়, উত্তরে হাওয়ার পক্ষে তখন তাকে বাধা দেওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু দক্ষিণে বাতাসকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না; কেননা, দক্ষিণায়নের সঙ্গে এই বাতাসের শক্তি কালধর্মে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। উত্তরে হাওয়া ক্রমে উত্তর দিকে উঠে যেতে থাকে। কিন্তু তা বলে বিনা যুদ্ধে শত্রুকে সূচ্যগ্র ভূমিও ত্যাগ করে না। মাঝে মাঝে শক্তি সঞ্চয়

* আনন্দবাজার পত্রিকা, পৌষ ১৩৪১, আবহবিদ্যা সম্বন্ধে রেডিওতে বক্তৃতা।

করে এসে যখন দক্ষিণে হাওয়াকে ঠেলে দক্ষিণ দিকে তাড়িয়ে দিতে যুদ্ধ ঘোষণা করে—তখনই এই দুই হাওয়ারূপী দৈত্যের দ্বন্দ্বযুদ্ধ লেগে গিয়ে আমাদের কাল-বৈশাখীর সৃষ্টি করে। উত্তরে হাওয়াটা ওজনে ভারী, আর দক্ষিণে হাওয়াটার ওজন হাল্কা। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের সময় ভারী উত্তরে হাওয়ার কাঁধের উপর হাল্কা দক্ষিণে হাওয়াটা চড়ে বসে। তখন উত্তরে হাওয়া সজোরে ঠেলে জলো দক্ষিণে হাওয়াটাকে আকাশের দিকে উঠিয়ে দেয়। আকাশের অনেক উঁচুতে দক্ষিণে হাওয়া উঠে ভয়ানক ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়াতে ভেতরের যত বাষ্প আকারের জল, ঠাণ্ডায় প্রথমে মেঘ হয় ও পরে বৃষ্টি হয়ে মাটিতে পড়ে। দক্ষিণে হাওয়া বড্ড বেশী জোরে উপরে উঠে গেলে এবং সেইজন্য বড্ড ঠাণ্ডা বেশী হলে আকাশের উপরে জল জমে বরফ হয়ে যায়। তখন শিলাবৃষ্টি হয়। মেঘ বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর দক্ষিণে হাওয়ার আগেকার সব শক্তি শেষ হয়ে যায়, তখন যুদ্ধ থেমে যায়।

সাইক্লোন সম্বন্ধে এখন আপনাদেব দুই এক কথা বলি। বাঙলায় যে-সব সাইক্লোন হয়, সেগুলো সবই সমুদ্র থেকে, অর্থাৎ—বঙ্গোপসাগর থেকে এসে দেশে ঢোকে। সমুদ্রের উপর কোন এক জায়গায় লম্বায় চওড়ায় প্রায় ২০০।৩০০ মাইল জুড়ে একটা ঘূর্ণি-হাওয়ার সৃষ্টি হয়। এই ঘূর্ণি-হাওয়াটা ক্রমে জোরে ঘুরতে থাকে। একটা বালতির ভিতরে জলকে কাঠি দিয়ে জোরে ঘোরাতে থাকলে দেখতে পাবেন যে, মধ্যিখানের জলটা নীচু হয়ে গিয়ে চারিপাশের জলটা উঁচু হয়ে যায়; সেই রকম আকাশের এই ঘূর্ণি-হাওয়াটার মধ্যিখানের হাওয়ার ওজন চারিপাশের হাওয়ার ওজনের চেয়ে কমে যায়; ঘূর্ণি যত জোরে হয়, মধ্যিখানের ওজন সাধারণত তত কমে যায়। এই প্রকাণ্ড ঘূর্ণি-হাওয়াটাই হচ্ছে সাইক্লোন। যে ভয়ানক শক্তি এই এতবড় একটা বিশাল হাওয়াকে ঘোরাতে থাকে, সেটা কি রকম প্রবল, তা ভাবতে মাথা ঘুরে যায়। এই শক্তির তাড়নায় বিশাল বায়ুরাশি কুমারের চাকের মত একভাবে ঘুরে উন্মত্ত হয়ে ছুটতে থাকে, তখন তার ভিতর নৌকা জাহাজ পড়লে কি রকম বিপন্ন হয়, তা বলা বাহুল্য। এই বিশাল ঘূর্ণি-হাওয়া এক জায়গায় স্থির হয়ে ঘোরে না। ঘুরতে ঘুরতে একটা দিক নিয়ে সেটা ছুটতে থাকে।

কলিকাতা মিটিওরলজিক্যাল অফিসের পাঁচটা কাজের ভিতর একটা কাজ হচ্ছে বঙ্গোপসাগরের ভিতর কোথাও এই রকম ঘূর্ণি-হাওয়ার সৃষ্টি হচ্ছে কি না নজর রাখা, আর হলেই সেটা কোনমুখে ধাওয়া করবে—দেখা। আর সমুদ্রের ভিতর জাহাজ এবং চারিপাশের বন্দরগুলোকে খবর দিয়ে সাবধান করে দেওয়া। সাইক্লোন সমুদ্র ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠলে মাটি, গাছপালা, পাহাড় প্রভৃতি জিনিষে ধাক্কা লাগতে লাগতে ঘূর্ণির শক্তি ক্রমে ক্ষয় হ'তে থাকে এবং শেষে সেটা থেমে যায়। তখন ঝড় কেটে যায়।"

বাঙলার ধন ও ধান্য নির্ভর করে বৃষ্টির উপর। বৃষ্টির কারণ কি, সে-সব ভৌগোলিক, কথা এখানে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। বৎসরে দুইবার মৌশুমি বায়ু বহে। মাঘের শেষে একবার বৃষ্টি হয়, ইহা উত্তর মৈশুমি বায়ুপ্রবাহে হয়। কিন্তু আসল হইতেছে বর্ষাকালের বৃষ্টি। দক্ষিণে বাতাস ফাল্গুন হইতে বহে; এই বায়ু বৃষ্টির অগ্রদূত। জলকণাযুক্ত মেঘ আসিতে আরও তিনমাস লাগে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠমাসে দুই চারিবার বৃষ্টি হয়। তখন চাষীরা ধানের বীজ রোপন করে। আষাঢ় মাস হইতে বর্ষা নামে। শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিনের কিছু কালটা পর্য্যন্ত বর্ষা চলে।

বঙ্গসাগর হইতে মৈশুমিবায়ু উঠিয়া প্রথমে ব্রহ্মদেশের উপকূলে, চট্টগ্রামে ও পরে পূর্ববঙ্গের উপর দিয়া গিয়া সোজা খাসিয়াপাহাড়ে ধাক্কা লাগায়। শ্রীহট্টের সমতল ভূমি হইতে চেরাপুঞ্জীর খাসিয়া পাহাড় একেবারে খাড়া উঠিয়াছে। সমতল ভূমির তাপ হইতে বাষ্পরাশি শৈলশিখরের শীততাপমণ্ডলে উঠিয়া আসে; এই আকস্মিক পরিবর্তনে মেঘ হইতে অজস্র বারিধারা ঝরিতে থাকে। ইহার ফলে চেরাপুঞ্জীতে গড়ে বৎসরে ৪৬০ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়; পৃথিবীতে আর কোথাও এত বৃষ্টি হয় না বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। একবার ৮০৫ ইঞ্চি বৃষ্টিও হইয়াছিল; একদিনে ২৪ ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়াছে তাহারও হিসাব পাওয়া যায়। ইহার পর জলীয় বাষ্পযুক্ত মেঘ পশ্চিমদিকে চলিতে থাকে ও হিমালয়ে বাধা পাইয়া বৃষ্টিরূপে পরিণত হয়; জলপাইগুড়ি (১৪৩ ইঞ্চি) ও দার্জিলিঙে (১২২) প্রচুর বৃষ্টি হয়। বাঙলাদেশের গড়পড়তা বৃষ্টির পরিমাণ ৭৫ ইঞ্চি। বৎসরের কোন সময়ে কতখানি বৃষ্টি হয় তাহার একটি তালিকা দেওয়া গেল।

জানুয়ারী		মে	৭·৬	সেপ্টেম্বর	১০·৯
ফেব্রুয়ারী	·৯	জুন	১৪·৬	অক্টোবর	৫·০
মার্চ	১·৬	জুলাই	১৫·৪	নভেম্বর	·৮
এপ্রিল	৩·৩	আগষ্ট	১৪·৬	ডিসেম্বর	·১

বাঙলাদেশে কোনো কোনো বৎসর নয় মাস এক ফোটা বৃষ্টি হয় না দেখা গিয়াছে; তখন অনাবৃষ্টি-জনিত দুঃখ লোককে ভোগ করিতে হয়। আবার এমনও হয়, ফাল্গুন মাস হইতে প্রায়ই বৃষ্টি হইতে থাকে, শেষকালে আশ্বিন মাসে প্রয়োজনের সময় বৃষ্টি পাওয়া যায় না।

আবহবিদ্যার (meteorology) সাহায্যে জলবায়ু সংক্রান্ত সকল তথ্য ও তত্ত্ব জানা যায়। ১৮৭৫ সালে নিখিল ভারতীয় আবহবিদ্যা বিভাগ সরকার হইতে খোলা হয়। কলিকাতার উপকণ্ঠ-স্থিত আলিপুরে একটি বিজ্ঞানাগার আছে। আবহবিদ্যার পর্যালোচনার জন্য যে প্রাদেশিক ভাগ আছে, তাহাতে বাঙলার মধ্যে পড়ে বর্মাদেশ, বঙ্গোপসাগর, আসাম, বঙ্গদেশ, বিহার-উড়িষ্যা ও যুক্তপ্রদেশের পূর্বদিকটা। এইসব দেশের অনেক জেলার প্রধান শহরে তাপমান, বায়ুচাপমান, বারিমান, বায়ুর গতিমান যন্ত্র আছে। নিযুক্ত কর্মচারী প্রতিদিন প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় এইসব যন্ত্র পাঠ করিয়া টেলিগ্রাফযোগে সংবাদ আলিপুরে পাঠাইয়া দেন। এইরূপে প্রদেশের ষ্টেশন সমূহ হইতে খবর আসিলে তাহা অধ্যয়ন করিয়া ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী দৈনিক 'আবহমানচিত্র' প্রকাশ করেন। ঝড় বা ঘূর্ণিবায়ুর আশঙ্কার আভাস পাইলে তখনই বন্দরে বন্দরে জানাইতে হয়; অতিরিক্ত বৃষ্টির আশঙ্কা হইলে আসামে সে-সংবাদ পাঠাইতে হয়। ইহা ছাড়া, সময়-জ্ঞাপন এই অফিসের অন্যতম কার্য। পূর্বে এই কার্যের জন্য কোনো বিশেষজ্ঞ ছিলেন না; বর্তমানে আকাশপথে এরোপ্লেন যাতায়াত করিতেছে; সেইজন্য আবহবিভাগ বিশেষ-ভাবে বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারতের আবহ-বিজ্ঞানের প্রধান কেন্দ্র হইতেছে পুণা। আগ্রাতে যে বীক্ষণাগার আছে, তাহার প্রধান কর্তব্য আকাশের উপরিস্তরের বায়ুমণ্ডলের পর্যবেক্ষণ। কলিকাতার বীক্ষণাগারেও এই পর্যবেক্ষণ চলিতেছে। ছোট ছোট হাইড্রোজেন বেলুনে কয়েকটি যন্ত্র দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়; তারপর বীক্ষণাগার হইতে

দূরবীণ ও থিওডোলাইটের সাহায্যে বেলুনটি কিভাবে উপরে চলাফেরা করিতেছে তাহা পর্যবেক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়। এইরূপ পরীক্ষার প্রণালী একজন বাঙালীর আবিষ্কার।

বাঙলাদেশের কোন্ জেলায় কি পরিমাণ বৃষ্টি গড়ে বৎসরে হয় তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

বর্দ্ধমান বিভাগ

মেদিনীপুর—৬০	বাঁকুড়া—৫৩
বর্দ্ধমান—৫৫	বীরভূম—৫৬
হুগলী—৫৭	হাওড়া—৬০

প্রেসিডেন্সী বিভাগ

২৪ পরগণা—৬৩	খুলনা—৭২
যশোহর—৫২	নদীয়া—৫৪
মুর্শিদাবাদ—৫৫	

রাজসাহী বিভাগ

রাজসাহী—৫৮	মালদহ—৫৬
বগুড়া—৬৩	পাবনা—৫৯
রঙপুর—৮১	দিনাজপুর—৭২
জলপাইগুড়ি—১৪৩	দার্জিলিং—২২২

ঢাকা বিভাগ

ঢাকা—৭৪	ফরিদপুর—৭৩
মৈমনসিংহ—৮৬	বাখরগঞ্জ—৯১

চট্টগ্রাম বিভাগ

চট্টগ্রাম—১১৯	চট্টগ্রাম পার্বত্য প্রদেশ—৯৯
নোয়াখালি—১১৪	ত্রিপুরা—৮২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাঙলার উদ্ভিদ্

জল ও তাপের উপর দেশের উদ্ভিদ্ নির্ভর করে ; বাঙলাদেশে নদী, বৃষ্টি ও প্রচুর পরিমাণ তাপের অভাব নাই, সুতরাং গাছপালা প্রচুর পরিমাণে শুধু হয় না, উপদ্রবাকারেও হয়। কিন্তু বাঙলার সর্বত্র বৃষ্টি ও তাপ সমান নয় বলিয়া গাছপালাও সমান নয়। হিমালয় ও তরাই-এর বন আর কোথায়ও দেখা যায় না ; শাল, রবার, চাঁপা, তুণ প্রভৃতি বনস্পতি, বাঁশ, বেতঝাড়ের সঙ্গে মিশিয়া এমন জট পাকাইয়া আছে যে, সেখানে সূর্যের আলোক প্রবেশ করিতে পারে না। বাঙলার দক্ষিণে সুন্দরবন বা সুঁদরি গাছের বন। এখানে নদী বেশি, বারিপাতও অজস্র, মৃত্তিকা উর্বর। ফলে গাছের বাড়ও অসম্ভব। সুঁদরি গাছের কাঠে ভাল নৌকা হয়। গোলপাতার গাছও প্রচুর জন্মায় ও রপ্তানি হয়। তা ছাড়া মাদার গাছ ও নানা জাতীয় ঘাস পাওয়া যায়। চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার পাহাড়েও গভীর জঙ্গল। সেই জঙ্গলে মূল্যবান্ বহু প্রকারের গাছ আছে; বাঁশ প্রচুর ; এই বাঁশ হইতে কাগজ তৈয়ারীর জন্য মণ্ড বা কাই প্রস্তুত করিবার জল্পনা চলিতেছে।

বন্য গাছ বাঙলাদেশে অনেক ; তা ছাড়া রোপিত গাছ অগণ্য ; তাহাদের কাঠ কাজে লাগে। দেশী ছুতার ও কারিগর তাহাদের ব্যবহার জানে। শিশু, সেগুন, শাল, অর্জুন, গাম্ভীর, আম, জাম, কাঁঠাল, তাল প্রভৃতির ব্যবহার খুবই বেশি ; গ্রামে ইহাদের অনেকগুলিই সুপরিচিত। শহরে আজকাল বর্মার ও নেপালের আমদানি কাঠ বেশি চলে

গাছের নানারূপ ব্যবহার মানুষে করে। ঘরবাড়ী আসবাবপত্রের জন্য কাঠ লাগে। তা ছাড়া অনেক বনস্পতি ও গাছপালা ঔষধে লাগে ; বেদে নামে এক যাযাবর জাতি এই ঔষধ সংগ্রহ করে। বৃক্ষজাত ফুল, ফল, আঁশও মানুষের বিবিধ কাজে লাগে; যেমন শিমুল গাছের তুলা, বাবলার ছাল ও ডাল,

তালের রস বা তাড়ি ইত্যাদি। হরিতকী প্রভৃতি বনেই হয় ও বিদেশে বহু লক্ষ টাকার রপ্তানি হয়। হিমালয়ে বহু জাতের ওষধি আছে।

স্বচ্ছন্দে যেখানে নানাবিধ গাছ হয়, তাহাকে বন বলে; মানুষ যেখানে গাছ পোঁতে, তাহাকে বাগান বলে। ফলের গাছ মানুষের যত্ন না হইলে ভাল হয় না। ফলের মধ্যে আম, কাঁঠাল, জাম, লিচু, তেঁতুল, আমড়া, গোলাপজাম বাঙলার গ্রামে পাওয়া যায়। আম, কাঁঠাল, তেঁতুলগাছ পুরাতন হইলে কাটিয়া ফেলে; আম ও কাঁঠালের তক্তা গ্রামে ছুতাররা ব্যবহার করে, পালা জ্বালানি হয়। মালদহ, মুর্শিদাবাদে আম গাছের বাগান ব্যবসা হিসাবে লোকে করে। প্রতিবৎসর বহু লক্ষ টাকার আম, কাঁঠাল, লিচু, বাঙলার শহরে ও গ্রামে বিক্রয় হয়।

ঘাস ও উলুখড় ব্যবসার জন্য ব্যবহৃত হয়। ঘাস হইতে দড়ি ও কাগজের কলে পেষ্টবোর্ডের কাই (Pulp) হয়। উলুখড় এককালে নদীর ধারে পাওয়া যাইত; গ্রামের ঘর ছাওয়া খড় দিয়া হইত; এখন নদীর ধারে সে সব দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে; লোকে সে-সব জমি চাষ করিতেছে। বর্তমানে করোগেট টীন শস্তা হওয়ায় এই ঘাসের ব্যবহারও হ্রাস পাইয়াছে। বাঁশ এখন পর্যন্ত গ্রামের ঘরবাড়ী করিতে, দরমা, ঝুড়ি, পেতে, ধুচনি, মোড়া, চেয়ার করিতে ব্যবহৃত হয়। কাগজ তৈয়ারীর জন্য টিটাগড়ের মিলে বাঁশ ব্যবহার করা হইতেছে।

যে-সব গাছ কোনো কাজে লাগে না, তা জ্বালানি কাঠ করা যায়। মোট-কথা গাছপালা, ঘাস, খড় বাঙলার ঐশ্বর্য; কিন্তু তাহাদের যথাযথ ব্যবহার হয় না বলিয়া গাছপালা মানুষের শত্রু হইয়া উঠে; বাঙলাদেশের অনেক জায়গাতেই মানুষের সঙ্গে গাছের লড়াই চলিতেছে; মেলেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া দুর্বল অধিবাসীরা বর্ষার পরে বন কাটিয়া উঠিতে পারে না। ফলে মধ্য ও পশ্চিম বাঙলার অনেক গ্রাম বাসের অনুপযোগী হইয়াছে।

তাল, খেজুর, নারিকেল, সুপারি গাছের বাগান মানুষে করে। ইহারা বাঙলাদেশের আর্থিক উন্নতির সহায়তা করিয়াছে। তাল গাছ হইতে 'তাড়ি' পাওয়া যায়; তালশাঁস, তাল লোকে খায়; তালের রস হইতে গুড়, মিছরি হয়; তালপাতায় পাখা, খেলনা গ্রামে তৈয়ারী হয়। তাল গাছ কাটিয়া ও

চিরিয়া বাড়ীর কড়ি, আড়া করে। খেজুর গাছের পাতায় চাটাই বোনা যায়; খেজুর রস লোকে খায়; রস হইতে গুড় হয়; ইহা সম্পূর্ণরূপে গ্রাম্যশিল্প রহিয়াছে। বহু লক্ষ টাকার গুড় বছরে বিক্রয় হয়; আখের গাছের যত পাট করিতে হয়, খেজুর গাছের তা করিতে হয় না। পূর্বে খেজুর গুড় হইতে চিনি হইত।

নারিকেল গাছ বাঙলার দক্ষিণে হয়। বর্দ্ধমানের উত্তরে এ গাছ আর বেশি হয় না। ডাব, ডাবের জল, নারিকেল বাঙালীর খাদ্য। ঝাঁটার কাটি নারিকেলের পাতা হইতে হয়; নারিকেলের দড়ি, পাপোষ প্রভৃতি বাঙলায় তেমন হয় না, তবে নারিকেলের খোলের হুঁকা হয়; দক্ষিণ বাঙলায় নারিকেল গাছ 'কাটিয়া' রস নামায়; সেই রস হইতে উত্তম 'তাড়ি' হয়।

সুপারি দক্ষিণ-পূর্ব বাঙলায় হয়; পানের সঙ্গে সুপারির ব্যবহার বাঙালী ও ওড়িয়ার জাতীয় অভ্যাস। পূর্ববঙ্গে সুপারি গাছ হইতে গৃহস্থের ভাল রকম আয় হয়।

অন্যান্য গাছের মধ্যে বাবলা গাছ চামড়ার কাজে লাগে; বাবলা কাঠ গ্রামের ছুতার মিস্ত্রীরা গাড়ীর চাকা, হাল লাঙ্গলের জন্য ব্যবহার করে। শিমুল গাছের তুলা বালিশের জন্য বাঙালী অ-বাঙালী সকলেই ব্যবহার করে। শিমুল কাঠের চাহিদা দেশলাইএর জন্য বর্তমানে বাড়িয়াছে; তবে যে পরিমাণ শিমুল গাছ তার জন্য প্রয়োজন, তাহা আর গ্রামের গাছে কুলায় না; তাই এখন আসামে ইহার চাষ সুরু হইয়াছে। তুঁত, পলাশ, কুলের পাতা রেশম-গুটি ও লাক্ষাকীটের খাদ্য; পশ্চিমবঙ্গেই ইহার চাষ হয়। সাবুই ঘাস হইতে দড়ি হয়। কাগজের কলেও সাবুই ঘাস ব্যবহার হয়। সাবুই ঘাস রাজমহলের পাহাড়ে অপর্যাপ্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গে ও সাঁওতাল পরগণায় সাবুই ঘাস উৎপন্ন হয়।

বাঙলার মোট বর্গ ফল হইতেছে ৭৫,৮৮৫ বর্গ মাইল; ইহার মধ্যে রিজার্ভ বন মাত্র ৬,৫৬১ বর্গ মাইল; রক্ষিত বন ৬৭৩ বর্গ মাইল; অনির্দিষ্ট ৩,৪৪৫; এই মোট ১০,৬৭৯ বর্গ মাইল। অর্থাৎ সমগ্র দেশের ১৪% ভাগ।

বাঙলার বনভূমির আয় (১৯৩১-৩২ অব্দ)

রিজার্ভ বন	কাঠ ও জ্বালানি	১,৮০,৯৪,০০০ ঘন ফুট
	মূল্য	৪,৪৬,৯৩৩৲ টাকা = ৬৮৲ বর্গ মাইলে
রক্ষিত বন	কাঠ ও জ্বালানি	৩,১৩,০০০ ঘন ফুট
	মূল্য	২,২৬৯৲ টাকা = ৩৲ বর্গ মাইলে
অনির্দিষ্ট বনভূমি	কাঠ ও জ্বালানি	১১,৭৪,০০০ ঘন ফুট
	মূল্য	৬৯,০২০৲ টকা = ২০৲ বর্গ মাইলে
বিবিধ	কাঠ ও জ্বালানি	১,৯৫,৮১,০০০ ঘন ফুট
	মূল্য	৫,১৮,২২২৲ টাকা = ৪৯৲ বর্গ মাইলে

ভারতবর্ষের বনভূমি হইতে নানা প্রকার ওষধি, লাক্ষা প্রভৃতি প্রাণীজ সামগ্রী, হরিতকী, এলাচ, খয়ের প্রভৃতি রপ্তানি হয়। ইহার মূল্য—

১৯২৭-২৮	১২,৭৫ লক্ষ
১৯২৮-২৯	১৩,৪৯ ,,
১৯২৯-৩০	১১,৬৬ ,,
১৯৩০-৩১	৬,৯১ ,,
১৯৩১-৩২	৩,৮৯ ,,

প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি বনজাত রপ্তানি সামগ্রী ৩,৮৯ লক্ষের মধ্যে লাক্ষা ১৯৩১-৩২ সালে ১,৭৮ লক্ষ টাকার রপ্তানি সামগ্রী ছিল*; এই লাক্ষা বাঙলা ও বাঙলার উপকণ্ঠে হয়; এবিষয় পরে অন্যত্র আলোচনা হইবে।

*Annual Return of Statistics relating to Forest Administration in British India for the year 1931-32.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাঙলার জীব-জন্তু

গাছপালা রাসায়নিক ক্রিয়াবলে মৃত্তিকার নানা অ-জৈব উপাদান সমূহকে জীবের খাদ্যে পরিণত করে। জীব প্রকৃতি হইতে জল ও লবণ ছাড়া আর কোনো সামগ্রী প্রত্যক্ষভাবে খাদ্যরূপে ব্যবহার করিতে পারে না; সকল খাদ্য বস্তুই উদ্ভিদ্ হইতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমরা পাইয়া থাকি; অ-জৈব প্রাণশক্তিকে জৈব প্রাণশক্তি দান করিতে পারে উদ্ভিদ্। সেইজন্য গাছপালার সঙ্গে জীব-জন্তুর সম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ঠ। গাছের পাতা, ফুল, মধু, ফল, মূল, কন্দ খাইয়া বনের পাখী, হরিণ, শূকর, বন্য মহিষ প্রভৃতি শাকভোজী প্রাণী বাঁচে। এইসব জন্তুদের খাইয়া বাঁচে সরীসৃপ ও হিংস্র পশুরা। মানুষ অধিকাংশ বন্য জন্তুকে মারে, হয় আহারের জন্য, নয় তাহার পক্ষ, লোম, চর্ম, চর্বি বা অস্থির জন্য। কতকগুলি জীবকে সে গৃহপালিত করিয়াছে, কতকগুলি মানুষের সঙ্গ না হইলে বাঁচিতে পারে না। এককালে বাঙলাদেশে বাঘের উপদ্রব ছিল, মানুষ ভয়ে বাঘকে পূজা দিত। মানুষের সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার শক্তি বাড়িলে ও আগ্নেয়াস্ত্রের প্রসার হইলে বাঘের উৎপাত দেশের সীমান্তে আশ্রয় লইয়াছে; মানুষখেকো বড় জাতের বাঘ সুন্দরবন ছাড়া আর কোথায়ও বড় দেখা যায় না; তবে গোবাঘা, হেঁড়েল বা হুড়ার, চিতাবাঘ মাঝে মাঝে এখানে সেখানে উপদ্রব করে। মাংসখেকো আরও দুই একটা প্রাণী এদেশে পাওয়া যায়। যেমন বনবিড়াল, ভাম, শেয়াল, খেঁকশেয়াল; তবে ইহারা মানুষকে না খাইলেও মানুষের গৃহপালিত পশু ও তাহাদের শিশুদের উপর অত্যাচার করে। বিড়াল ও কুকুর এককালে বনে বাস করিত, এখন তাহারা মানুষের সঙ্গী।

হনুমান ও বাঁদর প্রায়ই গ্রামে দেখা যায়; হিন্দু গ্রামে তাহাদের উৎপাতে কোনো শব্জীবাগ, গাছপালা হয় না। মুসলমান গ্রামে তাহারা উপদ্রব সহ্য করে

না বলিয়া এই বুদ্ধিমান জীব সে-সব স্থানে যায় না। মানুষের স্থবিরত্বের চিকিৎসার জন্য বাঁদরের গলগ্রন্থি চিকিৎসকেরা ব্যবহার করেন; সেইজন্য মাঝে মাঝে বাঁদর ধরিয়া য়ুরোপে চালান দেওয়া হয়। ছোটখাটো প্রাণীর মধ্যে ইঁদুরের উৎপাত চাষীদের বিশেষ ক্ষতির কারণ হয়। ছুঁচো এত ক্ষতি করেনা।

হাতী ও গণ্ডার উত্তরবঙ্গের তরাই-বনে ও শ্রীহট্ট-ত্রিপুরার বনে বন্য অবস্থায় পাওয়া যায়। আর্থিক দিক হইতে হাতীর দাম খুবই; কিন্তু বর্তমানে একমাত্র শোভা, শীকার ও সার্কাস ছাড়া হাতী মানুষের বিশেষ প্রয়োজনে আসে না। পূর্বে গুরুভার উত্তোলনের জন্য, যুদ্ধের জন্য হাতীর দরকার হইত, এখন বৈজ্ঞানিক কলকব্জার সাহায্যে সেইসব কার্য হয়। উট বাঙলার বাহির হইতে আসে। ঘোড়া, গোরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল বাঙলার গৃহপালিত জীবের অন্তর্গত। ঘোড়া চড়িবার জন্য ও গাড়ীটানায় লাগে; কিন্তু চড়িবার উপযুক্ত ভাল জাতের ঘোড়া বাঙলাদেশে হয় না—সবই বাঙলার বাহির হইতে আমদানি। ছেকরা গাড়ী ক্রমশই উঠিয়া যাইতেছে, মোটর গাড়ীর চল দ্রুত বাড়িতেছে; সুতরাং ঘোড়ার ব্যবসায় প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। চট্টগ্রামের বনে 'গয়াল', তরাইতে 'গৌর' নামে বাইসন জাতীয় বন্য প্রাণী আছে। সিকিম অঞ্চলে য়াক্ বা চামরীগাই পাওয়া যায়; তবে এ-সব প্রাণীর সহিত বাঙালীর আর্থিক জীবনের কোনো যোগ নাই। য়াকের পুচ্ছ পূজায় চামররূপে ব্যবহৃত হয়।

বাঙলার গোরুর জাত ভাল নয়; অথচ বাঙলায় চোদ্দআনি লোক চাষী এবং চাষ সম্পূর্ণ নির্ভর করে গোরুর উপর। আমরা অন্যত্র এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

বাঙলাদেশে বহু জাতের পাখী দেখা যায়; কাক, শালিক, চড়াই, পায়রা, প্রায় মানুষের উঠানেই বাস করে—রাত্রিবেলা নিকটের গাছে আশ্রয় লয়। চিল, শকুনি গ্রামের কাছেই থাকে, ইহারা প্রকৃতির মুদ্দাফরাস—মরা জীব-জন্তু খাইয়া ফেলে। এ ছাড়া ঘুঘু, তিতির, বুলবুল, টিয়া, ময়না, মাছরাঙা, কাঠঠোকরা, বৌকথাক', 'চোখগেল' প্রভৃতি বহু জাতের পাখী বাঙালীর কাছে সুপরিচিত। আর্থিক দিক হইতে পায়রার ব্যবসা চলে, তবে সে ভাল জাতের পায়রা হওয়া চাই।

বাঙলাদেশে নদী, পুকুর, বিল, বাঁধ অসংখ্য। এই সকল জলাশয়ে বিচিত্র রকমের মাছ আছে: রুই, মৃগেল, কাতলা, কালবোশ, বোয়াল, ইলিশ, কই, মাগুর। ছোট মাছও অনেক জাতের পাওয়া যায়। অর্থকরী দিক হইতে ইহা বাঙলার একটা প্রকাণ্ড সম্পদ্। বাঙালী মৎস্যাশী জাত; সেইজন্য এদেশে মাছ ধরিবার ও বিক্রয় করিবার জন্য জাতই উঠিয়াছে। কৈবর্ত বা জেলেরা মাছ ধরে। পূর্ববঙ্গে তাহাদের বড বড প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু কোনো কোনো স্থানে মাছ বিক্রয়ের ব্যবসাটা নিকারিরা করে। নিকারিরা মুসলমান—ইহাদের মেয়েরাও মাছ বিক্রয় করে। গোয়ালন্দ ইলিশ মাছের কেন্দ্র; এখান হইতে ট্রেন করিয়া বরফ চাপা মাছ বাঙলাব নানা স্থানে যায়। সাহেবগঞ্জের নিকটেও কয়েকটি স্থান মাছের ব্যবসার কেন্দ্র। বাঙলাদেশে যে লক্ষ লক্ষ পুকুব আছে, সেগুলির সংস্কাব কবিলে কেবল যে জলের ও সিঁচের সমস্যা দূর হয় তাহা নহে, বাঙালীর খাদ্য-সমস্যাও কিয়ৎপরিমাণে সমাধান হয়।

নদীতে কুমীর, হাঙর, কচ্ছপ থাকে। কচ্ছপ বা কাঠুয়া লোকে খায়; কিন্তু কুমীর, হাঙর মানুষকেই খায়। তবে ইহারা নদীতে পরিত্যক্ত মরা জীবজন্তুও আহার করিয়া জলকে কিয়ৎপরিমাণে নির্দোষ করে।

সরীসৃপের মধ্যে গোখুরা, কেউটে, চিতে, করাটি, চন্দ্রবোডা বিষাক্ত; হেলে, দাঁড়াস সর্বদাই চোখে পড়ে। সাপে ইঁদুর খায়। সেদিক হইতে ইহারা চাষীর উপকার করে। গোসাপ বনে থাকে, ইহাদের চামড়া চড়া দামে বিক্রয় হয় বলিয়া লোকে এই জন্তুটাকে প্রায় শেষ করিয়া ফেলিয়াছিল, সরকাব হইতে ইহাদের হত্যা নিষেধ করা হইয়াছে। সাপের চামডা ট্যান্ করিয়া ভাল দামে বিক্রয় হয়।

পোকামাকডের অভাব বাঙলায় নাই, মাছি, মশা, মাকডশা, ভ্রমর, বোল্তা, গুবরেপোকা মানুষের বহুবিধ সুখ দুঃখের কারণ। মাছি কলেরা, প্লেগ প্রভৃতি ব্যাধির বীজাণু বহন করে; মশা মেলেরিয়ার বাহক। বহু লক্ষ লোকের মৃত্যুর জন্য এই দুটি ক্ষুদ্র প্রাণী দায়ী। মৌমাছি চাক বানায়, মধু হয়। কিন্তু বাঙলাদেশে মক্ষিকার চাষ লোকে করে না, বিদেশে ইহার চাষ লোকে করে।

বহুবিধ পিপীলিকা ও পোকা দেখা যায়; পিঁপড়া, ছারপোকা, পিশু, উকুন,

আটুলী, জোঁক গৃহস্থকে নানা ভাবে উত্যক্ত করে। মানুষকে সর্বদাই ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহু প্রকারের শত্রুর সহিত নিরন্তর বিবাদ করিয়া জয়ী হইতে হয়। বোধ হয় প্রকৃতির উৎপাত এদেশে যতভাবে মানুষকে সহিতে হয়, এমন কোনো দেশে হয় না। তবুও বাঙালী এই প্রকৃতিকে জয় করিয়া, তাহার সহিত সখ্যতা করিয়া বড় হইয়া উঠিয়াছে।

জীব-জন্তুর আক্রমণে মৃত্যু

	বাঙলা	বিহার-উড়িষ্যা	ভারতবর্ষ
বন্য জন্তুর আক্রমণে	২৭১	৬৩৬	৩,৩৬০
সর্পাঘাতে	৪১৬৫	৪৪২১	১৯,৩৯৬
বন্য জন্তু ও সর্প মারিবার জন্য সরকারী পুরস্কার	৮০১২	১২৮০৪	২,১১,৮৫৯

উপরের তালিকা ১৯২১-২২ সালের। ১৯৩১-৩২ সালে ঐ তালিকা সরকারী ষ্ট্যাটিষ্টিকে দেওয়া নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাঙলার নৃ-তত্ত্ব

বাঙালী জাতি নৃ-তত্ত্বের কোন্ পর্যায়ে পড়ে, তাহা লইয়া বহুদিন ধরিয়া নানা আলোচনা চলিতেছে। বাঙলাদেশের চতুর্দিকে যে-সকল আদিম জাতি বাস করে, তাহাদের সহিত সংমিশ্রণে বাঙালীর দৈহিক গঠন কিছু পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা। অতএব তাহাদের দৈহিক গঠন কিরূপ, তাহা প্রথমে আমাদের বুঝা দরকার।

বাঙলার পশ্চিমদিকে বিহারীদের ছাড়িয়া দিলে সাঁওতাল, কোল, ওরাওঁ প্রভৃতি আদিম জাতির বাস। ইহারা অধিকাংশ খর্বাকার, দীর্ঘ-করোটি-বিশিষ্ট এবং খর্ব্বনাসা। বাঙলাদেশে যে-সকল বিহারী বসবাস করে, তাহারা অধিকাংশ শহর বা কল-কারখানায় কাজ করিবার জন্য আসিয়াছে; সেইজন্য তাহাদের শহরের আশপাশেই ঘনীভূত দেখা যায়। কিন্তু কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতি পার্শ্ববর্তী প্রদেশ হইতে বাঙলাদেশে প্রধানত চাষ-আবাদের কাজের জন্যই আসিয়া থাকে। সেইজন্য বাঙলার পশ্চিমবর্তী প্রায় সমস্ত জেলাগুলিতেই তাহাদের যথেষ্ট সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। মেদিনীপুর, বীরভূম, বর্দ্ধমান, মালদহ, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায় হাজার করা লোকের মধ্যে ৫০ হইতে ১০০ জন ঐ সকল জাতি হইতে আসিয়াছে। জলপাই-গুড়িতেই কেবল তাহাদের সংখ্যা তদপেক্ষা বেশী; ইহা কেবল চা-বাগানের কল্যাণে হইয়াছে।

এইসকল জাতির সহিত সংমিশ্রণে বাঙালীর দেহের যে কিছু কিছু পরিবর্তন হয় নাই তাহা নহে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বীয় জাতীয় আচার-ব্যবহার ত্যাগ করিয়া হিন্দু হইয়া গিয়াছে। নূতন নাম গ্রহণ করিয়া স্বীয় মাতৃভাষা পরিহার করিয়া তাহারা কেহ কেহ নিম্নবর্ণের হিন্দুতে পরিণত হইয়াছে, এবং তাহাদের সহিত সংমিশ্রণে নিম্নবর্ণের হিন্দুর মধ্যে রক্তেরও কিছু কিছু তারতম্য সাধিত হইয়াছে।

বাঙলার উত্তরে. লেপচা, ভুটিয়া এবং পূর্বাঞ্চলে চাকমা প্রভৃতি গোল-করোটি-বিশিষ্ট মঙ্গল জাতির বাস। তদ্ভিন্ন ব্রহ্মপুত্র নদীর আশপাশে যে-সকল মঙ্গল জাতি বাস করে, তাহাদের করোষ্ঠ গোল না হইয়া দীর্ঘ। বাঙালীর মাথা মাপিলে দেখা যায় যে, বাঙালী মোটের উপর গোল অথবা মধ্যমাকার করোটি-বিশিষ্ট। ইহা দেখিয়া রিস্‌লি সাহেব কল্পনা করিয়াছিলেন যে, বাঙালীর দেহে লেপচা-ভুটিয়া বা চাকমা প্রভৃতি জাতির ন্যায় মঙ্গল জাতির রক্ত যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান আছে। বাঙালীর গোল করোটি বস্তুত কোথা হইতে আসিল, তাহা ভাবিবার বিষয়। বিরজাশঙ্কর গুহ মহাশয় এই বিষয়ে বহু গবেষণার ফলে স্থির করিয়াছেন যে, মঙ্গল রক্তই বাঙালীর গোল করোটির জন্য দায়ী, রিস্‌লি সাহেবের এই ধারণা ঠিক নহে। বাঙালী যদি মঙ্গলদের সহিত সংমিশ্রণের ফলে গোল-করোটি পাইত, তাহা হইলে উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে বাঙালীর মাথা বেশী গোল দেখা যাইত।

কিন্তু বাঙালীদের মধ্যে ঐরূপ লোকের সংখ্যা উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে বেশী না হইয়া বরং দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকেই বেশী। দ্বিতীয়ত লেপচা, ভুটিয়া প্রভৃতি জাতির মাথা গোল হইলেও তাহাদের নাসিকার গঠন বাঙ্গালীর নাসিকা হইতে এতই পৃথক যে বাঙালীর দেহে ঐ জাতীয় রক্ত বিশেষ আছে—একথা বলা চলে না। অতএব বাঙালীর জাতিগত ইতিহাসের সমস্যা অত্যন্ত জটিল হইয়া দাঁড়াইল।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, নিম্নবর্ণের বাঙালীর মধ্যে খর্বনাসা, দীর্ঘ করোটির কিছু কিছু সংমিশ্রণ পাওয়া যায়; এবং তাহার জন্য নিকটবর্তী আদিম জাতি সমূহের উপস্থিতি যথেষ্ট কারণ। আর্যাবর্তে ইহা ভিন্ন দীর্ঘ-করোটি-বিশিষ্ট আরও একটি জাতির সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারা দীর্ঘনাসা এবং দীর্ঘকায়। বাঙালী উচ্চবর্ণের মধ্যে ইহাদের সংমিশ্রণ কিছু কিছু পাওয়া গেলেও মোট বাঙালীর দৈহিক গঠন ইহার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ধরা পড়ে না।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকের সহিত দৈহিক গঠনের তুলনা করিলে বাঙালীর মত কেবল আর দু-একটি জাতি পাওয়া যায়। গুজরাটীগণ দেহের গঠনে মোটের উপর বাঙালীর মত। তাহারাও মধ্যমাকার, গোল অথবা

মধ্যমাকার করোটি-বিশিষ্ট এবং দীর্ঘনাসা। উভয় প্রদেশের মধ্যে সামাজিক গঠনগত কিছু কিছু সাদৃশ্য যে আছে, তাহারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

কিছুকাল পূর্বে দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয় প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণগণের পদবী ও বাঙলার কায়স্থগণের পদবীর মধ্যে বহু মিল আছে। ঐতিহাসিক তথ্যের দ্বারা তিনি আরও সিদ্ধান্ত করেন যে, বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতেও ব্রাহ্মণের বাস ছিল, এবং তাঁহারা ও গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণেরা একই স্থান হইতে রওয়ানা হইয়া ভারতের দুই প্রান্তে উপনিবেশ স্থাপন করেন। বিহার-উড়িষ্যায় সেই প্রাচীন ব্রাহ্মণগণের যে পদবী ছিল, পরবর্তীকালে কায়স্থগণের মধ্যেও ঠিক সেই পদবী পাওয়া যায়।

রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের মতে গুজরাটী ও বাঙালীদের পূর্বপুরুষেরা বৈদিক আর্যজাতি সমূহ ভারতে প্রবেশ করিবার পূর্বেই এদেশে আসেন এবং বৈদিক জাতিদের প্রসারের কালেই তাঁহারা ক্রমে আর্যাবর্তের প্রান্তভাগে ছড়াইয়া পড়েন। অধ্যাপক ঘুরিয়ে মনে করেন যে, চন্দ মহাশয়ের মত এ বিষয়ে ঠিক নহে। গুজরাটী-বাঙালীর পূর্বপুরুষেরা উত্তর-পশ্চিম পথে ভারতবর্ষে না আসিয়া বরং সমুদ্র পথে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি মনে করেন। তাহার কারণ গুজরাটী ও বাঙালীর মত গোল-করোটি-বিশিষ্ট জাতি আমরা আর্যাবর্তের ঠিক দক্ষিণ সীমান্তে না পাইয়া বরং গুজরাট, কানাড়া, কুর্গ, মহীশূর, উড়িষ্যা ও বাঙলার—অর্থাৎ সমুদ্রের নিকটবর্তী প্রদেশ সমূহের মধ্যেই পাইতেছি। অতএব এই গোল-করোটি-বিশিষ্ট জাতি পাঞ্জাবের দিক দিয়া ভারতে না আসিয়া বরং সমুদ্র পথে আসিয়াছিলেন—ইহাই সমীচীন বলিয়া বোধহয়।

যাহাই হউক, কোন্ মতটি যে সম্পূর্ণ সত্য, তাহা এখন পর্যন্ত স্থিরভাবে বলা যায় না। যেখানে তথ্যের অপ্রাচুর্য থাকে, সেখানেই জল্পনা-কল্পনার প্রাচুর্য হয়। বাঙালী জাতির দেহের গঠন ঠিক কিরূপ, তাহা আমরা এখন পর্যন্ত অতি অল্পই জানি। বাঙালী ব্রাহ্মণের মধ্যে দীর্ঘ-করোটি কত, গোল-করোটি কত, কায়স্থের মধ্যে তাহাদের অনুপাত কিরূপ, কোন্ জেলায় বা সে অনুপাত কেমন, তাহা যতদিন না বহু মাপের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, এবং

যত দিন না সেইসব মাপজোখের ফল ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মাপজোখের সঙ্গে তুলনা করা হইতেছে, ততদিন স্থির কিছু বলা যায় না। বস্তুত যতই মাপ ভাল করিয়া লওয়া যাইতেছে, ততই বাঙালী জাতির ইতিহাস উত্তরোত্তর জটিল হইয়া উঠিতেছে। কিছুদিন পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাপ লওয়ার ফলে দেখা গিয়াছিল যে, মৈমনসিংহ জেলার লোক অন্যান্য জেলার লোকের চেয়ে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ-করোটি-বিশিষ্ট। ইহার কারণ প্রচলিত মতগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না। অতএব মোটের উপর এখন আমাদের শুধু এইটুকুই বলা চলে যে, বাঙালীর দেহে গুজরাটী, দক্ষিণ মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশবাসীর লক্ষণের মত কতকগুলি লক্ষণ থাকিলেও তাহার সহিত এক দিকে আর্যাবর্তের ও অপরদিকে আদিম কোল, ভীল ও মঙ্গলীয় জাতিসমূহের কিছু কিছু সংমিশ্রণ হইয়াছে। কিন্তু কোন্ বর্ণের মধ্যে কত, কোন্ জেলায় কিরূপ, তাহা বলিবার সময় এখনও হয় নাই। বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন জাতের মধ্যে বৈজ্ঞানিক আদর্শে আরও বহু মাপজোখ লইলে তবে এ বিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্তে পৌঁছিবার সময় আসিবে।

শরীরের মাপের মধ্যে যেমন একটি জাতির ইতিহাসের সামগ্রী পাওয়া যায়, তাহার আচার-ব্যবহারের পরীক্ষা দ্বারা তেমনই কিছু কিছু পাওয়া যাইতে পারে। বাঙালী জাতি ভাত খায়, বিবাহ, শ্রাদ্ধ-তর্পণ প্রভৃতি পুণ্য কার্যে চালের ব্যবহার করে, রন্ধনে তৈল প্রয়োগ করে, ঝাড়-ফুঁক, মন্ত্র-তন্ত্র প্রভৃতির ক্রিয়ায় তৈল ও চাউল ব্যবহার করে, মাটির দেওয়ালে খড়ের চাল দেয়, গোড়ালিঢাকা জুতা না পরিয়া চটি জুতা পায় দেয়, মাথায় পাগড়ি বা টুপি পরে না, চাদর পরে, জামাও যাহা পরে তাহার নাম বাঙলা নহে, নিজের বলিতে কেবল ধুতি-চাদরই বুঝায়। এইসকল লক্ষণের সহিত আর্যাবর্তের তুলনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সেখানে লোকে পুণ্য কার্যে গম, যব বা চাল সবই ব্যবহার করে, তৈলের পরিবর্তে ঘৃতের ব্যবহার করে, খোলার বা মাটির পেটা ছাদ দিয়া ঘর বানায়, চটির পরিবর্তে গোড়ালি-ঢাকা জুতা পরে, মাথা খালি রাখে না, সেলাই করা জামা, এমন কি পাজামা ও ঘাঘরা পর্যন্ত পরে। মোটের উপর, জীবনধারণের সাধারণ অনুষ্ঠানে তাহারা যে বাঙালী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, একথা বলা যায়। অথচ বাঙালীর ভাষার সহিত

আর্যাবর্তেরই মিল আছে, দাক্ষিণাত্যের নাই। কিন্তু সেই দাক্ষিণাত্যেরই সহিত আমরা বাঙালীর আচার-গত সম্পর্কের সন্ধান পাইয়া থাকি। ইহা কি আশ্চর্যের বিষয় নহে যে, উল্লিখিত লক্ষণগুলির সন্ধান করিলে আমরা আর্যাবর্তের পরিবর্তে দাক্ষিণাত্যের সহিতই বাঙালীর যোগ-সূত্র দেখিতে পাই?

সমস্ত দাক্ষিণাত্যে ভাতের চলন আছে। সেখানে খাবার জন্য তেলেরও ব্যবহার আছে, তবে তাহা প্রদেশভেদে কোথাও নারিকেলের, কোথাও বা তিলের হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যে লোকেরা জুতার পরিবর্তে চটির মত পাদুকা ব্যবহার করেন, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতি মাথায় কিছু দেন না এবং পরিধানে ধুতি-চাদর ভিন্ন কিছু পরেন না। যাহাও পরেন তাহাও বাঙালীর মত ভিন্ন প্রদেশ হইতে বা ভিন্ন জাতির অনুকরণে আমদানি করা সামগ্রী। ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, ভাষায় বা দৈহিক গঠনে বাঙালী আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম প্রান্তস্থ জাতিগুলির সহিত সম্পর্কিত হইলেও দৈনিক জীবনের অনুষ্ঠানে তামিল, তেলেগু প্রভৃতি দ্রাবিড়ী জাতির সহিত এত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সুখের বিষয় নৃ-তত্ত্বের দৃষ্টিতে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সকল দেশেই সর্ব কালেই দৈহিক গঠন, আচার, অনুষ্ঠান এবং ভাষার ইতিহাসের মধ্যে এরূপ গরমিল দেখিতে পাওয়া যায়। একজাতি এক দিক হইতে আসিল, অপর কাহারও প্রভাবে পড়িয়া স্বীয় জীবনযাত্রার পদ্ধতি পরিহার করিয়া আর কাহারও বা সঙ্গলাভে ভাষান্তর গ্রহণ করিল—ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙালীরও তাহাই হইয়াছে। তবে সুখের বিষয় বাঙালী যেমন পাইয়াছে, তেমনই কিছু কিছু দানও করিয়াছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেন যে, বাঙালীর এইরূপ বিশিষ্ট দান অনেকগুলি আছে। হস্তিচিকিৎসা, বিশেষ একটি ন্যায় দর্শন প্রভৃতি বাঙালীর নিজস্ব দান। ইহা ছাড়া, স্থাপত্য এবং শিল্পরীতিতে বাঙালীর যে বিশিষ্ট দান আছে, তাহাও আমরা জানি। বাঙালী জাতি আশপাশের প্রদেশ হইতে কতখানি লাভ করিয়াছে, কতখানিই বা স্বীয় প্রতিভা বলে তাহাতে যোগ দিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে গবেষণার অনেক ক্ষেত্র রহিয়াছে। সে সম্বন্ধে যথেষ্ট অনুসন্ধান করিলে তবে আমরা বাঙালী জাতির প্রকৃত ইতিহাসের সম্যক্ সন্ধান লাভ করিতে পারিব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাঙলা ভাষা

পৃথিবীতে মোট ভাষা উপভাষার সংখ্যা ২৭৯৬; বেশ চল্‌তি ভাষা ও উপভাষার সংখ্যা ৮।৯ শ' বলিয়া ধরা হয়। ইহার মধ্যে ভারত সাম্রাজ্য অর্থাৎ বর্মাসমেত ভারতেই ২২০টি; বর্মাকে বাদ দিলে ভারতবর্ষের মধ্যে ১৪৬টি ভাষা পাওয়া যায়। ছোট ছোট ভাষা বা উপভাষাকে বৈজ্ঞানিক ভাবে চুলচেরা ভাগ করিয়া এতগুলি ভাষা দেখানো সম্ভব হইয়াছে; আবার এই ভাষাগুলির অধিকাংশই উত্তর-ভারত ও পূর্ব-ভারতের পার্বত্য প্রদেশে সীমাবদ্ধ; এক ভাষাভাষী লোকেরা বহুকাল বিভিন্ন পার্বত্য উপত্যকায় বিচ্ছিন্নভাবে বাস করিবার ফলে বর্ত্তমানে পৃথক ভাষাভাষী বলিয়া পরিগণিত হইতেছে; ইহাদের কোনো সাহিত্য নাই। খ্রীষ্টান পাদ্‌রীরা এইসব ছোট ছোট উপভাষাতেই বাইবেল ও খ্রীষ্টানী বই অনুবাদ করিয়া এই সব প্রান্তিক উপভাষার মধ্যে ভেদ-বিভেদকে দূরপনেয় করিয়া তুলিয়াছেন; ইহাদের চেষ্টায় এইসব প্রান্তিক আদিম ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে; যদিও ইহাদের অধিকাংশই খ্রীষ্টানী বই।

ভারতের ভাষাগুলি চারিটি মুখ্য আর স্বতন্ত্র শ্রেণী বা গোষ্ঠীতে পড়ে। (১) আর্য গোষ্ঠী বা সংস্কৃত ভাষাবর্গ, (২) দ্রাবিড় গোষ্ঠী, (৩) কোল গোষ্ঠী, (৪) ভোট-চীনা গোষ্ঠী। আসাম ও বর্মার সীমান্তে, তিব্বত ও হিমালয়ের প্রান্তদেশে বাঙলাদেশের পূর্বসীমান্তে ভোট-চীনা ভাষার অনেকগুলি শাখা আছে। তিব্বতী আর বর্মী ছাড়া উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কোনোটির মধ্যে নাই। প্রাচীন তিব্বতী ভাষার পোনর আনা বই সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পুরাণা বাঙলা হইতে অনুবাদিত। তিব্বতীদের মধ্যে ধর্ম প্রচারের জন্ম দার্জিলিঙে খ্রীষ্টানদের মিশন আছে; সেখানে বর্তমান তিব্বতী ভাষায় অনেক বই লেখা হইয়াছে। খাশি জাতির মধ্যে একটি সাহিত্য খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্মদের সহায়তায় সৃষ্ট হইয়াছে; বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা এখন এই ভাষায় গৃহীত হয়

কোল ভাষা এখন ছোটনাগপুরে আর মধ্য-ভারতে নিবদ্ধ; কিন্তু এক সময়ে সমগ্র উত্তর-ভারতে ইহা প্রচলিত ছিল। ইহাই ভারতের প্রাচীনতম ভাষা বলিয়া পণ্ডিতরা অনুমান করেন। বাঙলাদেশের পশ্চিমে বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান জেলার সাঁওতালরা এই বিরাট কোল জাতির অন্তর্গত। ডুমকায় সাঁওতালদের জন্য প্রকাণ্ড দানিশ ও নরওজিন খ্রীষ্টান মিশন আছে; রোমান অক্ষরে তাহাদের ভাষা লেখা হয় এবং এখন অনেকগুলি বই খ্রীষ্টানদের কৃপায় হইয়াছে। নরওয়ের পণ্ডিতপ্রবর বোডিং (Bödding) সাহেব সাওতাল-দের ভাষার বিরাট অভিধান প্রণয়ন করিয়াছেন। দ্রাবিড় গোষ্ঠী-অন্তর্গত ভাষা হইতেছে তেলেগু, তামিল, মালায়লী, কানাড়ী। চাকুরী, শিক্ষা বা ব্যবসার জন্য সামান্য সংখ্যক লোক বাঙলায় বাস করে।

আর্যগোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষা হইতেছে সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ। নানা প্রাকৃত বা সাধারণ লোকের ভাষা হইতে বর্তমান ভারতের দেশীয় ভাষাগুলি হইয়াছে, যেমন—পাঞ্জাবী, গুজরাটী, সিন্ধী, মারাঠী, রাজস্থানী, হিন্দী, বিহারী, বাঙলা, ওড়িয়া, আসামী। মৈথিলী বা বিহারী, বাঙলা, ওড়িয়া, আসামী ইত্যাদি ভাষা মাগধী-প্রাকৃত নামে একটি প্রাচ্য প্রাকৃত ভাষা হইতে উদ্ভূত। আসামী ও মৈথিলী বাঙলা অক্ষরেই লেখা হয়; ওড়িয়া লিপি বাঙলা হইতে খুব পৃথক নহে। এভাষাগুলিকে একই ভাষায় নানা উপভাষা বলিতে পারিতাম, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে মিথিলা ও উড়িষ্যা বাঙলা হইতে বহুকাল পৃথক হইয়া গিয়াছে; আধুনিক যুগে আসামও পৃথক হইয়াছে। বাঙলা ভাষাকে পূর্বে গৌড়ীয় ভাষা বলিত; বাঙলা ভাষা বলিতে কেবল পূর্ববঙ্গের ভাষা বুঝাইত, যেমন বঙ্গ বলিতে পূর্ববঙ্গ বুঝাইত।

বাঙলাভাষাভাষী যে কেবল বাঙলায় আছে, তাহা নহে; আমরা পূর্বেই বলিয়াছি বিহার, উড়িষ্যা, আসামে বাঙালীর বাস আছে; বর্মায় অনেক বাঙালীর বাস। খাশ বাঙলায় যারা বাঙলা ভাষা বলে, তাদের সংখ্যা ৪ কোটি ৭১ লক্ষ; বাঙলার বাইরে আরও ৬৪ লক্ষ বাঙলাভাষী আছে; মোট বাঙলা-ভাষীর সংখ্যা ৫½ কোটির কম নহে। লোক-সংখ্যার দিক হইতে ধরিলে পৃথিবীর প্রধান আটটি ভাষার মধ্যে বাঙলা পড়ে; চীনা, ইংরেজি, রুষ, জারমেন, স্পেনীয়, জাপানী ও ভারতের মধ্যে হিন্দীভাষাভাষীর সংখ্যা, বাঙলা হইতে অধিক।

ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ভাষা

১৯৩১

হিন্দী	(পশ্চিমা)	...	৭,১৫,৪৭,০০০
হিন্দী	(পূর্ব)	...	৭৮,৬৭,০০০
হিন্দী	(বিহারী)	...	২,৭৯,২৬,০০০
হিন্দী	(রাজস্থানী)	...	১,৩৮,৯৭,০০০
পাঞ্জাবী	(পূর্ব)	...	১,৫৮,৩৯,০০০
পাঞ্জাবী	(পশ্চিমা)	...	৮৫,৬৬,০০০
সিন্ধী		...	৪০,০৬,০০০
বাঙলা		...	**৫,৩৪,৬৮,৪৬৯**
আসামী		...	১৯ ৯০,০০০
ওড়িয়া		...	১,১১,৯৪,০০০
মারাঠী		...	২,০৮,৮৯,০০০
গুজরাটী		...	১,০৮,৪৯,০০০
তেলেগু		...	২,৬৩,৭৩,০০০
তামিল		...	২,০৪,১১,০০০
কানাড়ী		...	১,১২,০৬,০০০
মালায়লাম		...	৯১,৩৭,০০০
খেরবারি		...	৪০,৩১,০০০
পাহাড়ী		...	২৩,২৫,০০০
ভিল		...	২১,৮৯,০০০
খন্দ		...	১৮,৬৪,০০০
পশতো		...	১৬,৩৬,০০০
কাশ্মীরী		...	১৪,৩৮,০০০
ওরাঁও		...	১০,৩৭,০০০

বাঙালায় দেশভেদে ভাষার ভেদ আছে; শ্রীহট্ট জেলার বাঙলা, ঢাকা-বিক্রমপুরের ভাষা ও রাঢ় অঞ্চলের ভাষার মধ্যে পার্থক্য আছে; কিন্তু সকলেই

এক প্রকার লেখ্য ভাষা লেখে ও বইএর ভাষা বোঝে। এই ভাষা ও সাহিত্য দিয়া বাঙালী এক। এককালে নবদ্বীপের ভাষা লেখ্য বা সাধুভাষা ছিল। এখন পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের ভাষা মিশিয়া একটি ভাষা হইয়াছে, যাহাকে আমরা সাধু বাঙলা বলিয়া থাকি।

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস খুব প্রাচীন না হইলেও পৃথিবীর অন্যান্য চল্‌তি ভাষাগুলি হইতে ইহা অর্বাচীন নহে। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১০০০ অব্দ হইতে বাঙলার ধারাবাহিক নমুনা অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া গিয়াছে। এই সময়ের গুটিকতক গান ছাড়া সাহিত্যের নমুনা কিছু পাওয়া যায় নাই। গানগুলিকে 'চর্যাপদ' বলে; পুথিটি নেপালে পাওয়া গিয়াছিল ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে ১৩২৩ সালে উহা প্রকাশ করেন। এই ৪৭টি গানের রচয়িতা হইতেছেন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ; ৯৫০ হইতে ১২০০ বৎসরের মধ্যে এগুলি লিখিত। ইহাতে প্রাচীন বাঙলার পশ্চিমা অপভ্রংশের কিছু কিছু রূপ আসিয়া গিয়াছে বলিয়া হিন্দীভাষীরাও আজ তাহাদিগকে দাবী করিতেছেন।* এই পুথির বাঙলা বাঙালী আজ বুঝিতে পারে না।

তুর্কী মুসলমানরা বাঙলা জয় করে ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ায়। বাঙলাদেশে তাহার পূর্বের কোনো বাঙলা পুথি পাওয়া যায় নাই। আন্দাজ ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামে একখানি বই পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থে বাঙলা শব্দ ছাড়া অন্য শব্দ নাই।

এই বাঙলা ভাষা প্রাচীন আর্যগোষ্ঠীর ভাষা, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। আর্যরা ধীরে ধীরে পূর্বভারতের দিকে অগ্রসর হন; তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া স্থানীয় লোকে বিজয়ী ঔপনিবেশিকদের ভাষা শিখিল, কিন্তু নিজেদের মত করিয়া অনেক শব্দই উচ্চারণ করিত, যেমন আমরা অনেক ইংরেজি শব্দ সম্বন্ধে করি। এই আর্য-অনার্য মিশ্রণে যে-ভাষা হইল, তাহাই 'প্রাকৃত' নামে চলিত। বাঙলার উপকণ্ঠে বুদ্ধ ও মহাবীর যে-ভাষায় কথা বলিতেন ও ধর্মপ্রচার করিতেন, তাহা মগধের 'প্রাকৃত' ভাষা। ক্রমে সে-ভাষাও বদলাইতে সুরু করে; তাহার পরিবর্তিত রূপকে পণ্ডিতরা বলেন 'অপভ্রংশ';

---

* গঙ্গা, ১৩৩৩ পৌষ-মাঘ সংখ্যা।

এই মাগধী-প্রাকৃত ও অপভ্রংশ হইতে প্রাচীন বাঙলার উৎপত্তি, বিহারী-মৈথিলিরও তাই, আসামীও বটে।

পণ্ডিতরা সংস্কৃত জানিতেন। তাঁহাদের প্রভাবে সংস্কৃত শব্দ বাঙলা ভাষায় বিস্তর আসিয়াছে; কতকগুলি শব্দ ঠিক সংস্কৃত না হইলেও সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত বা গৃহীত; ইহাকে বলা হয় 'তৎসম' শব্দ। আর প্রাকৃত হইতে যে-শব্দগুলি গৃহীত হইয়া বাঙলা ভাষায় আসিয়াছে, সেগুলিকে প্রাকৃত-জ বা 'তৎভব' শব্দ বলা হইয়াছে। এছাড়া বিকৃত সংস্কৃত শব্দও বাঙলায় আছে।

সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দ ছাড়া যেগুলির উৎপত্তি নির্ণয় করা সম্ভবপর হয় নাই, সেগুলিকে 'দেশী' শব্দ বলা হয়। এছাড়া নানা বিদেশীর সহিত রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সাংস্কৃতিক সম্বন্ধহেতু বহুশত শব্দ বাঙলাভাষার মধ্যে আসিয়াছে এবং এখনো আসিতেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে 'দাম' শব্দ; পূর্বে এদেশে, বোধহয়, টাকার প্রচলন ছিল না; গ্রীক্‌দের দ্রাখমে' (Drachme) ছিল টাকা; সেই মুদ্রা ব্যবহৃত হইত বলিয়া কালে কোনো জিনিষের মূল্য বলিতে 'দ্রাখমে' বা দাম শব্দ চল্‌তি হইল। পারসিক 'পুস্ত' শব্দের অর্থ চামড়া; মধ্য-এশিয়া ও পারস্যে চামড়ার উপর বই লেখা হইত; 'পুস্ত' হইতে 'পুস্তক', প্রাকৃত পোত্থয়, পরে বাঙলা পোথা, পুঁথি, পুথি হইয়াছে।

ত্রয়োদশ শতকে তুর্কী মুসলমানরা বাঙলাদেশ জয় করে; বিদেশী শব্দের আমদানী আরম্ভ হইল। তুর্কীরা ঘরে তুর্কী বলিত; কিন্তু সাহিত্যে ও রাজ-কার্যে ফারসী ভাষা ব্যবহার করিত; তাহাদের দ্বারা ফারসী শব্দের প্রচলন বাঙলায় আসিল। বিশেষ করিয়া আকবর শাহের বাঙলা জয় ও জমি বন্দবস্তর পর হইতে ফারসী পারিভাষিক শব্দের চলন আরও বাড়িল। ফারসীর মধ্যে বহু আরবী ও তুর্কী শব্দ আছে; সেগুলিও বাঙলায় ঢুকিল। রাজদরবার, লড়াই, শীকার, রাজস্ব, শাসন, আইন, ইসলাম ধর্মসংক্রান্ত, সভ্যতা, ব্যবসা শিল্প-কলা, বিলাসদ্রব্য, সংস্কৃতি-মূলক প্রায় ২৫০০ শব্দ বাঙলায় নিত্য-নৈমিত্তিক কাজে ব্যবহৃত হয়। হিন্দু ও ইসলাম সংস্কৃতির সংমিলনে ভারতে উর্দুভাষার উদ্ভব হয়; বাঙলার মধ্যে যে-সব মুসলমান উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে আসিয়া এদেশে বাস করিতেছে, তাহাদের মধ্যে এখনো উর্দুভাষা চলিত আছে।

তার পর ১৬শ শতাব্দী হইতে ফিরাঙ্গী বা পোর্তুগীজ শব্দের আমদানী হয় ; ব্যবসা করিবার জন্য ইহাদিগকে এদেশে মুঘল সম্রাটরা স্থান দেন ; সেই অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য তাহারা বাঙলাদেশে যথেষ্ট উৎপাত করিয়াছিল। বাঙলায় এক শতের কিছু অধিক পোর্তুগীজ শব্দআছে—আনারস, চাবী, তামাকু, তোয়ালিয়া, বাল্‌তি, গুদাম, গির্জা, তোড়ঙ্গ প্রভৃতি খুব জানা কথাগুলি পোর্তুগীজ।

ইহার পর ফরাসী ও ওলন্দাজরা বাণিজ্য করিতে আসে ; তাহাদের দুই চারিটা শব্দ বাঙলায় পাওয়া যায়। খুব সুপরিচিত ফরাসী শব্দ পাঁউরুটি ; প্যাঁ মানে রুটি।

খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতকের মধ্যভাগে ইংরেজ বাঙলার রাজত্ব পায় ; পৌনে দুই শত বৎসর ইংরেজ এদেশে আছে। য়ুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের শত শত শব্দ আজ বাঙলার মধ্যে ঢুকিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, শিক্ষিত বাঙালীর লেখা ও কথাবার্তার মধ্যে অসংখ্য য়ুরোপীয় শব্দ আসিয়াছে। একদিন মুসলমান-দের সংস্পর্শে আসিয়া এমনিভাবেই শত শত ফারসী শব্দ লোকের মধ্যে প্রচলিত হইয়া উর্দু ভাষা সৃষ্টি করিয়াছিল ; ফারসী ও ভারতীয় ভাষা নিকট আত্মীয় বলিয়া উভয়ে মিলিত হইয়া উর্দুর ন্যায় একটি মিষ্ট জোরালো ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু য়ুরোপীর ভাষার সংমিশ্রণে সেরূপ সাহিত্য হইতে পারে না। বৈজ্ঞানিক বিষয়াদি লিখিতে বহু য়ুরোপীয় পারিভাষিক শব্দ বাঙলাকে লইতে হইয়াছে এবং হইবে—বিশেষ করিয়া যে-সব বৈজ্ঞানিক শব্দ আন্তর্জাতিক শব্দ হইয়া গিয়াছে, তাহা গ্রহণ করা দূষণীয় নহে।

"বাঙলা ভাষা এক হাজার বৎসরের অধিক কাল হইল উদ্ভূত হইয়াছে। ইহাতে ইহার নিজস্ব প্রাকৃত-জ শব্দ আছে ; বিশুদ্ধ ও বিকৃত সংস্কৃত শব্দ আছে ; ইহাতে প্রাচীন যুগ হইতেই আগত দেশী বা অনার্য শব্দও কিছু কিছু আছে ; এবং ইহাতে আগত বিদেশী ভাষা ফরাসী, পোর্তুগীজ ও ইংরেজি হইতে গৃহীত শব্দও কম নহে। বাঙলা ভাষায় কতকগুলি শ্রেষ্ঠ কবি ও অন্য লেখক লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের হাতে এই ভাষা অপূর্ব শক্তিযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে।"*

*সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, পৃঃ ১৪০। এই প্রবন্ধের মালমশ্‌লা ঐ গ্রন্থ হইতে অনেক পরিমাণে গৃহীত।

বাঙলার বাহিরে কোন প্রদেশে কত বাঙালী বাস করে, তাহার একটা তালিকা নিম্নে দিলাম—

আসাম প্রদেশ	৩৯,৬০,৭১২	আসামের জন-সংখ্যা ৯২,৪৭,৮৭৫। ইহার মধ্যে আসামীভাষী ২০ লক্ষ মাত্র; অর্থাৎ আসামের বাঙালীর সংখ্যা আসামীদের দ্বিগুণ।
বিহার-উড়িষ্যা	১৮,৫১,৭৯৭	১৫ লক্ষ লোক বাঙলার সংলগ্ন মানভূম ধলভূম, জামশেদপুর, জামতাড়া, কিষণগড়ে বাস করে। পূর্ণিয়া, ডুমকা, সিংহভূমে বাঙালীর বাস আছে।
	৫৮,১২,৫১০	

ব্রহ্মদেশ	...	৩,৭৬,৯৯৪
যুক্তপ্রদেশ	...	২৫,৯৯৩ [কাশীতে ৮,৬৪৮; মথুরায় ৬,১৬১]
দিল্লী	...	৬,৬৩২
মধ্যপ্রদেশ	...	৫,৩৩৫
বোম্বাই	...	৪,২৯৮
পাঞ্জাব	...	২,৪৯৭
মান্দ্রাজ	...	১,৬৭২
	...	৪৩৫
এডেন	...	৩৫৬
উ-প-সীমান্ত প্রদেশ	...	৪১৪
বেলুচিস্থান		৯৩
আন্দামান		১,১৭১
		৬২,৩৯,৩৩৯
দেশীয় রাজ্য		৯৫,২৪২ [আসামে ৫,৬৫১; বিহার-উড়িষ্যায় ৮৫,৭৯০]
		৬৬,৩৪,৫৮১

ভারতের প্রধান ১৫টি ভাষা। প্রত্যেক দশ হাজার লোকের মধ্যে কোন

ভাষা কত লোকে বলে, তাহার তালিকা দিলে বাঙলা ভাষার বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যাইবে।

পশ্চিমা হিন্দী দশ হাজারে ২০৪১, বাঙলা ১৫২৫, বিহারী ৭৯৭, তেলেগু ৭৫২, মারাঠী ৫৯৬, তামিল ৫৮২, পাঞ্জাবী ৪৫২, রাজস্থানী ৩৯৭, কানাড়ী ৩২০, গুজরাটী ৩১০, ওড়িয়া ৩১৯, বর্মী ২৫৩, মালায়লাম ২৬১, পশ্চিমা পাঞ্জাবী ২৪৪।

ইহার মধ্যে পশ্চিমা হিন্দী, বিহারী, রাজস্থানীর সাহিত্যের ভাষা হিন্দী, পাঞ্জাবী ও পশ্চিমা পাঞ্জাবীর ভাষা উর্দু হইয়া আসিতেছে।*

* রামানুজ কর—বঙ্গের বাহিরে বাঙালী, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ১৩৪০, মাঘ, পৃঃ ৫১৬-৫১৮

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বাঙলার সীমান্ত

বাঙলার উত্তরে হিমালয় পর্বত ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। পূর্বে ও পশ্চিমে প্রাকৃতিক বাধা সুস্পষ্ট নহে। বাঙলা প্রদেশ উত্তরদিকে নেপাল, সিকিম ও ভুটানের সহিত সংলগ্ন; ইহার পূর্বদিকে আসাম ও বর্মাদেশ; পশ্চিমে বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশ।

বাঙলার সঙ্গে নেপালের যোগ দার্জিলিং জেলার পশ্চিম দিয়া। নেপাল স্বাধীন রাজ্য; তথায় বহু জাতি বাস করে। গুর্খারা এখানকার অন্যতম বাসিন্দা। বহু নেপালী দার্জিলিঙের অধিবাসী, উত্তরবঙ্গেও তাহারা কিছু কিছু উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে; উত্তর-বর্মায় তাহাদের একটি উপনিবেশ পত্তন করা হইয়াছে। নেপালে পশুপতিনাথের মন্দিরে বহু সহস্র হিন্দু প্রতি বৎসরে তীর্থ করিতে যায়; এই সময় ছাড়া সর্বদাই ঐ দেশে প্রবেশ করিতে হইলে পাশ লাগে। মুজাফরপুরের রকসৌল ষ্টেশন হইতে নেপাল প্রবেশের পথ। নেপালের ব্যবসা-বাণিজ্য সমস্তই কলিকাতার ভিতর দিয়া হয়; কলিকাতাই নিকটতম বন্দর।

নেপালের পূর্বে ও দার্জিলিঙের উত্তরে সিকিম দেশ; ভুটিয়া, লেপচা ও নেপালী এখানকার বাসিন্দা; সিকিমের উত্তরে তিব্বত। সিকিমের রাজা ইংরেজদের মিত্ররাজ। তিব্বতের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ সিকিমের ভিতর দিয়া হয়; দার্জিলিং ইহার কেন্দ্র। সিকিমের পূর্বে ভুটান; ভোটরা বৌদ্ধ। ভোটরা একবার কোচবিহার রাজ্য আক্রমণ করে, তখন ইংরেজের সহায়তায় তাহারা বিতাড়িত হয়। ১৮৬৫ সালে ভোটদের সহিত ইংরেজের শান্তি ও সন্ধি স্থাপন হয়।

কোচরা, মঙ্গল ও দ্রাবিড় বংশজাত জাতি। ১৭৭২ সালে ভোটদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে গিয়া ইংরেজের সংস্পর্শে কোচরা প্রথমে আসে। দেশ শাসনের সহায়তা করিবার জন্য একজন ইংরেজ অভিভাবক ১৮৮৩ সাল

পর্যন্ত সেদেশে ছিল। এদেশের বর্গফল ১৩১৮ বর্গ মাইল, জন-সংখ্যা ৫ লক্ষ ৯০ হাজার।

বাঙলাদেশের উত্তর-পূর্ব কোণে কুচবিহারের সংলগ্ন আসাম প্রদেশ। আসামের তিনটি বিভাগ,—আসাম উপত্যকা, পার্বত্যদেশ ও সুরমা উপত্যকা। জলপাইগুড়ির পাশেই আসামের গোয়ালপাড়া জেলা। ত্রিপুরা ও মৈমনসিংহের সংলগ্ন শ্রীহট্ট। বরাকর নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত; বরাকর সুরমা ও কুশিয়ারা নদীতে বিভক্ত হইয়া পুনরায় মিলিয়া মেঘনায় পড়িয়াছে। ত্রিপুরা জেলার পার্শ্বেই ত্রিপুরা রাজ্য। মুঘলদের সময়ে ইহারা পরাক্রমশালী জাতি ছিল। ত্রিপুরায় নানা জাতি ও ভাষাভাষী লোক আছে, তবে বাঙলা ভাষা অনেকেই জানে। ত্রিপুরার রাজারা বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। ত্রিপুরার পরিধি ৪১১৬ বর্গ মাইল, জন-সংখ্যা ৩ লক্ষ ৮২ হাজার।

আসাম এককালে বাঙলার অন্তর্গত ছিল; এখন পৃথক প্রদেশ হইলেও কতকগুলি বিষয়ে বাঙলার সহিত সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। গোয়ালপাড়া, শ্রীহট্ট, কাছাড় জেলার লোক বাঙলাভাষী অথচ তাহাদিগকে আসামীদের সহিত যুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে; বর্তমানে আসামীদের মধ্যে বাঙালী-বিরোধিতা জাগিয়াছে; আসাম প্রদেশে, আসামী, খাসি ও বাঙালীর সমান প্রভুত্ব হওয়া উচিত; কিন্তু 'আসাম' এই নাম থাকায় আসামীরা মনে করেন, ঐ দেশে মালিক তাঁহারাই। শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া জেলা বাঙলার সঙ্গে মিশাইয়া দিলে সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধান হয়। নানা প্রয়োজনের সম্বন্ধে আসাম বাঙলার উপর নির্ভরশীল। প্রথমত আসামের স্কুল ও কলেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন; কলিকাতার হাইকোর্ট ঐ প্রদেশের চরম বিচারক। আসামের কোনো বন্দর নাই, কলিকাতা ও চট্টগ্রামই ঐ দেশের বন্দর। আসামের প্রধান ঐশ্বর্য চা-বাগিচা; ইংরেজ চা-কররাই বড় বড় বাগানের মালিক; বাঙালী ও আসামী চা-করও আছেন। চা ছাড়া রবার, শিমূল গাছের চাষ হইতেছে। ডিগ্‌বএ-তে কেরাসিনের খনি পাওয়া গিয়াছে। রেলপথে ও নদীপথে বাণিজ্য চলে।

বাঙলার পশ্চিমে উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর ও বিহার। ১৯১১ সাল পর্যন্ত এই বিভাগগুলি বাঙলাদেশের সহিত মিলিত ছিল। মেদিনীপুরের পশ্চিমেও

বাঙলাভাষী লোক পাওয়া যায়; উড়িষ্যায় নূতন প্রদেশ হইতেছে; ওড়িয়াদের ইচ্ছা ছিল মেদিনীপুরের কিয়দংশ গ্রাস করিয়া নূতন প্রদেশের সহিত যুক্ত করেন। মানভূম, সাঁওতাল পরগণায় প্রায়ই বাঙালীর বাস; ভাগলপুর, পূর্ণিয়ার কিয়দংশে বহু বাঙালীর বাস আছে। বিহার ও ডুমকার শ্রমজীবীরা বাঙলায় কাজ পায়; ওড়িয়ারাও তাই। বৈদ্যনাথ, গয়া, পুরী, বিহার, ছোট-নাগপুর ও উড়িষ্যার প্রধান তীর্থে বাঙালীরা প্রতিবৎসর বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া আসে। পুণ্যের নামে অ-বাঙালীরা বাঙালীর কাছ হইতে কি পরিমাণ টাকা প্রতিবৎসর লইতেছে, তাহার কোনো হিসাব এ পর্যন্ত হয় নাই। কিন্তু সে-হিসাব করিবার সময়ও বোধহয় আসিয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ

আয়তন ও জন-সংখ্যা

ভারতবর্ষের মোট আয়তন ১৮,০৫,৩৩২ বর্গ মাইল, ইহার মধ্যে

বৃটীশ ভারত ১০,৯৪,৩০০ বর্গ মাইল।

দেশীয় রাজ্য ৭,১১,০৩২ বর্গ মাইল।

বৃটীশ ভারতের ১০,৯৪ লক্ষ বর্গ মাইলের ৭৭ হাজার বর্গ মাইল হইতেছে খাশ বৃটীশ বাঙলা। জন-সংখ্যা ও ঘনবসতিতে বাঙলা অন্য প্রদেশগুলি হইতে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু আয়তনে প্রধান দশটি প্রদেশের মধ্যে সপ্তম।

		...	আয়তন	
১।	বর্মা	...	২,৩৩,৭০৭	বর্গ মাইল
২।	মান্দ্রাজ	...	১,৪২,২৬০	,,
৩।	বোম্বাই	...	১,২৩,৬২১	,,
৪।	যুক্তপ্রদেশ	...	১,০৬,২৯৫	,,
৫।	মধ্যপ্রদেশ	...	৯৯,৮৭৫	,,
৬।	পাঞ্জাব	...	৯৯,৮৪৬	,,
৭।	**বাঙলাদেশ**	...	**৮৫,৭৭৩**	,,

খাশ বৃটীশ বাঙলা	৭৭,৫২১	বর্গ মাইল।
ত্রিপুরা রাজ্য	৪,১১৬	,,
কুচবিহার	১,৩১৮	,,
সিকিম	২,৮১৮	,,
	৮৫,৭৭৩	বর্গ মাইল *

* সার্ভের হিসাবে বাঙলাদেশের আয়তন ৫,২৬,৬৪৬৬৯ বর্গ একর। ইহার মধ্যে দেশীয় রাজ্য (ত্রিপুরা, কুচবিহার) ৩৪,৭৭,৭৬০ বর্গ একর বাদ দিলে থাকে ৪,৯১,৮৬,৯০৯ একর। এই চার কোটি একানব্বই লক্ষ একর বৃটীশ বাঙলার মধ্যে ৩,৭৮,৫৭,৫৭০ একর চিরস্থায়ী বন্দবস্তের জমিদারী; ১,১৩,২৯,৫৩৯ একর অস্থায়ী বন্দবস্ত।

৮।	বিহার-উড়িষ্যা	...	৮৩,১৬১	বর্গ মাইল
৯।	বেলুচিস্থান	...	৫৪,২২৮	,,
১০।	আসাম	...	৪৩,০১৫	,,
১১।	উ-প-সীমান্ত প্রদেশ	...	১৩,৪১৯	,,
১২।	আন্দামান নিকোবর	...	৩,১৪৩	,,
১৩।	আজমীর	...	২,৭১১	,,
১৪।	কুর্গ	...	১,৫৮২	,,
১৫।	দিল্লী	...	৫৯৩	,,
			১০,৯৪,৩০০	

এইবার দেখা যাক বাঙলাকে জন-সংখ্যার দিক হইতে; বাঙলাদেশের আয়তন ভারতের প্রধান প্রদেশসমূহ হইতে ক্ষুদ্র, কিন্তু জন-সংখ্যার তুলনায় বঙ্গদেশই শ্রেষ্ঠ।

১৯৩১ সালের আদমসুমারী

	জন-সংখ্যা	আয়তন (বর্গ মাইল)		ঘনবসতি
বঙ্গদেশ (সিকিম বাদ)	৫,১০ লক্ষ	৮২,৯৫৫	,,	৬১৬
যুক্তপ্রদেশ	৪,৯৬ ,,	১১২,১৯১	,,	৪৪২
মাদ্রাজ	৪,৭১ ,,	১৪৩,৮৭০	,,	৩২৮
বিহার	৪,২৩ ,,	১১১,৭৮৪	,,	৩৭৯
পাঞ্জাব	২,৪০ ,,	১০৩,০৮৯	,,	২৩৩
বোম্বাই	২,৬২ ,,	১৫১,৫৯৩	,,	১৭৩

বাঙলা আয়তনে সপ্তম, জন-সংখ্যায় প্রথম, সুতরাং এখানে মানুষের বসতি স্বভাবতই ঘন হইয়াছে।

সমগ্র ভারতের ঘনবসতি ১৭৭ জন বর্গ মাইল প্রতি। বৃটীশ ভারতে ২২৬ জন, দেশীয় রাজ্যে ১০১ জন করিয়া। বাঙলাদেশের ঘনবসতি বর্গ মাইল প্রতি ৬১৬ জন; ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সহিত তুলনা করা যাক—

	১৯২১	১৯৩১	
ভারতবর্ষ	১৭৭	সমগ্র দেশ	বৃটীশ প্রাদেশিক
বৃটীশ ভারত	২২৬		
১। বঙ্গদেশ	৬০৮	৬১৬	৬৬৪

	১৯২১	১৯৩১	
		সমগ্র দেশ	বৃটিশ প্রদেশিক
২। যুক্তপ্রদেশ	৪২৭	৪৪২	৪৫৬
৩। বিহার-উড়িষ্যা	৪০৯	৩৭৯	৪১৩
৪। মাদ্রাজ	২৯৭	৩২৮	৩২৯
৫। পাঞ্জাব	২০৭	২৩৩	২৪১
৬। উ-প-সীমান্ত	১৬৮		১৭৯
৭। বোম্বাই	১৫৭	১৭৩	১৭৬
৮। আসাম	১৪৩		১৬৭
৯। মধ্যপ্রদেশ	১৩৯		১৫৫
১০। বর্মা	৫৭		৬৩

বাঙলাদেশের একখণ্ড জমিতে যত লোক বাস করে, মাদ্রাজের সমান খণ্ড জমিতে তার অর্দ্ধেক লোক বাস করে। আর বর্মার এক বর্গমাইলে যত লোক বাস করে, তার দশগুণের বেশি লোক বাস করে বাঙলার এক বর্গ মাইলে। জেলার ঘনবসতির হিসাব দেখিলে হাওড়া প্রধান হয় অর্থাৎ ২১০৫ জন বর্গ মাইলে। হাওড়া বড় শহর, তার অঙ্ক বাদ দিলে, ঢাকা জেলায় ঘনবসতি বোম্বাই-এর শহরতলীর ঘনবসতি হইতে অধিক; ঢাকার ১২৬৫, বোম্বাই-এর শহরতলীর ১১৯৭।

জন-সংখ্যার ঘনবসতি কি ভাবে বৃদ্ধি হইয়াছে এইবার অন্যভাবে দেখাই।

		শতকরা বৃদ্ধি	বর্গ মাইলে
১৮৭২	৪২০		
১৮৮১	৪৪৬	৬.৭%	৭৫ বাড়ী
১৮৯১	৪৮০	৭.৫%	৯২ ,,
১৯০১	৫১৭	৭.৭%	১০১ ,,
১৯১১	৫৫৮	৮.০%	১০৭ ,,
১৯২১	৫৭৪	২.৮%	১১৪ ,,
১৯৩১	৬১৬	৭.৩%	১২০ ,,

১৮৭২ হইতে ১৯৩১ পর্যন্ত ৪৭·২৫ হারে প্রতি বর্গ মাইলে বসতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের অন্য দুইএকটি প্রদেশে কি ভাবে এই বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা দেখা যাক—

	বোম্বাই		মাদ্রাজ	যুক্তপ্রদেশ		ইংল্যাণ্ড-ওয়েলস্
	ঘনবসতি	বাড়ী	ঘনবসতি	ঘনবসতি	বাড়ী	ঘনবসতি
১৮৮১	১৩৩	৬২*		৪১২	৬৫	৪৪৫
১৮৯১	১৫১	৬৮	২৫১	৪৩৮	৭৭	৪৯৭
১৯০১	১৫১	৬৫	২৬৯	৪৪৫	৮১	৫৫৮
১৯১১	১৫৯	৬৬	২৯১	৪৪১	৯২	৬১৮
১৯২১	১৫৬	৭০	২৯৭	৪২৭	৯৩	৬৪৯
১৯৩১	১৭৬	৯১	৩২৮	৪৫৬	৯৫	৬৮৫

গড়ে বাঙলার এক বর্গ মাইলে ১২০টি করিয়া বসত-ঘর আছে ; বর্দ্ধমান বিভাগে বসত-ঘরের অনুপাত সর্বাপেক্ষা বেশি, মাইলে ১৩৯ ; রাজসাহী বিভাগে সর্বাপেক্ষা কম, ১০৯ প্রতি বর্গ মাইলে। বাঙলার বসত-ঘরের সংখ্যা গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক দশকে বাড়িয়াছে ; ১৯২১ সাল হইতে ১৯৩১ সালে প্রত্যেক বর্গ মাইলে ৬ খানি করিয়া ঘর বেশি হইয়াছে ; ১৮৯১ হইতে ২৮ খানি করিয়া বেশি। বাঙলার গ্রাম-অঞ্চলের গড় ঘর বর্গ মাইলে ১১৬ ; হাওড়া ঘনবসতিতে শ্রেষ্ঠ ; সেখানে প্রতি বর্গ মাইলে ৩৪০ খানি করিয়া ঘর ; খুলনা জেলার ঘর সবথেকে কম—বর্গ মাইলে মাত্র ৫৭।

এখানে একটা বিষয় বিশেষ করিয়া ভাবিবার দরকার এই—যে বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা শহর-অঞ্চলেই বেশি, গ্রামে নহে। বাঙলায় নূতন শহর গড়িয়াছে ; মিল-মণ্ডলে ঘনবসতি ও বসত-ঘরের সংখ্যানুপাত বৃদ্ধি পাইয়াছে। টিটাগড় (১৪,১০৫), শ্রীরামপুর (৭,৬৫৬), হাওড়া (৫,৭৯৭), নৈহাটি (৫,৬৩৯), ভাটপাড়া (৪,৯২০), রিশরা (৩,৯৯৪), চাঁপদানী (৩,৪৬৮), গরুলিয়া (৩,১৭৩) প্রভৃতি শহরগুলি শিল্পের কেন্দ্র বলিয়া এসব জায়গায় বর্গ মাইলে ঘরের সংখ্যা

* এই অঙ্কগুলি গুজরাটের।

এত বেশি। স্বাস্থ্য ও সমাজনীতির দিক হইতে ইহা যে শুভ ফলপ্রদ নহে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। শহরে গৃহনির্মাণ লোকের সম্পদের পরিচায়ক; একশ্রেণী লোকের যে পয়সা হইতেছে, তাহার এই একটা বড় নিদর্শন।

বাঙলার প্রতি বাড়ীতে ৫·১ করিয়া লোক বাস করে; বাঙালী পরিবার গড়ে পাঁচ জন লোকের সমষ্টি ধরা যাইতে পারে। সুতরাং সমগ্র বাঙলায় এককোটী গৃহস্থ বা পরিবার আছে অনুমান করা যাইতে পারে।

ভারতের অন্তর্গত প্রদেশগুলির সহিত আমরা যেমন তুলনা করিলাম, তেমনি ভারতের বাহিরের স্বাধীন কতকগুলি দেশের আয়তন ও জন-সংখ্যার সহিত তুলনাও আমরা করিব; জন-সংখ্যা ছাড়া এইসব দেশের অধিবাসীর সহিত বাঙালীর আর কিছুই বর্তমানে তুলনার নাই; কিন্তু বাঙলার এই জন-সংখ্যা পুষ্টিকর খাদ্য, সুন্দর স্বাস্থ্য, প্রচুর আনন্দ ও কর্ম পাইলে যে একটি প্রবল জাতি হইবার মত সম্পদশালী, তাহাই এই তুলনার দ্বারা পরিস্ফুট হইবে। জন-সংখ্যা তখনই সম্পদ অপেক্ষা আপদ হইয়া উঠে, যখন দেশ তাহাদের অন্নদান করিতে পারে না; বাহিরে উপনিবেশের স্থান সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠে। ইংল্যণ্ড-ওয়েলসের আয়তন মাত্র ৫৮ হাজার বর্গ মাইল, বাঙলাদেশ হইতে ২৪০০০ বর্গ মাইল কম, অথচ ঘনবসতি বর্গ মাইল প্রতি সাড়ে ছয় শতের অধিক, বাঙলায় ৬১৬। বেলজিয়ামের আয়তন ১২,০০০ হাজার বর্গ মাইল হইতে কম; আমাদের বর্দ্ধমান বিভাগ হইতে ৮,২০০ বর্গ মাইল কম, অথচ জন-সংখ্যার ঘনবসতি ৬৫৪। বর্দ্ধিষ্ণু জন-সংখ্যাকে যদি কেবল কৃষির উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহা হইলে জন-সংখ্যার বৃদ্ধি আপদ স্বরূপ হইয়া উঠে। নিম্নে কতকগুলি দেশের ঘনবসতির তালিকা দিলাম—

বেলজিয়াম	...	৬৫৪
ইংল্যণ্ড-ওয়েলস্	...	৬৪৯
হল্যাণ্ড	...	৫৪৪
জারমেনী	...	৩৩২
জাপান	...	২১৫
অষ্ট্রিয়া	...	১৯৯
ফ্রান্স	...	১৮৪

স্পেন	...	১০৭
মিশর	...	৩৪
যুক্তরাষ্ট্র	...	৩২
নিউজিল্যাণ্ড	...	১২

ঘনবসতি দ্বারা কিছুই প্রমাণিত হয় না; মিশর ও যুক্তরাষ্ট্রের ঘনবসতি সমান; কিন্তু সভ্যতা ও ঐশ্বর্যের তারতম্য অনেক। সুতরাং বাঙলা ও বেলজিয়াম, ইংল্যাণ্ডের ঘনবসতি এক কোঠায় হইলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়, তাহা বেশি করিয়া বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।

ইংল্যণ্ড ও ওয়েলস্‌এর আয়তন বাঙলা হইতে কম, জন-সংখ্যায়ও সে বাঙলার অনেক তফাতে। ইংল্যণ্ড-ওয়েলসের জন-সংখ্যা ৪ কোটির কিছু কম অর্থাৎ বাঙলার বাসিন্দা হইতে ইংরেজের সংখ্যা প্রায় এক কোটি কম। ফ্রান্সের জন-সংখ্যা ৪ কোটি ৭ লক্ষ, জাপানের ৪ কোটি ৪৭ লক্ষ, ইতালির ৪ কোটি ১১ লক্ষ; জারমেনীর জন-সংখ্যা কোটি খানিক বেশি। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান হইতে বাঙলার জন-সংখ্যা অধিক।

সমগ্র বাঙলাদেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি বাঙলার বিভাগগুলির সহিত বাহিরের স্বাধীন দেশের ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পৃথক পৃথক রাষ্ট্রের জন-সংখ্যা তুলনা করি, তাহা হইলে দেখিব বাঙলার অনেক বিভাগ অনেক রাষ্ট্র অপেক্ষা বৃহৎ।

চট্টগ্রাম বিভাগ	(৬,৮,২৬,০০০)	= সুইডেন (৬১,৬২,০০০)
		= অষ্ট্রেলিয়া (৬৫,০০,০০)
ঢাকা বিভাগ	(১,৩৮,৬৪,০০০)	= চেকোস্লোভাকিয়া (১,৪৭,০০,০০০)
রাজসাহী বিভাগ	(১,০৬,৬৮,০০০)	= কানাডা (১,০৩,০০,০০০)
প্রেসিডেন্সী বিভাগ	(১,০১,০৮,০০০)	= আর্জেণ্টাইন (১,১৬,০০,০০০)
		[১২,৫০০ বর্গ মাইল]
বর্দ্ধমান বিভাগ	(৮৬,৪৭,০০০)	= হল্যাণ্ড (৮০,৬১,০০০)
		[১৯,৯০০ বর্গ মাইল]
		= বেলজিয়াম (৮০,৯২,০০০)
		[১১,৭০০ বর্গ মাইল]

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ৪৮টি পৃথক রাষ্ট্রদ্বারা গঠিত। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রে সিনেট, শাসনপ্রণালী, বিশ্ববিদ্যালয় পৃথক পৃথক। বাঙলাদেশের মৈমনসিংহ জেলার জন-সংখ্যা (৫১,৩০,০০০) হইতে মাত্র ছয়টি রাষ্ট্রের জন-সংখ্যা অধিক; অবশিষ্ট ৪২টি রাষ্ট্রের জন-সংখ্যা এই জেলার লোক-সংখ্যা হইতে কম। সুইজার-ল্যাণ্ডের জন-সংখ্যা ১৩ লক্ষ কম। বর্দ্ধমান জেলার (১৫,৭৫ হাজার) জন-সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের ২০টি রাষ্ট্র হইতে বেশি। ঢাকা জেলার জন-সংখ্যা (৩৪ লক্ষ) ও ডেনমার্কের জন-সংখ্যা প্রায় সমান (৩৫ লক্ষ)। বাখরগঞ্জের জন-সংখ্যা (২৯ লক্ষ) নরওয়ের জন-সংখ্যার মত (২৮ লক্ষ)।

আমরা সংক্ষেপে এই তুলনামূলক জন-সংখ্যাটি এখানে দিলাম; বাঙলার মত দেশ হইয়াও ইংল্যণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান কত প্রবল ও কত শিল্পোন্নতি করিয়াছে! জন-সংখ্যায় বাঙলার জেলার মত দেশ নরওয়ে, ডেনমার্ক প্রভৃতি স্বাধীন রাষ্ট্র! আমেরিকার অধিকাংশ রাষ্ট্রের জন-সংখ্যা হইতে বাঙলার অনেকগুলি জেলার জন-সংখ্যা অধিক! এইবার দেখা যাক, ভারতের জন-সংখ্যার দিক থেকে বাঙলাদেশকে।

সমগ্র ভারতের জন-সংখ্যা ১৯৩১ সালের আদমসুমার অনুসারে ছিল ৩৫,২৯,৮৭,০০০; ইহার মধ্যে বৃটীশ ভারতে বাস করিত ২৭,১৭,৫০,০০০ আর দেশীয় রাজ্যে ৮,১২,৩৭,০০০।

সমগ্র বাঙলার জন-সংখ্যা ছিল ৫,১০,৮৭,৩৩৮; ইহার মধ্যে দেশীয় রাজ্যের বাসিন্দা ৯,৭৩,৩১৬; খাশ বৃটীশ বাঙলার অধিবাসীর সংখ্যা ৫,০১,২২,৫৫০। ১৯২১ হইতে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত দশ বৎসরে বৃটীশ ভারতের জন-সংখ্যা বৃদ্ধির হার ১০·৬%; দেশীয় রাজ্যের ১২·৭%।

বৃটীশ বাঙলায় এই সময়ে বৃদ্ধি পায় ৭·৩২% ও বাঙলার দেশীয় রাজ্যে বাড়িয়াছিল ৮·৫২% হারে। গত ষাট বৎসরে ভারতের ও বাঙলার জন-সংখ্যা ও ইহার হার কি ভাবে বাড়িয়াছে, তাহা নিম্নের তালিকায় দিলাম—

	ভারতবর্ষ	বৃদ্ধি	বঙ্গদেশ	বৃদ্ধি
	লক্ষ	%	লক্ষ	%
১৮৭২	২০,৬১	—	৩,৪১	—
১৮৮১	২৫,৩৮	২৩২	৩,৬৩	৬·৭

	ভারতবর্ষ	বৃদ্ধি	বঙ্গদেশ	বৃদ্ধি
	লক্ষ	%	লক্ষ	%
১৮৯১	২৮,৭৩	১৩'২	৩,৯০	৭'৫
১৯০১	২৯,৪৩	১'৫	৪,২১	৭ ৭
১৯১১	৩১,৫১	৬'৫	৪,৫৪	৮'০
১৯২১	৩১,৮৯	১'২	৪,৬৬	২'৮
১৯৩১	৩৫,১৪	১০'৬	৫,১০	৭'৩

১৯৩১ সালে বাঙলাদেশে ৭'৩২%হারে জন-সংখ্যা বাড়িয়াছিল ; কিন্তু ভারতের অন্যান্য প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্যের বৃদ্ধির হার হইতে বাঙলার বৃদ্ধিহার (যুক্তপ্রদেশ ছাড়া) কম। কোন প্রদেশে কি ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, দেখা যাক—

		%
আসাম	...	১৫'৬
বোম্বাই	...	১৫'০৪
পাঞ্জাব	...	১৩'৯
মধ্যপ্রদেশ	...	১১'২
বর্মা	...	১১'০
মান্দ্রাজ	...	১০'৫
বিহার-উড়িষ্যা	...	১০'৬
বাঙলার দেশীয় রাজ্য	...	৮'৫২
উ-প-সীমান্ত প্রদেশ	...	৭ ৭২
বৃটীশ বাঙলা	...	৭'৩২
যুক্তপ্রদেশ		৬'৭

বাঙলাদেশের জন-সংখ্যা সর্বত্র সমভাবে বৃদ্ধি পায় নাই। ১৮৭২ সালে প্রথম জনগণনা হয়; তারপর কি ভাবে গত ৬০ বৎসরে সমগ্র দেশে ও বিভিন্ন বিভাগে জন-সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার তালিকা নিম্নে দিলাম—

দেশ	১৯৩১ আয়তন বর্গ মাইল	১৯৩১ জন-সংখ্যা হাজার	১৯৩১ ঘনবসতি বর্গ মাইলে	১৯২১ হইতে ১৯৩১	১৯১১ হইতে ১৯২১	১৯০১ হইতে ১৯১১	১৮৯১ হইতে ১৯০১	১৮৮১ হইতে ১৮৯১	১৮৭২ হইতে ১৮৮১	১৮৭২ হইতে ১৯৩১
বঙ্গদেশ	৮২,৯৫৫	৫,১০,৮৭	৬১৬	+৭·৩	+২৮	+৮·০	+৭৭	+৭·৫	+৬৭	+৪৭·২৫
বর্দ্ধমান বিভাগ	১৩,৯৮৪	৮৬,৪৭	৬১৮	+৭·৪	−৪·৯	+২·৮	+৭·২	+৪·০	−২·৮	+১৩·৭১
প্রেসিডেন্সী ,,	১৭,৮৫৩	১,০১,০৮	৫৬৬	+৭·০	+০·৪	+৫·১	+৫·৪	+৩·৯	+১০·৫	+৩৬·৪
রাজসাহী ,,	১৯,১৬৩	১,০৬,৬৮	৫৫৭	+২·৭	+১·৯	+৮·০	+৫·৭	+৪·১	+৫·৩	+৩২·৪
ঢাকা ,,	১৪,৮২৯	১,৩৮,৬৪	৯৩৫	+১০·২	+৭·১	+১১·৪	+৯·৬	+১৩·০	+১৪·৬	+৮৩·৩
চট্টগ্রাম ,,	১১,৬৯২	৬৮,২৬	৫৮৪	+১৩·৭	+১০·৭	+১৪·৫	+১৩·৫	+১৮·০	+৫৫	+৯৫·৮
দেশীয় রাজ্য	৫,৪৩৪	৯,৭৩								
সিকিম		১,১০								

উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে গত ষাট বৎসরে চট্টগ্রাম বিভাগ ও ঢাকা বিভাগে লোক-সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে ; প্রেসিডেন্সী ও রাজসাহী তাহার পরে ; সর্বাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা হইতেছে বর্দ্ধমান বিভাগের।

বাঙলাদেশে ৫,১০,৮৭,০০০ অধিবাসীর মধ্যে ২,৭৮,১০,০০০ জন মুসলমান; ২,২২,১২,০০০ জন হিন্দু।* মুসলমানের সংখ্যা ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে অধিক, এই দুই বিভাগেই ১ কোটি ৫০ লক্ষ মুসলমানের বাস। গত পঞ্চাশ বৎসরে প্রতি দশহাজার অধিবাসীর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়াছে ৪৮৫ করিয়া, অর্থাৎ ১৮৮১ সনে যেখানে ছিল দশহাজারে ৪৯৬৯, সেখানে বর্তমানে ১৯৩১ সালে ৫৪৪৪ জন মুসলমান আছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে প্রতি দশ হাজারে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৩১ জন মাত্র বেশি, বর্তমানে সেইখানে দশ হাজারে ৪৪৪ জন বেশি।

হিন্দুর সংখ্যা ২,২২,১২,০০০; বর্দ্ধমান বিভাগ ছাড়া হিন্দুপ্রাধান্য আর কোনো বিভাগে নাই। এই বিভাগে দশ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ৮২৮৫ জন হিন্দু। প্রেসিডেন্সী বিভাগে অর্দ্ধেকের সামান্য বেশি হিন্দু। রাজসাহীতেও মুসলমানের সংখ্যা প্রবল। গত পঞ্চাশ বৎসরে হিন্দুর সংখ্যা অনুপাতে কমিয়াছে। ১৮৮১ সালে দশ হাজারে ৪৮৮২ জন ছিল হিন্দু; বর্তমানে ১৯৩১ সালে ৪৩৪৮ জন অর্থাৎ প্রতি দশ হাজারে ৫৩৪ জন করিয়া হিন্দু কমিয়াছে, সেই জায়গায় মুসলমান বাড়িয়াছে ৪৮৫ করিয়া। যদি মুসলমানের অনুপাতে হিন্দুর সংখ্যা বাড়িতে থাকিত, তবে আজ তাহাদের অনুপাত হইত দশ হাজারে ৫৪১৬। গত পঞ্চাশ বৎসরে মুসলমান ৫১.২% হারে, হিন্দু ২২.৯% হারে বাড়িয়াছে; অর্থাৎ হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের বৃদ্ধির হার দ্বিগুণের অধিক।

বাঙলাদেশে সামাজিক কারণে হিন্দু সংখ্যা-লঘিষ্ঠ; এ বিষয় আমরা পরে আলোচনা করিব। বাঙলার কয়েকটি হিন্দুপ্রধান জেলা বাঙলার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে; সাঁওতাল পরগণা, মানভূম, সিংহভূম ও পূর্ণিয়ার কিয়দংশ, গোয়ালপাড়া জেলা ও কাছাড়—এই বাঙলাভাষী হিন্দুপ্রধান জেলাগুলি বাঙলার সহিত যুক্ত করিয়া দিলে হিন্দুকে সংখ্যা-লঘিষ্ঠতার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। মুসলমানকে একটি অখণ্ড জাতি বলিয়া সেন্সাসে ধরা হয়, কিন্তু বৌদ্ধদিগকে পৃথক, আদিম জাতিকে পৃথকভাবে দেখানো হয়। এই আদিম জাতিকে হিন্দুর সহিত গণিবার জন্য আন্দোলন হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সেন্সাস সর্বত্র গ্রহণ করে নাই, তবে উত্তরবঙ্গে বহু স্থানে পূর্বে

যাহারা আদিম বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়াছিল, গত সেন্সাসে হিন্দু বলিয়া তাহারা আপনাদিগকে অভিহিত করিয়াছে।

শতকরা হিসাবে বাঙলার জন-সংখ্যার ৫৪ জন মুসলমান, ৪২ জন হিন্দু, ৩ জন আদিম, অন্যান্য ১ জন। সমগ্র জন-সংখ্যার মধ্যে ব্রাহ্মণ মাত্র শতকরা ৩ জন, হরিজন ১৪ জন, অপর হিন্দু ২৫ জন—এই মোট ৪২ জন হিন্দু।

পঞ্চাশ বৎসরে (১৮৮১-১৯৩১) বাঙলার ধর্মওয়ারী মানুষের হ্রাস-বৃদ্ধির হিসাব দেওয়া যাইতেছে—(সংখ্যাগুলি ০০০ হাজার অঙ্কের)

	মুসলমান	হিন্দু	আদিম	বৌদ্ধ	খ্রীষ্টান	অন্যান্য	মোট লক্ষ
১৮৮১	১,৮৩,৯৪	১,৮০,৭১	৩১,৩	১,৫৫	৭২	১০	৩,৬৩
১৮৯১	২,০১,৭৪	১,৮৯,৭৮	৩,৯৪	১,৯৩	৮২	১৪	৩,৯০
১৯০১	২,১৯,৫৪	২,০১,৫৫	৪,৪২	২,১৬	১,০৬	৭	৪,২১
১৯১১	২,৪২,৩৭	২,০৯,৪৮	৭,৩০	২,৪৬	১,২৯	১২	৪,৫৪
১৯২১	২,৫৪,৮৬	২,০৮,১২	৮,৪৯	২,৭৫	১,৪০	১৯	৪,৬৬
১৯৩১	২,৭৮,১০	২,২২,১২	৫,২৯	৩,৩০	১,৮৩	২২	৫,১০

বাঙলাদেশের মুসলমানের সংখ্যা ২ কোটি ৭৮ লক্ষ; সমগ্র ভারতের মুসলমানদের ৩৫.৪% এদেশের বাসিন্দা। সমগ্র ভারতে শতকরা ২২.১% হইতেছে মুসলমানের সংখ্যানুপাত। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (৯১.৮), বেলুচিস্থান (৮৭.৪), কাশ্মীর ও জম্মুরাজ্য (৭৭.২) এবং পাঞ্জাবে (৫৬.৫) মুসলমান সংখ্যায় বাঙলা হইতে বেশি; পাঞ্জাব ও বাঙলা প্রায় সমান।

বাঙলার মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগে (৭৩.৬) ও ঢাকা বিভাগে (৭০.৯) মুসলমানের প্রাধান্য খুব বেশি; রাজসাহী বিভাগে (৬২.২) অর্দ্ধেকের উপর, প্রেসিডেন্সী বিভাগে (৪৭.২) অর্দ্ধেকের কম মুসলমান। বর্দ্ধমান বিভাগে মাত্র ১৪.১ জন মুসলমান এবং যতই পশ্চিমে যাওয়া যায় ততই কম।

জেলা হিসাবে দেখিতে গেলে বগুড়ায় শতকরা ৮০র উপর, রঙপুর, রাজসাহী, পাবনা, মৈমনসিংহ, ত্রিপুরা, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম জেলার শতকরা ৭০ হইতে ৮০; নদীয়া, যশোহর, ফরিদপুর, ঢাকার শতকরা

৬০ হইতে ৭০ ; দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদে ৫০ হইতে ৬০ জন মুসলমান। অন্যান্য জেলায় গড়ে ২০ হইতে ৫০ জন। কলিকাতা, খুলনা ও ২৪ পরগণায় গত পঞ্চাশ বৎসরে মুসলমানের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। কোচবিহার রাজ্যে শতকরা ৩৫ ও ত্রিপুরা রাজ্যে ২৭ জন মুসলমান।

দশম পরিচ্ছেদ

বিবাহ-জন্ম-মৃত্যু

জন-সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির নানা কারণ ; ইহার মধ্যে প্রধান হইতেছে বিবাহ সম্বন্ধে নিয়ম-নিষেধ ও জন্মনিরোধ সম্বন্ধে জনসাধারণের মতামত বা সংক্ষেপত সামাজিক ও স্বাস্থ্যবিষয়ক কারণ এই হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য দায়ী। মুসলমানদের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ কম ; মুসলমানে মুসলমানে বিবাহ ত হয়ই, অ-মুসলমানকে মুসলমান করিয়া বিবাহ করিতে তাহাদের বাধা নাই। কিন্তু হিন্দু হইলেই হিন্দুর বিবাহ সিদ্ধ হয় না। এক বর্ণের সহিত অন্য বর্ণের বিবাহ নিষেধ, আহার নিষেধ। এমন কি, নিজ বর্ণে বিভিন্ন শাখা-উপশাখার মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। কেবল ব্রাহ্মণ হইলেই হয় না ; বিশেষ শাখার বিশেষ থাকের বিশেষ গাঁইএর হওয়া চাই ; হাড়ি হইলেই হাড়িতে হাড়িতে বিবাহ হয় না ; সকল ডোমের মধ্যে বিবাহাদি হয় না, আঁকুড়ি ডোমে দাই ডোমে বিবাহ চলে না ; দাই ডোমে বাজুনে ডোমে সামাজিক সম্বন্ধ নিষিদ্ধ। এই জন্য হিন্দুসমাজের কোনো কোনো বর্ণের পুরুষের পক্ষে স্ত্রী পাওয়া কঠিন, আবার কোনো বর্ণের কন্যার পক্ষে বর পাওয়া দুষ্কর। অসবর্ণ বিবাহ নাই বলিয়া এক অংশের পুরুষ উদ্বৃত্ত থাকে বা অধিক বয়সে বালিকা কন্যাকে বিবাহ করে। ইহার ফলে অনেক সময়ে সন্তানবতী হইবার বয়স থাকিতেই অনেক মেয়ে বিধবা হয়। ইহার উপর উচ্চ শ্রেণী ও নবশাখদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ নাই ; নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিধবা ও বিপত্নীকের বিবাহকে 'সাঙা' করা বলে। মুসলমান সমাজে বিধবা বিবাহ বা 'নিকা' করা আছে। হিন্দু বিধবার সংখ্যা ২৩ লক্ষ ৮০ হাজার, মুসলমান বিধবার সংখ্যা ১৮ লক্ষ ৮৩ হাজার। ইহার মধ্যে যাহাদের বিবাহের বয়স আছে, এমন মুসলমান নারীর বিবাহের কোনো সামাজিক বাধা নাই ; কিন্তু হিন্দু বিধবার সে-বিষয়ে নিদারুণ বাধা আছে। হিন্দুর জন-সংখ্যা হ্রাসের ইহা অন্যতম কারণ। হিন্দু বালবিধবাদের মুসলমান ধর্ম গ্রহণের ইহা একটি কারণ কিনা ভাবিয়া দেখা উচিত।

বিধবা-বিবাহ যাহাতে আইন-সঙ্গত হয়, সে-বিষয়ে প্রথম চেষ্টা করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বালিকা-বিবাহ বন্ধ করিবার জন্য প্রথম চেষ্টা করেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। দেশে তখন খুব প্রতিবাদ হইয়াছিল। পরে ভূপেন্দ্রনাথ বসু এ বিষয়ে আন্দোলন করেন। ১৯২৮ সালে এক আইন হয়, যাহার দ্বারা ১৪ বৎসরের অল্পবয়স্ক বালিকার বিবাহ দণ্ডনীয় হইয়াছে। অসবর্ণের মধ্যে বিবাহের জন্য আইন হয় ১৮৭২ সালে; উহার প্রবর্তক ব্রাহ্ম-সমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেন। এই আইন দেশের মধ্যে জনাদর লাভ করে নাই; সাধারণত উহা ব্রাহ্ম-বিবাহ-আইন বলিয়া লোকের কাছে পরিচিত। সম্প্রতি শ্রীহরি সিং গৌর-এর চেষ্টায় হিন্দুদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ আইন-সঙ্গত বলিয়া এক আইন পাশ হইয়াছে। কিন্তু ইহা এখনো দেশের সকল শ্রেণীর মধ্যে চলিত হয় নাই—দেশের অন্তরের সংস্কারের মধ্যে তিল মাত্র ভাঙ্গন ধরাইতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ।

দেশের স্বাস্থ্যহীনতা যে জন-সংখ্যা বৃদ্ধির অন্তরায়, সে-বিষয় স্বাস্থ্য পরিচ্ছেদে আলোচনা করিব। কিন্তু জন-সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি বা তারতম্য সর্বাপেক্ষা নির্ভর করে পুরুষ ও নারীর সংখ্যানুপাতের উপর। পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা এদেশে শুধু কম তাহা নহে, নারীর সংখ্যা এদেশে ক্ষয়িষ্ণু। নিম্নের তালিকা হইতে তাহা স্পষ্ট হইবে—

বাঙলাদেশের একহাজার পুরুষের অনুপাতে নারীর সংখ্যা—

	সর্বজাতি	মুসলমান	হিন্দু	আদিম	বৌদ্ধ	খ্রীষ্টান
১৮৮১	৯৯৪	৯৮৮	৯৯৯	৯৯৭	৯৮৩	৮৩৮
১৮৯১	৯৭৩	৯৭৭	৯৬৯	৯৯৯	৯৭৪	৮৫৭
১৯০১	৯৬০	৯৬৮	৯৫১	৯৯০	৯৭৯	৮৫২
১৯১১	৯৩৫	৯৪৯	৯৩১	৯৬৭	৯৬৯	৮৪৭
১৯২১	৯৩২	৯৪৫	৯১৬	৯৭৩	৯৬১	৮৮৯
১৯৩১	৯২৪	৯৩৬	৯০৮	৯৬৪	৯৫১	৮৮২

বাঙলাদেশে হাজার করা পুরুষের অনুপাতে ৯২৪ জন নারী। তাহা পঞ্চাশ বৎসরে হাজারে ৭০ জন করিয়া কমিয়াছে; মুসলমান নারী কমিয়াছে হাজারে ৫২, হিন্দু ৯১ করিয়া। বর্মা (৯৫৮), মধ্যপ্রদেশ (১০০০), বিহার-

উড়িষ্যা (১০০৮), মাদ্রাজ (১০৮৭) প্রদেশে নারীর অনুপাত বাঙলা হইতে অধিক, আবার বোম্বাই (৯০৯), যুক্তপ্রদেশ (৯০৪) ও পাঞ্জাবে (৮৫১) বাঙলা হইতে কম। সমগ্র ভারতে ৯৪১।

কিন্তু প্রদেশ দিয়া নর-নারীর সংখ্যানুপাতের দ্বারা সামাজিক সমস্যার গুরুত্ব বুঝা যায় না। কারণ, এক প্রদেশের উদ্বৃত্তে অপর প্রদেশের ঘাট্‌তি নিরাকৃত হয় না। আবার একই প্রদেশের বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সংখ্যানুপাতের পার্থক্য দেখা যায়, তাহা সহজে লোপ করা যায় না। মুসলমানদের মধ্যে এ সমস্যা তেমন গুরুতর নহে, কারণ মুসলমানে মুসলমানে বিবাহের কোনো বাধা নাই; হিন্দুর মধ্যে সে-বাধা পদে পদে। বাঙালী হাজার হিন্দু পুরুষের তুলনায় নারীর অনুপাত ৯০৮; এই কথা আরও স্পষ্ট হয় যখন পৃথক পৃথক বর্ণ লইয়া আলোচনা করি। হিন্দুসমাজের একবর্ণের সংখ্যাধিক্য অন্য বর্ণের সংখ্যান্যূনতাকে পূরণ করে না; সুতরাং উদ্বৃত্ত পুরুষ বর্ণ-বিশেষের যেমন সমস্যা, উদ্বৃত্ত নারীও অন্য বর্ণের তেমনি সমস্যা। ফলে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিবাহের সময় কন্যা পাওয়া এত কঠিন; বহু যৌতুক দিয়া কন্যা ক্রয় করিতে হয়। কন্যা ক্রয় করিবার জন্য যে অর্থ প্রয়োজন তাহা দরিদ্র পুরুষের পক্ষে সংগ্রহ করা কঠিন। ফলে অধিক বয়সের পুরুষকে অত্যন্ত অল্প বয়সেব বালিকাকে বিবাহ করিতে হয়। এই জন্য অনেক সময়ে সন্তান হইবার বয়স থাকিবার পূর্বেই সে বিধবা হয়। যাঁহারা গ্রামে একটু লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন নবশাখ ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের ঘরে শিশু কত কম, বিধবা কত বেশী!

বাঙলার ব্রাহ্মণদের নারীর সংখ্যা হাজার-করা পুরুষে ৮৪৭, কায়স্থের ৯০১, বৈদ্যের ৯২২, ব্রাহ্মদের ৭৬৩। আবার বৈষ্ণব নারী হাজার পুরুষে ১০৭৯, বাউরী ১০১৭, ডোম ৯৬৫, নমঃশূদ্র ৯৬৪, মাহিষ্য ৯৫২, সাহা ৯৫০।

জেলা হিসাবে বীরভূম (১০০৫), মুর্শিদাবাদ (১০০৬) ও চট্টগ্রামে (১০৫৯) নারীর সংখ্যানুপাত অধিক।

শহর অঞ্চলে এই নর-নারীর সংখ্যা-পার্থক্য আরও প্রকট। ১৯৩১ সালে শহরগুলিতে হাজার পুরুষে ৬০১ জন মাত্র নারী ছিল, আর এই অনুপাত ক্রমশই কমিয়া আসিতেছে। ইহার প্রধান কারণ শিল্প-নগরগুলিতে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যে-পরিমাণ বাঙালী শ্রমিক কাজ করিত, এখন তাহা অপেক্ষা

বহুগুণ লোকের প্রয়োজন ; বাঙালাদেশ সে শ্রেণীর সবল, কর্তব্যনিষ্ঠ, সুস্থকায়, বিশ্বাসী লোক সরবরাহ করিতে পারে নাই। তাহাদের স্থান ও নূতন স্থান পূর্ণ করিয়াছে অ-বাঙালী শ্রমিকরা ; তাহারা বৎসরান্তে 'দেশে' যায় ; স্ত্রী-পুত্র কমই সঙ্গে করিয়া আনে। মফঃস্বল হইতে শহরে আসিবার সুযোগ সুবিধা পূর্ব হইতে অনেক বাড়িয়াছে ; হাওড়া-কলিকাতায় ২৬ হাজার লোক দৈনিক আসা যাওয়া করে, ইহাও শহরে নারীহ্রাসের একটি কারণ। শহরে শহরে স্কুল কলেজের মেস্‌, বোর্ডিং, হোষ্টেল হইয়াছে এবং শিক্ষা বিস্তৃত হইতেছে, ইহার ফলে অবিবাহিত পুরুষের সংখ্যা শহরে বাড়িয়াছে।

কলিকাতায় পঞ্চাশ বৎসরে নারীর সংখ্যা কি ভাবে হ্রাস পাইতেছে দেখা যাক ; হাজার জন পুরুষে স্ত্রীলোক-সংখ্যা—

১৮৮১	...	৫৫৬	১৯১১	...	৪৭৫
১৮৯১	...	৫২৬	১৯২১	...	৪৭০
১৯০১	...	৫০৭	১৯৩১	..	৪৬৮

বাঙলার শহর, নগর, গ্রামে এই নর-নারীর সংখ্যা কি ভাবে প্রতি দশকে হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা নিম্নের তালিকা হইতে দেখা যাইবে—

	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
সমগ্র বঙ্গদেশ	৯৯৪	৯৭৩	৯৬০	৯৪৫	৯৩২	৯২৪
পল্লীবঙ্গ	১০০৬	৯৯০	৯৮২	৯৭১	৯৬১	৯৫৫
বড় বড় শহর	৬১৪	৫৭২	৫৪৫	৫২০	৫১৯	৫০৯
কলিকাতা	৫০০	৫২৬	৫০৭	৪৭৫	৪৭০	৪৬৯
শিল্পনগর	৬৭১	৬১৯	৫২০	৫২৯	৫৩০	৫২৬
সাধারণ শহর	১০৩৩	৯১০	৯৬৫	৮৬৮	৮১৬	৭৯৭

নারী জাতি বংশরক্ষা ও বৃদ্ধির প্রধান সহায়। প্রত্যেক জাতির মধ্যে সন্তান-ধারণোপযোগী নারীর (১৫ বৎসর হইতে ৪৫ বৎসর) স্বাস্থ্য বিশেষ বিচারের বিষয়। আমাদের দেশে এই বয়সে সন্তান-সম্ভাবনাকালে ও প্রসবকালে অনেক বালিকা-জননীর মৃত্যু হয় বা স্বাস্থ্য চিরদিনের মত ভঙ্গ হয়। বহু নারী এই বয়সের মধ্যে বিধবা হয়। সুতরাং তাহাদের দ্বারা আর সন্তানোৎপাদন সম্ভবে না। লৌকিক হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বিধবা বিবাহ নিষেধ ;

ইহা অতিরিক্ত জন-সংখ্যা বৃদ্ধির বাধা স্বরূপ। মুসলমানদের মধ্যে এবিষয়ে নিষেধ নাই। আজ জন-সংখ্যার বৃদ্ধি সম্বন্ধে যে-সমস্যা পৃথিবীর মনীষি-গণকে চিন্তান্বিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহারই আশঙ্কায় বোধহয় হিন্দু-সমাজ-তত্ত্ববিদ্‌গণ বিবাহ সম্বন্ধে এত নিয়ম-নিষেধ করিয়া জন-সংখ্যা বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন।

বয়স্ক অবিবাহিত পুরুষ, বয়স্কা অবিবাহিতা নারী, বিপত্নীক ও বিধবা—সমাজের জন-সংখ্যা বৃদ্ধি নিরোধ করে। ইহা সামাজিক সমস্যা হিসাবে যেমন আলোচ্য, জন-সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি, তারতম্য হিসাবেও প্রণিধানযোগ্য। বাঙলার সকল বয়সের হাজার হিন্দু স্ত্রীলোকের মধ্যে ২২৬ জন বিধবা, হাজার মুসলমান নারীর মধ্যে ১৪০ জন বিধবা। বাঙলার হিন্দু বিধবার অনুপাত বিহার, মাদ্রাজ, বোম্বাই হইতে বেশি।

হাজারকরা পুরুষ ও স্ত্রীলোক কোন বয়সে কতটি অবিবাহিত, বিবাহিত ও বিধবা তাহার একটা তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

	পুরুষ			স্ত্রী		
বয়স	অবিবাহিত	বিবাহিত	বিপত্নীক	অবিবাহিত	বিবাহিত	বিধবা
০-৫	৯৮১	১৯	—	৯৫২	৪৭	১
৫-১০	৯৩১	৬৮	১	৭০২	২৯১	৭
১০-১৫	৮৬৭	১৩১	২	৪৫০	৫৩৪	১৬
১৫-২০	৫২৩	৪৭০	৭	৪৮	৮৯৯	৫৩
২০-২৫	৩২৭	৬৬০	১৩	২০	৯০১	৭৯
২৫-৩০	১০০	৮৭৩	২৭	১০	৮২৮	১৬২
৩০-৩৫	৫২	৯১৩	৩৫	৮	৭৬২	২৩০
৩৫-৪০	২৩	৯২৪	৫৩	৬	৬০০	৩৯৪
৪০-৪৫	১৮	৯১৬	৬৭	৫	৫০৮	৪৮৭
৪৫-৫০	১৩	৮৮৯	৯৮	৪	৩৪৮	৬৪৮
৫০-৫৫	১২	৮৭১	১১৭	৪	২৮৬	৭১০
৫৫-৬০	১০	৮৩২	১৫৮	৩	১৯১	৮০৬

	পুরুষ			স্ত্রী		
বয়স	অবিবাহিত	বিবাহিত	বিপত্নীক	অবিবাহিত	বিবাহিত	বিধবা
৬০-৬৫	৯	৮১১	১৮০	২	১৬২	৮৩৬
৬৫-৭০	১০	৭৬৮	২২২	৩	১৩১	৮৬৬
৭০-উর্দ্ধে	১৩	৭০৮	২৭৯	৩	১০২	৮৯৫

বাঙলাদেশের সহিত ইংল্যণ্ড-ওয়েলসের তুলনা কোনো বিষয়ে করা চলে না ; এ বিষয়েও নহে। সেদেশে পনের বছরের নীচে কাহারো বিবাহ হইতে পারে না। ভারতবর্ষে ১৯২৯ সালে এই আইন পাশ হওয়ার আশঙ্কায় অসম্ভব রকম বিবাহ-সংখ্যা বাড়িয়া যায়। পাঁচ বৎসরের নীচের শিশু-বালক হাজারে একটি বিবাহিত ছিল ১৯১১ সালে, ১৯৩১ সালে ১৯টি সেই জায়গায় দেখা যায় ; ১৯১১ সালে শিশু-কন্যা বিবাহিত ছিল হাজারে ৫টি, ১৯৩১ সালে সারদা আইনের ভয়ে হাজারে ৪৭টি বিবাহ হইয়া যায় ! বিবাহিতের সংখ্যা কি ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখানো যাক—

		১৯১১	১৯২১	১৯৩১
পুরুষ	অবিবাহিত	৫১১	৫১৮	৪৬৯
,,	বিবাহিত	৪৫৪	৪৪৪	৪৯৮
,,	বিপত্নীক	৩৫	৩৮	৩৩
নারী	অবিবাহিত	৩৩৬	৩৪৩	৩১০
,,	বিবাহিত	৪৬৩	৪৬০	৫১৪
,,	বিধবা	২০১	১৯৭	১৭৬
মোট বিধবার সংখ্যা			২৫,২৮,৮০৩	২৩,৬৫৭,০০০

সারদা আইনের ভয়ে লোকে কি ভাবে বিবাহ দিয়াছিল, তাহা এই তালিকা হইতে বুঝা গেল। আইন যে উদ্দেশ্যে করা তাহা আইন প্রণয়নের পূর্বেই ব্যর্থ হইয়া গেল।

ইংল্যণ্ডে ১৫-২০ বয়স্কা বালিকা বিবাহিতের অনুপাত হাজারে ১৮, বাঙলায় ৮৯৯ ; ইংল্যণ্ডে ২০-২৫ বয়স্কা যুবতী বিবাহিতের সংখ্যা হাজারে ২৭০, এদেশে ৯০১ ; ইহার মধ্যে ৭৯ জন করিয়া বিধবাও হইয়াছে। ইংল্যণ্ডের ও বাঙলার বিধবার অনুপাত হাজার করা নারীর মধ্যে—

	ইংল্যণ্ড	বাঙলাদেশ
১৫-২০	০	৫৩
২০-২৫	৪	৭৯
২৫-৩০	২২	১৬২
৩০-৩৫	৪৩	২৩০
৩৫-৪০	৫৬	৩৯৪
৪০-৪৫	৬৯	৪৮৭

কোন দেশে কত জোয়ান, কত বৃদ্ধ, কত নারী সন্তান-ধারণোপযোগী এবং কতগুলি শিশু তাহা জানা দরকার। কোনো দেশেই সব লোক কাজ করে না; শিশুরা, বৃদ্ধরা ও অনেক জায়গায় নারী অর্থোপার্জনের জন্য গৃহের বাহিরে কাজ করে না। পাশ্চাত্য দেশে শিশুদের স্কুলে না দিয়া চাকুরীতে ঢুকাইলে পিতামাতা রাষ্ট্র কর্ত্তৃক দণ্ডার্হ হয়; এদেশে সেরকম নিয়ম নাই এবং শিশুরা পরের গৃহকর্মে, কারখানায়, পাঁজায়, মাঠে, সার্কাসে কাজ করে। ইহারা পিতামাতার উপার্জনে সহায়তা করে। বৃদ্ধ ও অক্ষমের সংখ্যা অধিক হইলে তাহারা সামাজিক ভারস্বরূপ হয়। অক্ষম ও অকর্মণ্যদের কথা আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি; প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমাজ তাহাদিগকে পোষণ করিতেছে।

আমাদের দেশের লোকের আয়ুষ্কাল কম; ষাট বৎসরের অধিক বয়স্ক লোক জাপানে শতকরা ২০ জন, ইংল্যণ্ডে ২৪ জন, মার্কিনদেশে ৩৬ জন, আর বাঙলাদেশে ৮ জন। ঐসব দেশে ৬০ বৎসরের পরেও লোকে কর্মক্ষম থাকে; তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে তাহারা সমাজের উপর জুলুমরূপে বাস করিত। আমাদের দেশে রোজগেরে লোক কম; শতকরা মাত্র ২৯ জন রোজগার করে, অবশিষ্ট ৭১ জন রোজগারের আশ্রয়ে থাকে।

জন-সংখ্যার বাড়্তি বা ঘাট্তি নির্ভর করে জন্ম ও মৃত্যুর অনুপাতের উপর। আমাদের দেশে জন্মের হার যেমন উচ্চ, মৃত্যুর হারও তেমনি তাহার সহিত পা ফেলিয়া চলিয়াছে। বাঙলার বাহিরের কয়েকটি দেশের ১৯৩১ সালের জন্ম-মৃত্যু ও উদ্বৃত্তের হার প্রথমে দিয়া আমরা এদেশের সহিত তুলনা করিব—

হাজার করা অধিবাসীর মধ্যে

	জন্মহার	মৃত্যুহার	উদ্বৃত্ত
মিশর	৪৪ ৪	২৭.৭	১৬.৭
কানাডা	২৩.৯	১০.৭	১৩.২
মার্কিনদেশ	১৮.৯	১১.৩	৭.৬
জারমেনী	১৭ ৫	১১.১	৬.৪
ডেনমার্ক	১৮.৭	১১.২	৭.৯
ফ্রান্স	১৮.০	১৫.৬	২.৪
সুইডেন	১৫.৪	১১.৭	৩.৭
বুলগেরিয়া	৩০.৬	১৫.৮	১৪.৮
রুমানিয়া	৩৫.০	১৯.৪	১৫.৬
জাপান	৩২.৪	১৮.২	১৪.২
অষ্ট্রেলিয়া	১৯.৯	৮.৬	১১.৩
নিউজিল্যাণ্ড	২৮.৮	৮.৬	১০.২

এইবার ভারতবর্ষের প্রদেশগুলির অবস্থা দেখা যাক—

	জন্মহার	মৃত্যুহার	উদ্বৃত্ত
ভারতবর্ষ	৩৫.৯	২৬.৮	৯.১
মাদ্রাজ	৩৯.৮	২৫.৫	১৪.৩
পাঞ্জাব	৪৩.৩	২৯.৭	১৩.৬
যুক্তপ্রদেশ	৩৭.৩	২৭.২	১০.১
মধ্যপ্রদেশ	৪৭.৭	৩৭ ৭	১০ ০
বর্মা	২৮.৮	২০.৮	১০.০
আসাম	৩১.৩	২১.৪	৯ ৯
বোম্বাই	৩৭.৪	২৯.৫	৭.৯
বিহার-উড়িষ্যা	৩৬ ২	২৯ ৬	৬.৬
বঙ্গদেশ	২৬.৬	২২.৪	৪.২

উপরের তালিকা হইতে দেখা যায়, যেখানে জন্মহার অধিক, মৃত্যুহারও সেখানে বেশি। য়ুরোপের সকল দেশেই যে জন্ম-মৃত্যুর হার কম, তা নয়; ভারতবর্ষের সহিত য়ুরোপের কোনো দেশেরই তুলনা হয় না; মিশর অতি

ক্ষুদ্র দেশ—ভারতের সহিত তুলনা অশোভন। তবে তুলনা করিলে দেখা যায় সেখানকার জন্মহার ভারতবর্ষ হইতে প্রায় ৮ বেশি, কিন্তু মৃত্যুহারে বেশি একের কম; সুতরাং উদ্বৃত্তের বেলায় ভারতবর্ষে হয় ৯, মিশরে হয় ১৬·৭।

জন্মহার সব চাইতে কম সুইডেনে; মৃত্যুহার সব থেকে কম নিউজিল্যাণ্ডে। ভারতবর্ষের প্রধান প্রদেশগুলির মধ্যে জন্মহারে প্রধান মধ্যপ্রদেশ, সর্বনিম্ন বাঙলাদেশ; মৃত্যুহারে শ্রেষ্ঠ মধ্যপ্রদেশ, সর্বনিম্ন মৃত্যুহার বর্মায়, তার উপরেই আসাম, তদুপরি বাঙলা। বাঙলার জন্মহার সংখ্যানুপাতে কম; কিন্তু মৃত্যুহার সেই অনুপাতে কম নয়। ১৯২১ হইতে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত গড় জন্ম-মৃত্যুর হার এইরূপ—(হাজার করা লোকের মধ্যে)

জন্ম		মৃত্যু	
পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী
২৮·৭	২৮·৩	২৫·৭	২৫·০

সুতরাং উদ্বৃত্ত দাঁড়ায় পুরুষে ৩ জন, নারীতে ২·৭ জন!

মৃত্যুহারের আলোচনা করিতে গিয়া সঙ্গে সঙ্গে আসে পরমায়ুর কথা। শিশু জীবন্ত জন্মিলে কত বৎসর বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে তাহার একটা হিসাব সংখ্যাতত্ত্ববিদ্‌গণ তৈয়ারী করিয়াছেন; ইহাকে Expectation of Life বলা হয়; বাঙলাদেশের জন্য সে তালিকা নাই—তবে ভারতের সংখ্যা পাওয়া যায়; ভারতের সহিত বাহিরের দুই একটি সভ্যদেশের তুলনা করিলে বুঝা যাইবে স্বাস্থ্যের দিকে আমাদিগকে কত উন্নতি করিতে হইবে।

	পরমায়ু	
	পুরুষ	নারী
ভারতবর্ষ	২২·৫	২৩·৩
জারমেনী	৪৭·৪	৫০·৬
ডেনমার্ক	৫৪·৯	৫৭·৯
ইংল্যণ্ড-ওয়েলস্	৫১·৫	৫৫·৩
ফ্রান্স	৪৫·৭	৪৯·১

জনক্ষয়ের প্রধান কারণ ব্যাধি, যুদ্ধ ইত্যাদি। ভারতে বহু বৎসর যুদ্ধাদি নাই; কিন্তু ব্যাধিতে লোকক্ষয় হইতেছে। গত শতাব্দীর য়ুরোপীয় মৃত্যুহার দেখিলে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়, য়ুরোপ নিবার্য রোগ সমূহের হাত হইতে আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে এবং অকাল মৃত্যু কমাইয়াছে। ভারতবর্ষে প্রতি হাজারটি জন্মের মধ্যে গড়ে ১৮২টি শিশু এক বৎসর পূরিবার পূর্বেই মারা যায় (১৯২৬-৩০); য়ুরোপের রুমানিয়া ছাড়া কোনো স্বাধীন দেশে মৃত্যুহার এত নয়; জারমেনীতে হাজার জনে ৯৪, বেলজিয়ামে ৯৫, ডেনমার্কে ৮৩, আয়ারল্যাণ্ডে ৭০, নরওয়েতে ৫১, ইংল্যণ্ডে ৭০, কানাডায় ৯৩, মার্কিনে ৬৮টি নবজাত শিশু মরে। বাঙলাদেশে ১৯২১-৩০ সনের মধ্যে গড়ে একবৎসরের ন্যূন বয়স্ক শিশু-মৃত্যুর হার—শিশু-বালক ১৭৮, শিশু-বালিকা ১৫৩, বা গড় ১৬৬। ১৯৩০ সালে শিশু-বালক ১৫৩ ও শিশু-বালিকা ১৩২টির মৃত্যু ঘটে। বাঙলাদেশের এই মৃত্যুহার শোচনীয়, নিঃসন্দেহ; কিন্তু পৃথিবীর অনেক স্বাধীনদেশে ১৯২৫-৩০ সালের মধ্যে গড় শিশু-মৃত্যু হার ইহার অপেক্ষা বেশি, সমান বা কিছু কম ছিল—যেমন চিলি ২২৯, মেক্সিকো ২৩২, জাপান ১৩৭, পালিস্থান ১৭৮, বুলগেরিয়া ১৪৭, হাঙ্গেরী ১৭৩, ইতালি ১২৩, পর্তুগাল ১৪৬, রুমানিয়া ১৯৬, চেকোস্লোভাকিয়া ১৪৮।

গত দশবৎসর বাঙলাদেশে শিশু-মৃত্যু হার (এক বৎসরের কম বয়স্ক) কি ভাবে ছিল নিম্নে তাহা দিলাম।

	বালক	বালিকা
১৯২১	২১০	১৮৩
১৯২২	১৮৭	১৫৭
১৯২৩	১৯২	১৬৬
১৯২৪	১৮৯	১৬০
১৯২৫	১৮১	১৫৭
১৯২৬	১৮০	১৫৪
১৯২৭	১৬০	১৩৯
১৯২৮	১৬৯	১৪৫
১৯২৯	১৬৫	১৪২
১৯৩০	১৫৩	১৩২

জন-সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধিকে বিবাহ, জন্ম, ব্যাধি, যুদ্ধ নিয়ন্ত্রিত করে। সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, স্বাস্থ্যবিভাগ ইহার জন্য দায়ী।

এক বৎসরের কম বয়স্ক শিশু-মৃত্যুর হার কমিলেও সাধারণ শিশু মৃত্যুর হার বাঙলায় কমিতেছে না, তাহার প্রমাণ নিম্নের তালিকা।

শিশু-মৃত্যু-হার
(হাজারকরা জন্মে)

	বালক	বালিকা	মোট
১৯২৮	১৮৩	১৭২	১৭৮
১৯৩০	১৯২	১৮১	১৮৭
১৯৩২	১৮৪	১৭২	১৭৮
১৯৩৩	২০৪	১৯৫	২০০

অন্যপ্রদেশের সহিত তুলনায় বাঙলার মৃত্যুহার ও উদ্বৃত্ত হারের কি শোচনীয় অবস্থা, তাহা নিম্নের তালিকা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে—

১৯৩৩ সালের জন্ম-মৃত্যুর হার (হাজার করা)

প্রদেশ	জন্মহার	মৃত্যুহার	বৃদ্ধি	শিশু মৃত্যু বালক	শিশু মৃত্যু বালিকা	মোট শিশু-মৃত্যু
বঙ্গদেশ	২৯.৫	২৪.০	৫.৫	২০৪	১৯৫	২০০
মান্দ্রাজ	৩৭.৭	২৩.৬	১৪.০	১৯৫	১৭৩	১৮৫
বোম্বাই	৩৬.৩	২৪.৭	১১.৬	১৬৮	১৫২	১৬০
যুক্তপ্রদেশ	৩৯.২	১৮.৬	২০.৫	১৪২	১৩২	১৩৭
পাঞ্জাব	৪৪.৪	২৮.১	১৬.২	১৯৫	১৮৯	১৯২
মধ্যপ্রদেশ	৪৫.২	২৬.৫	১৭.৭	২১৩	১৮৫	২০০
বিহার-উড়িষ্যা	৩৫.৭	২২.১	১৩.৬	১৪৩	১২৭	১৩৫
উ-প-সী-প্রদেশ	৩০.০	২১.২	৮.৭	১৩৬	১৩৮	১৩৭
বর্মা	২৯.৮	১৮.৭	১১.১	২০৪	১৭৯	১৯২
আসাম	৩১.০	২০.৩	১০.৭	১৭২	১৫৩	১৬২

একাদশ পরিচ্ছেদ

প্রবাসী ও 'পরদেশী'

ভাষা পরিচ্ছেদে আমরা দেখাইয়াছি যে, বাঙলার বাহিরে ৬৩ লক্ষ বাঙালী বাঙালা ভাষা ব্যবহার করে। এই বাঙালীর সবই 'প্রবাসী' নহে। কারণ, যথার্থ বাঙলাদেশের কয়েকটি জেলা ও জেলার কিয়দংশ আসাম ও বিহারের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; এইসব জায়গায় ৪৫ লক্ষ বাঙালী বাস করে; এই বাঙালী বাসিন্দারা প্রবাসী নহে, তাহারা সেখানকার অধিবাসী। সুতরাং ঠিক প্রবাসী বাঙালীর সংখ্যা অর্থাৎ যে-বাঙালী বাহিরে গিয়া চাকুরী করিতেছে, বাস করিতেছে, তাহাদের সংখ্যা ১৮ লক্ষ মাত্র।

বাঙালী ঘরপোষা জাত; নিজ দেশ বা গ্রাম ছাড়িয়া সে খুব কম নড়ে; যা নড়ে, তার অধিকাংশই পূর্ববঙ্গের মুসলমান; তাহারা চরে গিয়া চাষ করে, আসামে যায়, মৈমনসিংহের জঙ্গলে যায়। বাঙলার অধিকাংশ লোকই যে জেলায় জন্মায় সেই জেলায় মরে।

বাঙলায় বিদেশীর সংখ্যা বেশি নয়—হাজারে ৩৭ জন মাত্র অর্থাৎ ১৮,৫৩,৭০৮ জন লোক ছাড়া সব লোকের জন্মস্থান বাঙলাদেশেই। এই সাড়ে আঠারো লাখ লোকের মধ্যে ১৭,২৬,০০০-এর জন্মভূমি বাঙলার সংলগ্ন প্রদেশে অর্থাৎ বিহার-উড়িষ্যায়। বাঙলার প্রতি হাজার জন অধিবাসীর ৯৬৩ জনের জন্ম বাঙলায়, মান্দ্রাজের প্রতিহাজার জনে ৯৯৫, বিহার-উড়িষ্যার ৯৯০, বোম্বাই-এর ৯৫৫ দেশের খাশবাসিন্দা।

ভারতের বাহিরের বাসিন্দা বাঙলায় বাস করিতেছে এমন লোকের মধ্যে নেপালীদের সংখ্যাই বেশি ৯৮,৬২০; কাবুল, চীন, ভুটান, তিব্বত প্রভৃতি দেশের লোক ১৪,৫১১; য়ুরোপীয়ের সংখ্যা ১৩,৫৫৭। সুতরাং ১৮ লক্ষ প্রবাসী বাঙালী ও ১৮ লক্ষ পরদেশীর সংখ্যা এক হিসাবে কাটাকাটি হইয়া যায়।

বাঙলাদেশে পরদেশীর সংখ্যাধিক্য কয়েকটি স্থানে মাত্র। দশহাজার লোকের মধ্যে এদেশে জন্ম ৯৬৩৭ জনের, ভারতের অন্যত্র ৩৩৮ জনের,

ভারতের বাহিরের লোক ২৫ জন মাত্র। এ দিয়া ঠিক বাঙলায় পরদেশীর সংখ্যার গুরুত্ব বোঝা যায় না। তাহারা সংখ্যায় প্রবল নগরে, শহরে, শিল্প-কেন্দ্রে ও চা-বাগিচায়। কলিকাতার এগার লাখ লোকের মধ্যে ২,২৩,৬৯৮ জন বিহার-উড়িষ্যাবাসী, ১,০৩,০৩২ জন যুক্তপ্রদেশবাসী; অর্থাৎ কলিকাতার জন-সংখ্যার ১৮'৭% ও ৮'৬% ভাগ লোক ঐ দুই প্রদেশ হইতে আসিয়াছে। হাওড়াতেও ৩২% ভাগ লোক উত্তর-পশ্চিম ভারত ও উড়িষ্যার বাসিন্দা। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিঙে নেপালীর সংখ্যা খুব বেশি; তাই সেখানকার সংখ্যায় ভারতের বাহিরের লোকের সংখ্যা বেশি দেখানো হইয়াছে। নিম্নে কোন জেলায় কত পরদেশী আছে, তাহার একটা তালিকা দিলাম—

	প্রতি দশ হাজার লোকের মধ্যে		
	বাঙলায় জন্ম	ভারতে জন্ম	ভারতের বাহিরে জন্ম
বঙ্গদেশ	৯৬৩৭	৩৩৮	২৫
বর্দ্ধমান বিভাগ	৯৪৫৩	৫৪০	৭
বর্দ্ধমান	৯২৬৫	৭২৩	১২
বীরভূম	৯৬৭৭	৩২০	৩
বাঁকুড়া	৯৮৬৮	১৩১	১
মেদিনীপুর	৯৭৭০	২২৬	৪
হুগলী	৯০০৯	৯৮৪	৭
হাওড়া	৮৭৪৯	১২২৯	২২
[হাওড়া শহর	৬৪৪২	৩৫৯৪	৬৪]
প্রেসিডেন্সী বিভাগ	৯৩১২	৬৬৮	২০
২৪ পরগণা	৯০৬৬	৯২৫	৯
[কলিকাতার শহরতলী	৮৫০১	১৪৪৩	৫৬]
কলিকাতা	৬৬৮০	৩১৭৯	১৪১
নদীয়া	৯৯১৭	৮২	১
মুর্শিদাবাদ	৯৮৩৮	৫৬১	১
যশোহর	৯৯৬৯	৩০	১

খুলনা	৯৯৭৪	২৫	১
রাজসাহী বিভাগ	৯৫০৩	৪০৬	৯১
রাজসাহী	৯৮২৩	১৭৫	২
দিনাজপুর	৯৫৬৫	৪৩০	৫
জলপাইগুড়ি	৭৮৫২	১৮১৫	৩৩৩
দার্জিলিং	৬৮৫০	১২১২	১৯৩৮
রঙপুর	৯৮২২	১৭৫	৩
বগুড়া	৯৮৫৩	১৪৬	১
পাবনা	৯৯৩২	৬৭	১
মালদহ	৯৫৭৭	৪২১	২
ঢাকা বিভাগ	৯৯৪৫	৫৪	১
ঢাকা	৯৯৪৭	৫১	২
[ঢাকা শহর	৯২৪৬	৭২০	৩৪]
মৈমনসিংহ	৯৯১৮	৮১	১
ফরিদপুর	৯৯৫৯	৪০	১
বাখরগঞ্জ	৯৯৮০	১৯	১
চট্টগ্রাম বিভাগ	৯৯৭৪	২৫	১
ত্রিপুরা	৯৯৭১	২৯	...
নোয়াখালি	৯৯৯৮	২	...
চট্টগ্রাম	৯৯৬০	৩৭	৩
চট্টগ্রাম পার্বত্য দেশ	৯৯৫৫	৪৩	২
কোচবিহার	৯৭৪৮	২৪৩	১
ত্রিপুরা	৮৭৮৬	১২০০	১৪

এই তালিকা হইতে আর একটি জিনিষ দেখা যায় এই যে, পূর্ববঙ্গের দিকে পরদেশীর সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাইয়াছে। প্রেসিডেন্সী বিভাগে দশহাজারে ৬৬৮ জন পরদেশী, বর্দ্ধমান বিভাগে ৫৪০ জন, রাজসাহীতে ৪০৬ জন; কিন্তু ঢাকা বিভাগে মাত্র ৫৪ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ২৫ জন মাত্র, নোয়াখালি জেলায় মাত্র ২জন করিয়া পরদেশী।

বাঙলাদেশের মধ্যে ৪,৯২,৩৪,০০০ বাঙালীর জন্ম; বাঙলার সংলগ্ন প্রদেশে বাঙালী আছে ৫৮ লক্ষ; বাঙলা বাদে সমগ্র ভারতের মোট বাঙালীর সংখ্যা ৬৩ লক্ষ, ভারতের বাহিরে আছে ২৭৪০ জন। এই শেষোক্ত সংখ্যার ২৫৭৫ জন আছে ভারতমহাসাগরে মরিশাস্ দ্বীপে; বোধহয় শ্রমদাস হইয়া ইহারা সেখানে যায়। এছাড়া সিংহলে ৯২, সাইপ্রাস দ্বীপে ১, সোমালিল্যাণ্ডে ২, হঙকঙে ৫১, বোর্ণিওতে ১৩, সাইকিলিস দ্বীপে ৪ জন আছে।

বাঙলার নিজ জন-সংখ্যা ও পরদেশীর সংখ্যা গত পঞ্চাশ বৎসরে দশহাজারে কি হারে বাড়িয়াছে বা কমিয়াছে, তাহা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

বাঙলায়

	নিজ জন-সংখ্যানুপাত	পরদেশীর সংখ্যানুপাত
১৮৮১	৯৭৬০	২৪০
১৮৯১	৯৭১৯	২৮১
১৯০১	৯৬৬৩	৩৩৭
১৯১১	৯৫৭৪	৪২৬
১৯২১	৯৫৯৫	৪০৫
১৯৩১	৯৬৩৭	৩৬৩

পঞ্চাশ বৎসরে পরদেশীর সংখ্যা দশহাজার করা ১৮৩ বাড়িয়াছে। য়ুরোপের অনেকদেশে পরদেশীর সংখ্যানুপাত ইহা হইতে অনেক বেশি। বাঙলার বাহিরে যে বাঙালী আছে, তাহা সমগ্র বৃটীশ সাম্রাজ্যে ছড়াইয়া আছে বলিয়া কোথায়ও বাঙালীর সংখ্যাধিক্য প্রবল বোধ হয় না। বাঙালী বেশি আছে কাশী ও বৃন্দাবনে; সেখানে অধিকাংশই স্থায়ী বাসিন্দা, তীর্থবাসী বা পেনশন-ভোগী।

	বাঙলায় পরদেশী	প্রবাসী বাঙালী
ভারতবর্ষ	১৭,২৬,৩৭০	৯,৫৩,৮০০
বৃটীশ ভারত	**১৬,৬৫,২৮৫**	**৯,৩৭,১৯৮**
আজমীর	৫১৬	৪৩১
আন্দামান	১৭	৯৬৭

আসাম	৬২,০১২	৫,৭৫,০১৩ *
বেলুচিস্থান	১১৩	৫৭৮
বিহার-উড়িষ্যা	১১,২৭,১০২	১,৪৯,৪১৫ †
বোম্বাই	৭৬০৬	৫২৫০
বর্মা	৬৭৯১	১৬,৮,০৯৮ ‡
মধ্যপ্রদেশ	৪৫,৭০২	৫৭৩৩
কূর্গ	৩	
দিল্লি	২১৫৯	৬১৬৮
মাদ্রাজ	৪২,৪৩৭	
উ-প-সী-প্রদেশ	১৯৬২	৭০৪
পাঞ্জাব	২৩,৭৩৪	৪৩২০
যুক্তপ্রদেশ	৩,৫৮,১৩১	৩০,৫২১
দেশীয় রাজ্য	**৫৯,৫২৬**	**১৬,৬০১**
রাজপুতানা	৩২,৯০৬	১০০৭
বিহার-উড়িষ্যা	১১,৭৪৮	৮১০৯
বিদেশী	**১,২৭,৩৫৮**	**২৭৫৮**
ফরাসী ও পর্তুগীজ দেশ হইতে	১২৯২	
অন্যান্য	২৬৭	

* স্থায়ী অস্থায়ী বাঙালী বাসিন্দার সংখ্যা ৩৫,২৫,০০০

† বাঙালীর সংখ্যা ১৫,৬৮,০০০।

‡ Statistical Abstract, 10th Issue, p. 494 বর্মায় বাঙলাভাষীর সংখ্যা ৫,০১,০৩৯। ইহা ১৯২১ সালের সেন্সাস হইতে গৃহীত।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

স্বাস্থ্য ও ব্যাধি

দেশের আবহাওয়া, ভূপ্রকৃতি, খাদ্যশস্যের সম্পদ ও আর্থিক সচ্ছলতার উপর অধিবাসীদের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। পৃথিবীর অনেক জাতি দুরন্ত শীত ও দুরন্ত গ্রীষ্মের সহিত নিরন্তর সংগ্রাম করিয়াই জীবনান্ত করিতেছে। বাঙলার সে সমস্যা নাই; বাঙলার সমস্যা তাহার প্রচুর বৃষ্টি ও নদীর জল নিকাশের সমস্যা। এই জল নিকাশ না হইলে বাঙলার স্বাস্থ্য-সমস্যা জটিল হইয়া উঠে। বর্ষার জল পুষ্করিণী, ডোবা, বিল ও নীচু জমিতে আবদ্ধ হয়। বর্ষার পরে বাহিরের সহস্র প্রকার আগাছা গ্রামের ভিতরেও জন্মে; বর্ষার পূর্বে যেখানে খোলামাঠ ছিল সেখানে বর্ষার পরে মানুষের মাথা-সমান গাছ হয়। বাঙলাদেশের গ্রামের মধ্যে মানুষের সঙ্গে উদ্ভিদের নিরন্তর সংগ্রাম ঘটিতেছে। এই সংগ্রামে বাঙলার গ্রাম উৎসন্ন যাইতেছে।

এক বর্মা ছাড়া বাঙলাদেশের জন্মহার ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশ হইতে কম; মৃত্যুহারে বর্মা, আসাম ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বাঙলাকেও হার মানাইয়াছে। ১৯৩১ সালে ভারতবর্ষে হাজারকরা লোকে ৩৪·৩টি করিয়া জন্ম ও ২৪·৮ মৃত্যু হয়; ১৯৩৩ সালে যথাক্রমে ৩৫·৫ ও ২২·৪। ১৯৩০ সালে বাঙলাদেশের মৃত্যু-হার ২১·৮, জন্মহার ২৫·৯; ১৯৩১-এ ২৯·১ ও ২৩·৭, ১৯৩৩-এ ২৯·৫ ও ২৪।

শিশু-মৃত্যুর দ্বারা দেশের স্বাস্থ্যের শোচনীয় অবস্থা আরও বুঝা যায়। ১৯১১-১২ সালে বাঙলাদেশের উচ্চতম শিশু-মৃত্যুহার ছিল হাজারকরা জন্মে ২৬০ হইতে ২৮০। ১৯২১ সালে কলিকাতায় ছিল ৩৮৬! আঠারোটি জেলায় ছিল ২০০ এর উপর করিয়া। কিন্তু ইহার পর হইতে এই মৃত্যুহার কিছু কমিয়াছে। ১৯৩১ সালে সমগ্র ভারতের গড় শিশু-মৃত্যুহার ছিল ১৭৯, বাঙলাদেশে ১৮৭। সেই সময়ে সবথেকে অধিক হার ছিল কুর্গপ্রদেশে ২৯৫, সবথেকে কম ছিল বিহার-উড়িষ্যার ১৫৭। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশের

সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় অনেক দেশেই এই মৃত্যুহার কয়েক বৎসর পূর্বে এমন কি বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও এইরূপ ছিল। কিন্তু বর্তমানে এইসব উন্নত জাতিদের উদাহরণ আমাদের সম্মুখে থাকা উচিত। ইংল্যণ্ডে হাজারটি জন্মের মধ্যে ৬০টি মাত্র শিশু অকালে মরে, সুইডেনে ৫৭, সুইজারল্যাণ্ডে ৪৯, অষ্ট্রেলিয়ায় ৪২, নিউজিল্যাণ্ডে ৩২। আবার বাঙলা থেকে বেশি শিশু-মৃত্যু-হার বেশ সুসভ্য, স্বাধীন এমন কি, পরাক্রমশালী জাতির মধ্যে দেখা যায়, যেমন রুমেনিয়া (২০৯)। হাঙ্গেরী (১৮৫), পর্তুগাল (১৫১) ও জাপানের (১৩২) সংখ্যা বাঙলার থেকে কম হইলেও য়ুরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য নহে। বর্তমান শিশুদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য শিশুমঙ্গল, মাতৃমঙ্গল সমিতি অনেকগুলি স্থাপিত হইতেছে। শিশু-মৃত্যুর কারণ কি, তাহা জানা দরকার। প্রথমত মায়েদের শরীর অপুষ্ট; গর্ভাবস্থায় পুষ্টিকর খাদ্যের ও বিশ্রামের অভাবে এবং মেলেরিয়া প্রভৃতি রোগে তাহাদের জীবনীশক্তিতে অত্যন্ত মন্দা পড়িয়া যায়। প্রসবের পর শিশু মরে, কিন্তু প্রসবকালে ও অল্প পরে যে-সব মায়েরা অকালে মরে, তাহাদের সম্বন্ধে লোকের সজাগ হওয়া উচিত। সুস্থ-বলিষ্ঠ জননী না হইলে শিশু সুস্থ-বলিষ্ঠ হইতে পারে না; সুতরাং জননীর স্বাস্থ্য ও জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের কল্যাণ পরস্পর সংযুক্ত; একটি বাদ দিয়া অপরটি হয় না।

নানারূপ ব্যাধি বাঙলাদেশে স্থায়ী বাসা বাঁধিয়াছে। অনাবৃষ্টি ও স্বল্প বৃষ্টি হইলে শীতকালের শেষাশেষি বাঙলাদেশের অধিকাংশ পুকুর, ডোবা, ঝিল শুকাইতে আরম্ভ করে ও নানাস্থানে কলেরা দেখা দেয়; বাঙলাদেশে কলেরায় বৎসরে বহু সহস্র লোক মরে। ১৯৩১ সালে ৭৯,০৭৩ জন লোক মরে। বসন্ত বা গুটিও এই সময়ে দেখা দেয়; ৭।৮ হাজার লোকের মৃত্যুর জন্য দায়ী এই ব্যাধি। কিন্তু যে-ব্যাধি বাঙলাদেশের একেবারে খাশ সে হইতেছে মেলেরিয়া। মেলেরিয়ায় ভোগে নাই এমন ভাগ্যবন্ত বাঙালী দুর্লভ। মেলেরিয়া শব্দটি ইতালীয়; ইহার অর্থ 'খারাপ বাতাস'; লোকের ধারণা ছিল সোঁতা জমি হইতে খারাপ হাওয়া উঠিলে জ্বর হয়। সেই জ্বরে ভুগিলে ডাক্তারে 'বায়ু পরিবর্তনে'র উপদেশ দিতেন। গত শতাব্দীর

মাঝামাঝির পর এই জ্বর প্রথম বাঙলায় মড়কের মত দেখা দিল। বহু জনাকীর্ণ গণ্ড গ্রাম শ্মশান হইয়া যায়, এবং সেই হইতে মেলেরিয়া নিয়মিতভাবে গ্রামগুলিকে উৎসন্ন দিতেছে। বাঙলাদেশের সকলপ্রকার মৃত্যুর মধ্যে 'জ্বর' দায়ী শতকরা সত্তর ভাগের জন্য। এই জ্বরে বাঙালী জাতি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা মরে তাহারা ত মরেই; কিন্তু যাহারা ভুগিয়া ভুগিয়া থাকে, তাহারা কঠিন কর্মে অসমর্থ হইয়া পড়ে।

কলিকাতা মেডিকাল কলেজের অধ্যাপক রস্ সাহেব মেলেরিয়ার বীজাণু আবিষ্কার করেন ও বলেন মশা ইহার বাহন, কুইনাইন ইহার প্রতিষেধক। কুইনাইন সিঙ্কোনা নামে এক গাছ হইতে প্রস্তুত হয়; এই গাছ প্রথমে দক্ষিণ আমেরিকায় পাওয়া যায়। ভারত গভর্মেণ্ট নীলগিরিতে সিঙ্কোনার চাষ স্বরু করিয়াছেন; বাঙলাদেশে দার্জিলিং অঞ্চলে ১৯৩২ সালে ২৭১৭ একর জমিতে সিঙ্কোনার চাষ করিতেছিলেন। ইহা হইতে ১৪,৪২,৭৬২ পাউণ্ড ছাল সংগ্রহ ও ৪৬,২২০ পাউণ্ড কুইনাইন প্রস্তুত হয়। বিদেশ হইতেও বহু টাকার কুইনাইন আসে। কিন্তু এত সত্ত্বেও মেলেরিয়া কমে নাই। এখন মেলেরিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে কালাজ্বরে ও ক্ষয়রোগে পরিণত হইতেছে। জ্বরে ভুগিতে ভুগিতে লোকের জীবনীশক্তি ক্রমশই হ্রাস পাইতেছে। কালাজ্বর অধিকাংশ গ্রামে ধরাই পড়ে না, এমন কি ক্ষয়ও না। ১৯৩০ সালে নদীয়া, রাজসাহী জেলায় কালাজ্বরের রোগী সব থেকে বেশি ছিল। বাঙলাদেশে বৎসরে প্রায় দশ হাজার লোক কালাজ্বরে মারা যায়।

ক্ষয়রোগও বাঙলাদেশে বাড়িতেছে। প্রতি বৎসর ৬০।৬২ হাজার নরনারী এই রোগে মারা পড়ে। এই রোগ প্রসার লাভ করিতেছে বলিয়া চিকিৎসকরা অত্যন্ত আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। বাঙলাদেশে যক্ষ্মা রোগীর হাসপাতাল মাত্র আছে যাদবপুরে। জাতিকে এই ব্যাধি হইতে রক্ষা করিতে হইলে চাই পুষ্টিকর খাদ্য, নির্মল বায়ু, স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ। কিন্তু তখনই প্রশ্ন উঠে এসব আসে কোথা হইতে?

শহর হইতে গ্রামে মেলেরিয়ার মৃত্যুহার প্রায় সাতগুণ; কিন্তু যক্ষ্মা প্রবল হইয়া উঠিতেছে শহর অঞ্চলে। স্বাস্থ্যবিভাগের রিপোর্টে কোন ব্যাধি কোথায়

কিভাবে বৃদ্ধি পায়, সরকার কিভাবে তাহা দূর করিবার জন্য ব্যবস্থা করেন, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা থাকে।

পশ্চিম, উত্তর ও মধ্য বাঙলাকে যেমন মেলেরিয়া ধ্বংস করিতেছে, তেমনি পূর্ববঙ্গ কচুরীপানার উপদ্রবে অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিতেছে। গত পনের বৎসরের মধ্যে এই জলজ উদ্ভিদ্ পূর্ববঙ্গের নদ-নদী, খাল-বিল, পুষ্করিণী ছাইয়া ফেলিয়াছে। ইহার উৎপাতে নৌকাচলাচল কঠিন হয়; মাছ মরিয়া যায়; ধান বা পাটের ক্ষেতে একবার ঢুকিলে তাহার জড় নষ্ট করা কঠিন হয়। এই আগাছা দূর করিবার জন্য অনেক জল্পনা কল্পনা হইয়াছে, কিন্তু এ পর্যন্ত গভর্মেণ্ট তেমন ভাবে এই উপদ্রবটিকে দূর করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক নিযুক্ত করেন নাই। মাঝে মাঝে কাগজে পত্রে এই উপদ্রব দূর করিবার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা দেখা যায়। কচুরীপানা এখন আর পূর্ববঙ্গে আবদ্ধ নাই, দক্ষিণবঙ্গে উহা আসিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গেও দেখা দিয়াছে। কচুরীপানার জন্য জল দূষিত হওয়ায় নানাবিধ ঔদরিক ব্যাধি শীতের পর দেখা দেয়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শহর ও গ্রাম

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ প্রদেশগুলির তুলনায় বাঙলাদেশে শহরের সংখ্যা কম। মুসলমানযুগে শহর বলিতে ছিল মুর্শিদাবাদ ও ঢাকা। তারপর গত দেড়শত বৎসরের মধ্যেই বাঙলার শহরগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই শহরগুলির অধিকাংশই শাসনব্যবস্থা বা Administrationএর কেন্দ্র; সেখানে বিচারালয়, পুলিশ থানা, রেজিষ্ট্রেশন অপিষ আছে। কালে শহরগুলি বিদ্যার কেন্দ্র, ব্যবসার কেন্দ্র, চাকুরীর ক্ষেত্র হয়; মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী ও ভূমিহীন মজুর সেখানে প্রথমে আসে চাকুরীর জন্য। জন-সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে তাহাদের আহার্য, বসন বাসন প্রভৃতি সরবরাহের জন্য ব্যবসায়ীরা আসিয়া জুটিল; রেলের সুবিধায়, কোনো কোনো শহর প্রকাণ্ড বাণিজ্যের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। শহরে লেখাপড়া শেখা যায়, লেখা-পড়া শিখিয়া চাকুরী বা ব্যবসা করা যায়। শহরে স্বাস্থ্য ভাল, শহরে পয়সা থাকিলে খাদ্যাদির অভাব হয় না, শহরে আনন্দ-উচ্ছ্বাস, আমোদ-প্রমোদ অফুরন্ত। সুতরাং গ্রামের যাহার সামর্থ্য হইতেছে, সেই শহরে বাসা করিয়া থাকে, নয় বাড়ী নির্মাণ করে। এইভাবে বাঙলায় জেলার সদর ও মহকুমাগুলি বড় হইয়া উঠিতেছে।

এ ধরণের শহর সকল প্রদেশেই হইয়াছে। কিন্তু বাঙলাদেশে এমন কতকগুলি শহর নূতন হইয়াছে যাহার জুড়ি অন্য প্রদেশে কম। এইগুলি industrial town বা শিল্প-নগর। ইহার কেন্দ্র দুই তিনটি জায়গায়; কলিকাতা, হাওড়া ও হুগলি জেলায় গঙ্গার দুইধারে। ই. আই. রেলওয়ে, ই. বি. রেলওয়ে ও বি. এন. রেলওয়ের দুই পাশে। এই মণ্ডলে যতগুলি শহর নির্মিত হইয়াছে, সেগুলি শিল্প-নগর; পাটকল, (Jute Press), চটকল (Jute Mill), কাপড়ের কল, ধানকল, কাগজের কল, তেল কল, রেলওয়ে কারখানা প্রভৃতি অসংখ্য কারখানা গড়িয়া

উঠিয়াছে। এই কারখানার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে ইহাদের উন্নতি, কারখানার অধোগতির সঙ্গে ইহাদের পতন; কারণ, কারখানা ছাড়া এখানে অন্ত কোনো স্বার্থে লোক সমবেত হয় নাই; রাখা মাইন্‌সে তামার কারখানা ছিল; বড় শহর গড়িয়া উঠিয়াছিল; তামার কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, শহরও পরিত্যক্ত হইয়াছে।

কলিকাতার দক্ষিণে পঁচিশ মাইল ও উত্তরে পঁচিশ মাইল পর্যন্ত এই ধরণের বহু শিল্প-নগর গড়িয়া উঠিয়াছে। এ ছাড়া উত্তর-পূর্ব বাঙলায় পাটের ব্যবসার জন্য অনেকগুলি বড় বড় শহর গড়িয়াছে; উত্তরবঙ্গে চা-এর জন্য। সেইজন্য বলিয়াছিলাম শিল্প-নগরগুলি বাঙলার বিশেষত্ব। হাওড়া, লিলুয়া, টিটাগড়, ভাটপাড়া, কামারহাটি, দমদম, আসানসোল, সিরাজগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিঙ প্রভৃতি শহরগুলি কয়েক বৎসর পূর্বে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল; কতকগুলির চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না। বাঙলায় এই শিল্প-নগরগুলির শ্রীবৃদ্ধির কথা জন-সংখ্যার দ্বারা বুঝা যাইবে।

বাঙলার সমগ্র জন-সংখ্যার প্রতি হাজার লোকের মধ্যে মাত্র ৭৩ জন শতকরা (৭·৩%) শহরের বাসিন্দা; আবার এই সংখ্যার শতকরা ৪২ জন বাস করে বাঙলার প্রধান তিনটি নগরে—কলিকাতা, হাওড়া ও ঢাকায়। অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে তুলনা করিলে বাঙলার অধিবাসী বেশি শহুরে, তা বলা যায় না; তবে তার এই শিল্প-নগরের প্রগতি বিশেষভাবে লক্ষ্যের বিষয়—

		শহুরে	গ্রাম্য
বোম্বাই প্রেসিডেন্সী	...	২০·৯	৭৯.১
মাদ্রাজ	...	১৩·৭	৮৬.৩
সংযুক্ত প্রদেশ	...	১১·২	৮৮.৮
উ-প-সীমান্ত প্রদেশ	...	৮·২৫	৯১·৭৫
বঙ্গদেশ	...	৭·২৬	৯২·৭৪
বিহার-উড়িষ্যা	...	৪·১	৯৫·৯

কলিকাতা, হাওড়া ও ঢাকার অধিবাসীদের বাদ দিলে বাঙলার অবশিষ্টের

শতকরা চারিজন মাত্র শহরে বাস করে, অর্থাৎ ৯৬ জন গ্রামের বাসিন্দা। বিহার-উড়িষ্যা ছাড়া এমন গ্রাম্য প্রদেশ আর একটিও নাই; অথচ সেই গ্রাম যেখানে জাতির শতকরা ৯৬ জন লোক বাস করে আজ ধ্বংসোন্মুখ।

নগর, শহর ও গ্রাম—এই তিনটি ভাগে জনপদকে ভাগ করা হয়। লক্ষাধিক লোকের বাস যেখানে তাহাকে নগর বলা হয়; সেরকম নগর বাঙলাদেশে তিনটী মাত্র,—কলিকাতা, হাওড়া ও ঢাকা; মুন্সিপালটি, ক্যাণ্টনমেণ্ট, জেলার জনপদকে শহর বলা হয়; ইহার অল্প বাসিন্দা যেখানে আছে তাহাকে গ্রাম বলে।

সমগ্র বাঙলায় সকল শ্রেণীর জনপদের সংখ্যা ৯১,৩৪৩। বৃটীশ বাঙলায় ৮৬,৭৫৬। কোন শ্রেণীর জনপদে কত লোক বাস করে, প্রথমে তাহা দেখা যাক্—

গ্রাম	গ্রামের সংখ্যা	জন-সংখ্যা (০০০)	জন-সংখ্যার কত অংশ
৫০০ বাসিন্দার কম	৬৩,৩৪০	১,৩০,০৮,	২৭·৫
৫০০-১০০০ বাসিন্দা	১৫,৯৭৫	১,১১,৮৪,	৪৭·৩
১০০০-২০০০ বাসিন্দা	৮,১২৬	১,১২,১২,	
২০০০-৫০০০ বাসিন্দা	২,৪৬৩	৯৮,০০,	২০·৫
৫০০০-এর উপর বাসিন্দা গ্রাম			·৪
			১০০%
৫০০০-১০,০০০ বাসিন্দা	৩২৬	২১,১১,	৭৬
১০,০০০-২০,০০০ বাসিন্দা	৭৪	১০,১৩,	১৭·৩
২০,০০০-৫০,০০০ বাসিন্দা	৩৩	৯,৩৯,	৭৩·১
৫০,০০০-১,০০,০০০ বাসিন্দা	৩	১,৯৪,	
১,০০,০০০-এর উপর বাসিন্দা	৩	১৫,৫৬,	
			১০০%

বাঙলার বৃহৎ জনপদের সংখ্যা ১৪৩; মোট নাগরিকের কত অংশ কোন শ্রেণীর জনপদে বাস করে তাহাও দেওয়া গেল।

১।	লক্ষাধিক অধিবাসীর শহর	৩ শহরে লোকের	৪২%	বাস করে
২।	৫০ হাজার হইতে লক্ষ বাসিন্দা	৩ ...	৫.৩%	...
৩।	২০-হাজার হইতে ৫০-হাজার ,,	৩২ ...	২৫.৮%	...
৪।	১০-হাজার হইতে ২০-হাজার ,,	৪৪ ...	১৭.৩%	...
৫।	৫-হাজার হইতে ১০-হাজার ,,	৩৮ ...	৭.৬%	...
৬।	৫-হাজারের নীচে ,,	২৩ ...	২.০%	...

এই শহরগুলিতে বাঙলার মাত্র ৭.২৬% লোক বাস করে। ১৪৩টি শহর বাদ দিলে বাঙলায় গ্রাম-সংখ্যা হয় ৯১,২০০। শহরগুলিতে ৩৭,১১ হাজার লোক মাত্র বাস করে, আর ৪,৭৩ লক্ষ লোক বাস করে গ্রামে; ইহার মধ্যে অতি ছোট গ্রামের সংখ্যা ৬৩ হাজারের বেশি; সেই গ্রামে বাঙলার এক চতুর্থাংশ লোক বাস করে।

বাঙলার এই শহরগুলির জন-সংখ্যা বিশেষভাবে লক্ষ্যের বিষয়; দেখা যাইতেছে তিন নগরেই সমগ্র শহরে লোকের শতকরা ৪২% জন বাস করে। কলিকাতা ও হাওড়ার বাসিন্দার প্রায় একতৃতীয়াংশ অ-বাঙালী; সুতরাং এইসব নগরে অ-বাঙালী নাগরিকের সংখ্যা বাড়িতেছে। আবার ২০ হাজার হইতে ৫০ হাজারী শহরগুলির অনেকগুলিই শিল্প-নগর, এবং সেখানকার বর্দ্ধিষ্ণু জন-সংখ্যা হইতেছে অ-বাঙালী। সুতরাং দেখা যাইতেছে শহরগুলিতে বাঙালী অপেক্ষা অ-বাঙালীর সংখ্যা বেশি হারে বাড়িতেছে। এই বিদেশী জন-সংখ্যার অধিকাংশই পুরুষ; সমাজ-শাসন ও আত্মীয় নারীর প্রভাব হইতে দূরে বাস করিয়া ইহারা জটিল নৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করিতেছে।

বাঙলার এই শিল্প-নগরগুলি কিভাবে সংস্থিত হইয়াছে, তাহাই আলোচনা করা যাক্; আমরা পূর্বে অন্যত্র বলিয়াছি, বাঙলার প্রধান শিল্পকেন্দ্র বা মিলমণ্ডল হইতেছে কলিকাতার নিকটে ও গঙ্গার দুই ধারে উত্তরে দক্ষিণে ২৫।৩০ মাইলের মধ্যে। বাঙলার প্রধানতম শিল্প হইতেছে পাট: বোম্বাই-এর কাপড়ের কলের চেয়ে বহু সহস্র বেশি লোক এই শিল্পে খাটে; বাঙলার পাট-শিল্প পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পের অন্যতম। এই পাট-শিল্প ও অন্য শিল্প কোথায় গড়িয়াছে দেখা যাক্—

(ক) পাটকল ও বস্ত্রবয়ন—

শ্রীরামপুর, রিশড়া, কোন্নগর, চাপদানী, ভদ্রেশ্বর, বালি, বৈদ্যবাটি, উত্তরপাড়া, বজবজ, বরাহনগর, কামারহাটি, টিটাগড় (কাগজের কল আছে), বারাকপুর, দমদম, গারুলিয়া, খড়দহ, ভাটপাড়া, নৈহাটী।

(খ) পাটের ব্যবসা ও পাটচাপা কারখানা—

নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, মৈমনসিংহ, মাদারীপুর, জামালপুর।

(গ) কয়লা, লোহার খনি ও কারখানা—

আসানসোল, বার্ণপুর, কুলটি, ওণ্ডাল, রাণীগঞ্জ।

(ঘ) রেলওয়ে কারখানা—

হাওড়া-লিলুয়া, খড়্গপুর, হালিশহর, কাঁচড়াপাড়া, সৈয়দপুর, লালমণিরহাট।

(ঙ) নৌশিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র—

কলিকাতা, বরিশাল, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, ঝালকাটি।

গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বাঙলাদেশ কি পরিমাণ শহর-ঘেঁসা হইতেছে এইবার দেখা যাক্।

বৎসর	শহরের লোক-সংখ্যা	বৃদ্ধি
১৮৮১	১৯,৯১,৮৩২	১,৩৪,৩২৭
১৮৯১	২২,২৩,৩৭৮	২,৩১,৫৪৬
১৯০১	২৫,৯৯,১৫৮	৩,৭৫,৭৮০
১৯১১	২৯,৬৮,২৪৭	৩,৬৯,০৮২
১৯২১	৩২,১১,৩০৪	২,৪৩,০৬৪
১৯৩১	৩৭,১১,৯০৪	৫,০০,৬৩৬

নিম্নের তালিকায় শতকরা হারে বৃদ্ধিটি দেখান যাইতেছে—

	বাঙলার জন-সংখ্যা শতকরা বৃদ্ধি	শহরের লোকের শতকরা বৃদ্ধি	বাঙলার বাসিন্দার শতকরা শহরে লোক
১৮৮১	৬.৭	৭.২	৫.৩৫
১৮৯১	৭.৫	১১.৬	৫.৩৮
১৯০১	৭.৭	১৬.১	৬.০৬
১৯১১	৮.০	১৪.২	৬.৫২
১৯২১	২.৮	৮.২	৬.৭৫
১৯৩১	৭.৩	১৩.৪	৭.২৬
	৪৭.২	৭০.৭	

উপরে উদ্ধৃত তালিকা হইতে দেখা যায় ১৯২১ হইতে ১৯৩১ সনের মধ্যে বাঙলার শহরে লোকের সংখ্যা শতকরা বাড়িয়াছে ১৩.৪ হারে; সেই সময়ে সমগ্র বাঙলায় জন-সংখ্যা বাড়িয়াছে ৭.৩। বাঙলার জন-সংখ্যা পঞ্চাশ বৎসরে ৪৭.২% হারে বাড়িয়াছে; সেই সময়ে শহরের লোক বাড়িয়াছে ৭০.৭% হারে। এই হারে বাড়িয়াও বাঙলার প্রতি ১০০ জন লোকের মধ্যে প্রায় ৯২.৭ জন গ্রামেই বাস করিতেছে; পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ৯৪.৬ জন গ্রামবাসিন্দা ছিল। সুতরাং একথা বলা যায় না বাঙলাদেশের লোকে শহর-ঘেঁসা হইতেছে বা বাঙলাদেশ urbanised হইতেছে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বাঙলার উপজীবিকা

বাঙলার প্রধান উপজীবিকা চাষ; চাষীদের একমাত্র উপজীবিকা চাষ; যাহারা খুব পরিশ্রমী তাহারা চাষের শেষে গাড়ী বয়, করাত্তির কাজ করে, মজুরী করে। ভাল চাষীরা ধান ছাড়া আখ, ছোলা, আলু ক্ষেত থেকে তোলে; তবে ভাল জমি সকল চাষীর ভাগ্যে জোটে না। গড়ে চাষী প্রতি ২⅓ একার (প্রায় ৮ বিঘা) জমি পড়ে। ইহারই উপর চাষীর নির্ভর; ইংল্যণ্ডে চাষী-প্রতি ২১ একার, দক্ষিণ আফ্রিকায় ৮৩ একার জমি পড়ে; সুতরাং তাহাদের কাজ থাকে বার মাস। এদেশে ছেলে, নাতি-পুতির মধ্যে জমি নিরন্তর ভাগ বিভাগ হইয়া যায়; সেই জন্য জোত হইয়া গিয়াছে ছোট। অথচ দেশে শিল্প নাই বলিয়া শিল্পীর জাতিরাও মাটি চষিতে আরম্ভ করিয়াছে। শিল্পের অধোগতির কারণ সকলেই মাটিকে আশ্রয় করিয়াছে।

জমিদার শ্রেণীর সংখ্যা ১৩ লাখের কিছু উপর; তাঁহাদের সহায়-সম্বল নায়েব, সরকার, গোমস্তা, পেয়াদা—তাহাদের সংখ্যাও ৫০ হাজার। পূর্বে বহুবিধ আবোয়াব বা অন্যান্য দাবী ছিল; এখন সে-সমস্ত প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। কৃষিকাজে বাঙালী চাষী দিন দিন কমিতেছে; পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতালী চাষী প্রতি বৎসরেই বাড়িতেছে।

কৃষি ছাড়া নানাভাবে বাঙালী জীবিকা অর্জন করে; যেমন চা-বাগিচার কুলি; একশ বছর আগে এ উপজীবিকা ছিল না; বর্তমানে বাঙলার সাড়ে তিন শত চা-বাগিচায় প্রায় তিন লাখ কুলি কাজ করিতেছে; অবশ্য ইহাদের সকলে বাঙালী নয়।

পথ-ঘাট নির্মাণ ও মেরামতি কাজে, রেলওয়েতে, ডকে, নদীতে, কারখানায়, কলে বহু লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে; কিন্তু এসব ক্ষেত্রে বাঙালী কম, অধিকাংশই বিহারী, হিন্দুস্থানী ও ওড়িয়া। গত ষাট বৎসরের মধ্যে পাটের কল, কাপড়ের কল, কাঠের কারখানা, সুরকীর কল, ইটের পাজা প্রভৃতি বিচিত্র

কারবার জাগিয়াছে; এইসবে লক্ষ লক্ষ লোক কাজ করে; কিন্তু ইহাদের অধিকাংশ বাঙলাদেশের বাহির হইতে আসে। বাঙলাদেশ হইতে ১৯২৮ সালে কেবলমাত্র পাটকলের কুলিরা ১,৭৩,৫৭,৮১৬ টাকা বাঙলার বাহিরে পাঠাইয়াছিল।* সমগ্র বাঙলা হইতে অ-বাঙালীরা কত টাকা প্রতি বৎসর কেবলমাত্র শ্রমিকগিরি করিয়া অর্জন করে, তাহার তালিকা পাওয়া যায় না।

জাহাজের কাজে এককালে বাঙলার সুযশ ছিল; এখন বাঙালীর জাহাজ নাই; তবে নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের মুসলমানরা এই কাজে খুবই পটু; হিন্দুরা একাজে নামে না। এককালে বাঙলার শিল্পীরা বাঙালীর নিত্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব দূর করিত। বাঙালীর লজ্জানিবারণের জন্য কাপড় যা প্রয়োজন হইত, তা বাঙালী জোলা, তাঁতিই ঠক্‌ঠকি তাঁতে বুনিত। জাহাজের পাল গ্রামের সূতায়, গ্রামের তাঁতিরা বুনিয়া দিত। এখনো শান্তিপুর, ঢাকা, চন্দননগর, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, বাঁকুড়ায় ধুতি, শাড়ী, ছিট, চাদর বোনা হয়; বর্তমানে কাপড় বাঙলার বাহির হইতে বেশি আসে; বাঙালীর কাপড় যদি বাঙালীই বুনিত, তবে লক্ষ লক্ষ লোকের অন্ন সংস্থান হইত। জীবিকা হিসাবে চাষের পরই বয়নশিল্পে অধিক লোক নিযুক্ত আছে, একথা আমরা ভুলিয়া যাই।

বসনের পর বাসন; আগে কুমারের তৈরী মাটির বাসন ঘরে ঘরে চলিত; প্রতি গ্রামেই কুমার থাকিত। তাছাড়া কাঁসারীদের জিনিষের চলন ছিল। খাগ্‌ড়া (মুর্শিদাবাদ), বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া), দুবরাজপুর (বীরভূম) প্রভৃতি স্থানের কাঁসার ও পিতলের সামগ্রীর এখনো কাট্‌তি আছে। বর্তমানে কাঁসা বা পিতলের চাদর বিদেশ হইতে আসে; কিন্তু পূর্বে দেশেই তৈরী হইত। আজকাল কাঁসা-পিতলের প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিয়াছে এলুমিনিয়াম; ইহার উপাদান বিদেশ হইতে আসে। এছাড়া নানারূপ শস্তা মিশ্রিত ধাতুর বাসনপাত্র য়ুরোপ হইতে আমদানী হইতেছে; তাঁতি কুমারের যে দশা, কাঁসারীর দশাও তথৈব। যাহারা শিক্ষা পাইতেছে, তাহারা চাকুরীর জন্য শহরে ছুটিতেছে। যাহারা অশিক্ষিত, দরিদ্র, তাহারা শিল্প হারাইয়া চাষের জন্য মাটি আঁচড়াইতেছে।

* Bengal Jute Committee Report, 1930.

হিন্দু ও মুসলমান রাজাদের সময়ে অস্ত্রশস্ত্র বাঙলাদেশের কামারে প্রস্তুত করিত। বড় বড় কামান বাঙালী কামারে নিজ শালে গড়িত। বন্দুক, তরবারি, ঢাল, বর্শা, বল্লম, শড়কির ফলা—সবই হইত। বর্দ্ধমান জেলার বোনপাশ এখনো লোহার কাজের জন্য বিখ্যাত। এখন সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র সবই প্রায় বিদেশ হইতে আসে; বাজারে যে-সব সস্তা বন্দুক, পিস্তল, রিভলবার বিক্রয় হয়, তাসবই ইংল্যণ্ড, বেলজিয়াম, জারমেনী বা আমেরিকার তৈরী। কাশীপুর ও দমদমের সরকারী কারখানায় সামান্য কাজ হয় বটে, কিন্তু দেশে এসব বানানো হইলে বহু সহস্র লোক প্রতিপালিত হইতে পারিত। বর্তমানে কামারে কড়া, খুন্তি, চাটু, চিম্‌টে, শাবল, কোদাল, খুর্পী, ফাল প্রভৃতি বানায়। কোনো কোনো স্থানে কারিকরেরা ভাল তালাচাবি করিতে পারে; কিন্তু বিদেশের শস্তা তালাচাবি ও আলিগড়ের তালাচাবিই বাজারে চলে; বাঙলাদেশে তালাচাবির কারখানা নাই। ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি তৈরীর বৃহৎ ফ্যাক্টরী নাই।

তামাক খাওয়া বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের জাতীয় অভ্যাস। বাঙলাদেশে তামাকের চাষ অল্পবিস্তর প্রায় সব জেলাতেই হয়, কিন্তু রঙপুরেই বেশী হয়। তামাক গাছের চাষ, তামাক পাতার ব্যবসা করিয়া, তামাক বানাইয়া অনেক লোক জীবনধারণ করে। কিন্তু বর্তমানে বিদেশী সিগারেট খাওয়ার রেওয়াজ দেশের মধ্যে বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। ধূমপানের সহিত অনেকগুলি শিল্প জড়িত, যেমন মালদের দ্বারা টিকে তৈরী, কুমারের কলিকা তৈরী, ছুতোরের হুকোর খোল, নলচে তৈরীর শিল্প। সিগারেটের চলনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ব্যবসা শিল্প জাগিয়াছে। সিগারেটের বাক্স, টিনের কৌটা, কাগজ, ছাপার কাজ, টিন ব্যবসা প্রভৃতি। বর্তমানে বিড়ি বানাইয়া অনেক লোক জীবিকা অর্জন করে।

পূর্বে গুড় ও চিনির কাজ গ্রামে একদল লোকে করিত; ময়রারা চিনি প্রস্তুত করিত। কিন্তু শিল্প হিসাবে এখন খুব কম লোকই গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া আছে। বর্তমানে চিনির শিল্প ধনিকের ব্যবসা।

পূর্বে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ছিল; নানা বর্ণের লোক নানা শিল্প করিয়া জীবিকা অর্জন করিত; এইভাবেই হিন্দু সমাজের বহু জাতি বা

বর্ণের উদ্ভব। এখন লোকের প্রধান উপজীবিকা হইতেছে চাকুরী; প্রথমত দেশরক্ষা ও শাসন কার্যে বহু সহস্র লোক নিযুক্ত; তবে সৈন্যবিভাগে বাঙালী নাই; পুলিশ বিভাগের কর্মচারীরা বাঙালী—কনষ্টবল পুলিশ অধিকাংশই অ-বাঙালী। বেসরকারী কাজে—যেমন অফিসে, কারখানায় লোকে চাকুরী পায়; সেখানেও অ-বাঙালীর প্রাধান্য। চাষবাসে বহু সহস্র লোক চাকরগিরি করিতেছে। তাহারা হয় জমির অভাবে চাকুরী করিতেছে অথবা নিজ জমি দেনার দায়ে বিক্রয় করিয়া পাওনাদারের নিকট চাকুরী করিতেছে।

বাঙলাদেশের জন-সংখ্যা ৫ কোটির কিছু উপর। এই জন-সংখ্যার মধ্যে সকল বয়সের পুরুষ ও নারী—রোজগারি ও আশ্রিত লোক ধরা হইয়াছে। বাঙলাদেশের সমগ্র জন-সংখ্যার ১,৩৭,৫০,০০০ নর-নারী রোজগেরে; ইহাদের অধীন কর্মক্ষম আশ্রিতের সংখ্যা ৬,৬৩,৮৩৭; এবং কর্মে অক্ষম আশ্রিতের সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৫৭ লক্ষ। মোট কথা, নিখিল বঙ্গে সকল প্রকার উপার্জনক্ষম নর-নারীর সংখ্যা ১ কোটি ৪৪ লক্ষ; অর্থাৎ সমগ্র জন-সংখ্যার শতকরা ২৮·৮% জন হইতেছে রোজগেরে আর ৭১·২ জন হইতেছে আশ্রিত। বিভাগ হিসাবে এই রোজগেরে ও আশ্রিতের অনুপাতে খুব তারতম্য দেখা যায়—

বর্দ্ধমান বিভাগ	...	৩৬·৮%
প্রেসিডেন্সী বিভাগ	...	৩৩·০%
রাজসাহী ও কুচবিহার	...	৩০·০%
ঢাকা বিভাগ	...	২৩·৭%
চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা	...	২১·০%

বাঙলার এই ১,৪৪ লক্ষ রোজগেরের মধ্যে কত লোক কোন কোন বৃত্তি বা ব্যবসাদ্বারা জীবিকা অর্জন করে, তাহা দেখা যাক্। বাঙলার সেন্সাস্ রিপোর্টে সমগ্র বৃত্তিকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; যথা (ক) কাঁচা মাল উৎপাদন, (খ) সামগ্রী প্রস্তুত ও সরবরাহ, (গ) সরকারী চাকুরী ও স্বাধীন উপজীবিকা ও (ঘ) বিবিধ। এই চারিবিভাগকে ১২টি উপ-বিভাগ, ৫৫ শ্রেণী ও ১৯৫টি বৃত্তি বা উপজীবিকায় শ্রেণীত করা হইয়াছে।

এখন এই ১,৪৪ লক্ষ লোকের মধ্যে প্রথম অর্থাৎ (ক)-বর্গে কাঁচামাল

উৎপাদন-কর্মে নিযুক্ত আছে ১,০১,৩১ হাজার; (খ)-বর্গে নিযুক্ত ২৫ লক্ষ ৬ হাজার; (গ)-বর্গে ৩ লক্ষ ৯৩ হাজার; (ঘ)-বর্গে ১৬ লক্ষ ৭৩ হাজার।

১ম শ্রেণী—বাঙলাদেশের প্রধানতম শিল্প কৃষি; সুতরাং এই কৃষিকর্মে বাঙলার রোজগেরে দেড় কোটি লোকের প্রায় এক কোটি নিযুক্ত। কিন্তু ইহার সকলে সত্যই চাষ করে না। লাখ চুয়ান্ন লোক স্বত্ববান্ চাষী এবং প্রত্যেক দুইজন কৃষকের স্থানে একজন ভূমিহীন মজুর আছে। চাষের মজুরের সংখ্যা ২৮ লাখের উপর। ১৯২১ সালের আদম-সুমারীর হিসাবে চাষী ও বরগাদারের যে সংখ্যা ছিল, ১৯৩১ সালে তার থেকে শতকরা ৩৫% হারে কম; আর সেই জায়গায় ভূমিহীন শ্রমিকের সংখ্যা ১৮ লক্ষর স্থানে ২৭ লক্ষ অর্থাৎ শতকরা ৫০% ভাগ বেশি। জমিদার, পত্তনিদার, বড়প্রজা যাহারা নিজহাতে চাষ করে না, অর্থাৎ যাহারা বিষয়ভোগী—তাহাদের সংখ্যা ৩,৯০ হাজারের স্থানে ৬,৩৩ হাজার হইয়াছে। ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্যের বিষয় যে, বাঙলার কৃষির জমি ক্রমশই অ-চাষী মধ্যবিত্ত বা মহাজনের হাতে গিয়া পড়িতেছে ও ভূমিহীন শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। জমিদার, নায়েব, গোমস্তা প্রভৃতির তুলনায় যথার্থ চাষীর সংখ্যা কত, তাহার একটা তালিকা সেন্সাসে পাওয়া যায়; তাহা হইতে জানা যায় প্রতি একশ' জন জমিদার-শ্রেণীর লোকের জন্য বাঙলার ১২৯৭ জন চাষী চাষ করে। যে-সব চাষী প্রত্যক্ষভাবে জমি হইতে জীবিকা উপার্জন করে, তাহাদের সংখ্যা সবথেকে বেশি চট্টগ্রাম-পার্বত্য-প্রদেশে ও সিকিমে—প্রত্যেক জমিদার বা তৎশ্রেণীর লোকের পিছু যথাক্রমে ১১০ ও ১৮৬৮ জন চাষী*। কিন্তু কুচবিহার, দিনাজপুর, বীরভূম, মেদিনীপুর, ত্রিপুরারাজ্যে প্রত্যক জমিদার পিছু ২৪ হইতে ৫০ জন চাষী আছে; অন্যান্য জেলায় আরও কম; হাঁওড়া, বর্দ্ধমান, যশোহর, ফরিদপুর, চট্টগ্রামে একজন জমিদারে ৭।৮ জন চাষী আছে।

মোটকথা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চাষীর সহিত যুক্ত ও চাষের উপর নির্ভরশীলের সংখ্যা এবং চাষের আয় হইতে বিষয়ভোগীর সংখ্যা বাঙলাদেশে শতকরা ৭০ এর উপর।

খাদ্যশস্য ও অন্যান্য ফসল উৎপন্ন করা ছাড়া গ্রামে লোকে মাছ ধরিয়া

* Census of Bengal, Vol. 1, p. 272.

জীবিকা অর্জন করে; তাহাদের সংখ্যা দুই লাখের কিছু কম। কিন্তু ১৯২১ সাল হইতে ইহাদের সংখ্যা অনেক বেশি; এ সংখ্যাধিক্য কেবল গণনা-পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্য হয় নাই; যে-সব লোক ভূমিহীন হইয়াছে, তাহারা গ্রামের এই মাছধরা কাজে লাগিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

২য় শ্রেণী—খনির কাজে বাঙলায় ৪৩ লক্ষ লোকের নির্ভর; খনি বলিতে বুঝায় পশ্চিম বঙ্গের কয়লার খনি। সেখানে ৪২ হাজার শ্রমিক কাজ করে।

৩য় শ্রেণী—শিল্প। শিল্প খুবই ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাঙলাদেশের প্রায় ১২।১৩ লক্ষ লোকের রোজগার হয় নানা শিল্প হইতে। ১৯২১ সাল থেকে প্রায় চার লাখ লোক শিল্পে কমিয়াছে; হ্রাস যে সত্যই হইয়াছে, তাহা আমরা শিল্প পরিচ্ছেদ আলোচনা কালে দেখাইয়াছি; ১৯২৯ সাল হইতে ফ্যাক্টরী সমূহের দুর্দিন আরম্ভ হয় এবং বহু লক্ষ লোক কর্মাভাবে বেকার হইয়াছিল।

কৃষির পর বয়ন শিল্পেই সবথেকে অধিক সংখ্যক লোক নিযুক্ত আছে। বাঙলার পাটই প্রধান বয়ন শিল্প; ২,৬১ হাজার লোক পাটকল, চটকলে রোজগার করে। বস্ত্রশিল্পে প্রায় ১,৮২ হাজার লোক নিযুক্ত; ইহার অধিকাংশই তাঁতে কাজ করিত; আশ্চর্যের বিষয়, এতবড় অসহযোগ আন্দোলনের পরেও তাঁতির সংখ্যা বাড়িল না!

রেশমের কাজ ধ্বংসোন্মুখ; বিদেশী রেশমের প্রতিযোগিতায় দিন দিন এই শিল্প হটিয়া যাইতেছে।

চামড়া, কাঠ, চুবড়ি, ধাতু, কুম্ভকারের কাজ, তৈল নিষ্কাশন, ধান ভাঙ্গা, দর্জির কাজ প্রভৃতি বিচিত্র শিল্প কর্মে বহুলোক নিযুক্ত আছে।

চতুর্থ শ্রেণী—বর্তমান জগতে কেবল শিল্পদ্রব্য উৎপাদনই সভ্যতার নিদর্শন নহে; সেই সব শিল্পজাত সামগ্রী নানাস্থানে প্রেরণ, শিল্পের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ প্রভৃতি কাজ সভ্যতার অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। সেই জন্য নানারূপ যানবাহন আছে; রিকস্, গোরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, মোটর গাড়ী, রেলপথ, ট্রাম, নৌকা, জাহাজ, এরোপ্লেন—এইসব যান হইতেছে বস্তু ও মানুষ বহনের যন্ত্র। মুটে, মজুর এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। বিগত যুদ্ধের পর মোটর গাড়ী অতি ব্যাপকভাবে এদেশের শহরে ও গ্রামের মধ্যেও প্রবেশ

করিয়াছে। সকল প্রকার যানবাহনের কার্যে প্রায় তিন লক্ষ লোক রোজগার করে।

পঞ্চম শ্রেণী—ব্যবসা ও বাণিজ্যে বাঙলায় প্রায় সাড়ে নয় লাখ লোক নিযুক্ত আছে। ব্যাপারী, দোকানী, মুদি, ফেরিওয়ালা, কশাই, ব্যাঙ্ক ম্যানেজার, মহাজন, বীমা-এজেন্ট প্রভৃতি সকলেই এই শ্রেণীতে পড়ে।

গ-বর্গ। এই বর্গে সরকারী চাকুরী ও অন্যান্য ভদ্র পেশা পড়ে; ৩,৯৩ হাজার লোক এই বর্গে রোজগার করে। ১৯২১ সাল হইতে প্রায় ২৩ হাজার বেশি।

ঘ-বর্গ। এই বর্গে বিবিধ বিষয় ধরা হইয়াছে।

নিম্নে বাঙলাদেশে কোন বিষয়ে কত লোক নিযুক্ত তাহার তালিকা দিলাম; ১৯২১ সালের সহিত তুলনা করা হইল না; কারণ দুইবারের গণনা পদ্ধতি পৃথক্; তুলনার দ্বারা কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন।

পরিশিষ্ট ১

বাঙলাদেশে ১৯৩১ সালে বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বনকারী রোজগেরে লোকের সংখ্যা—

	(হাজার)	দশ হাজার লোকের মধ্যে
সকল প্রকার বৃত্তি	১,৪৭,০৪	২,৮৭৮
(ক) কাঁচামাল উৎপাদন	১,০১,৩১	১,৯৮৩
(খ) শিল্পাদি কর্ম	২৫,০৬	৪৯০
(গ) সরকারী ও ভদ্রকাজ	৩,৯৩	৭৭
(ঘ) বিবিধ	১৬,৭৩	৩২৮

বিস্তৃত বিবরণ

ক। কাঁচামাল উৎপাদন	১,০১,৩১	১,৯৮৩
১। গোপালন ও কৃষি	৯৮,৯৫	১,৯৭৫
(ক) সাধারণ চাষ	৯৪,৭৭	১,৮৫৫
১। বিষয়ভোগী	৬,৩৪	
২-৪। নায়েব-গোমস্তা প্রভৃতি	৪৪·৫	
৫। স্বত্ববান্ চাষী	৫২,১০	
৬। প্রজা বা বরগাদার চাষী	৮,৩১	
৭। চাষের মজুর	২৭,১৯	
৮। জুম প্রভৃতি চাষী	৩৮	
(খ) বাগিচা—চা, পান, গাঁজা প্রভৃতির চাষ	২,৯৩	৫৮
(গ) বন বিভাগ	৬	১
(ঘ) গোপালন	১,১৮	২৩

	(হাজার)	দশ হাজার লোকের মধ্যে
(ঙ) রেশম, লাক্ষা ইত্যাদি	·৭	...
২। মাছধরা, শিকার,	১,৯২	৩৮
খনি ও ধাতু	৪৩	৮
৩। ধাতুর কার্য	৭	
৪। কয়লা প্রভৃতি	৪২	
খ। সামগ্রী প্রস্তুত ও সরবরাহ	২৫,০৬	৪৯০
শিল্প	১২,৮১	২৫১
৫। বয়ন শিল্প	৪,৫৭	৯০
(ক) তুলার কাজ	৫·২	
(খ) তাঁত ইত্যাদি	১,৭২	
(গ) পাট ও চট কল	২,৬১	
(ঘ) সুতা দড়ি বানানো	৯·৪	
(ঙ) পশমের কাজ	·৭	
(চ) রেশমের কাজ	৪·৮	
(ছ) বালামছির কাজ	·৮	
(জ) রঙরেজ	·৪	
(ঝ) লেস্ ক্রেপ প্রভৃতি	১·৫	
৬। চামড়ার কাজ	১২	২
৭। কাঠ	১,৪০	২৭
৮। ধাতু	৫০	১০
৯। কুম্ভকার, ইট, টালি ইত্যাদি	৭৯	১৫
১০। রাসায়নিক দ্রব্য	৩৮	৭
১১। খাদ্য	১,৭৯	৩৫
১২। পোষাক, পরিচ্ছদ	১,৭২	৩৪
১৩। আসবাবপত্র	২·৯	১
১৪। গৃহনির্মাণ	৫৪	১১

শিল্প	(হাজার)	দশ হাজার লোকের মধ্যে
১৫। যানবাহননির্মাতা	৫'৩	১
১৬। গ্যাস্, বিজলীর কাজ	৩'৩	১
১৭। বিবিধ	৮৬	১৭
	২,৮৩	৫৫
গমনাগমন		
১৮। আকাশযান	১	...
১৯। জলযান	৮২	১৬
২০। স্থলযান	১,২০	২৪
২১। রেলপথ	৬৯	১৩
২২। পোষ্ট, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন	১০	২
ব্যবসা-বাণিজ্য	৯,৪১	১৮৪
২৩। ব্যাঙ্ক, এক্সচেঞ্জ, বীমা	৪৯'৭	১০
২৪। দালালি	৯	২
২৫। বস্ত্রাদির ব্যবসা	৬৩	১২
২৬। চামড়ার ব্যবসা	২৪	৫
২৭। কাঠের ব্যবসা	১৮	৩
২৮। ধাতুর ব্যবসা	২	...
২৯। ইট, টালির ব্যবসা	৯	২
৩০। রাসায়নিক দ্রব্য	৩	১
৩১। হোটেল ইত্যাদি	১৪	৩
৩২। অন্যান্য খাদ্যের ব্যবসা	৫,০৮	১০০
৩৩। পোষাক-পরিচ্ছদ বিক্রেতা	৭	১
৩৪। আসবাবপত্রের ব্যবসা	১২	২
৩৫। গৃহনির্মাণের সামগ্রী	৩	১
৩৬। যানবাহনের ব্যবসা	৬	১
৩৭। কাঠ, ঘুঁটে বিক্রয়	১৪	৩
৩৮। সোনারূপার গহনা, কাঁচের		

	শিল্প	(হাজার)	দশ হাজার লোকের মধ্যে
	চুড়ি, বই ইত্যাদি	৩৯	৮
৩৯।	বিবিধ	১,৫৫	৩০
গ।	সরকারী কার্য ও ভদ্রপেশা	৩,৯৩	৭৭
	সরকারী সৈন্যাদি	৫৯	১২
৪০।	সৈন্য	২'৯	১
৪১।	নৌবাহিনী	'০১৬	...
৪২।	আকাশযান	'০১৫	...
৪৩।	পুলিশ	৫৬	১১
	পুলিশ—২১,৮১১		
	চৌকিদার—৩৪,২২৪		
৪৪।	সাধারণ শাসন	৫০	১০
	ভদ্র পেশা	২,৮৩	৫৫
৪৫।	ধর্ম	৮২	১৬
৪৬।	আইন	৩০	৬
৪৭।	ঔষধ	৬৮	১৩
৪৮।	শিক্ষা	৭৪	১৫
৪৯।	বিবিধ শিল্পকলা	২৭	৫
ঘ।	বিবিধ	১৬,৭৩	৩২৮
৫০।	নিজ আয়ের উপর নির্ভর		
	পেনশানার, বড় লোক ইত্যাদি	২৫	৫
৫১।	ভৃত্য	৮,০৯	১৫৯
৫২।	শিল্পী, কণ্ট্রাক্টর ইত্যাদি	৬,২৭	১২৩
	অকেজো	২,১১	৪১
৫৩।	জেলবাসী ইত্যাদি	২০	৪
৫৪।	ভিক্ষুক, ভবঘুরে, বেশ্যা	১,৬৬	৩৭
৫৫।	অন্যান্য	১	...

পরিশিষ্ট ২

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে নিযুক্তের অনুপাত

শহর ও গ্রামের বাসিন্দা

১৯২১

দেশ			
ইংল্যাণ্ড	শিল্প—৩৯·৭	শহর	৭৯·৩
	কৃষি—৬·৮	গ্রাম	২০·৭
	বাণিজ্য—১১·২		
মার্কিন রাজ্য	শিল্প—২৯·৩	শহর	৫১·৪
	কৃষি—২২	গ্রাম	৪৮·৬
	বাণিজ্য—১৫		
ফ্রান্স	শিল্প—৩৮	শহর	৫১
	কৃষি—৩৮	গ্রাম	৪৯
	বাণিজ্য—১৯		
জার্মেনী	শিল্প—৩৮		
	কৃষি—৩০		
	বাণিজ্য—১১		
ইতালি	শিল্প—২৪		
	কৃষি—৫৬		
	বাণিজ্য—৬·৪		
বুলগেরিয়া	শিল্প—৮		
	কৃষি—৮২		
	বাণিজ্য—২·৭		
রুমানিয়া	শিল্প—৭·৮		
	কৃষি—৮০		
	বাণিজ্য—২·৭		
লাটবিয়া	শিল্প—১০		
	কৃষি—৬৮		
	বাণিজ্য—৪·৮		

মিশর	শিল্প—৮ কৃষি—৬৯ বাণিজ্য—৪'৮			
ভারতবর্ষ	শিল্প—১১'২ কৃষি—৭২ বাণিজ্য—৬			
	১৯২১		১৯৩১	
বাঙলাদেশ	শিল্প—১০ কৃষি—৭১'৯ বাণিজ্য—৫'৯	শ ৬'৭ গ্রা ৯৩'৩	শি ৮'৮ কৃ ৬৮'৩ বা ৬'৪	শ ৭'২৬ গ্রা ৯২'৭৪

ইহা যথার্থ কম নহে ; ১৯৩১-এর সেন্সাসের অঙ্কগুলি নূতনভাবে গৃহীত বলিয়া সংখ্যা-ন্যূনতা দেখাইতেছে।

পরিশিষ্ট ৩

কৃষি ও শিল্পে নিযুক্ত অধিবাসীর অনুপাত

	কৃষি				শিল্প			
	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
ভারতবর্ষ	৬৫ ২	৬৯'৮	৭০'৯		১৫'৫	১১'৪	১০'৭	
বঙ্গদেশ	৭১'৫	৭৫'৪	৭৭'৩	৬৮'৩	১২'৩	৭'৭	৭'৮	৮'৮
আসাম	৮৪ ২	৮৫'৪	৮৮'০		৭'৮	৩'২	২'৬	
বিহার-উড়িষ্যা	...	৭৮'৩	৭৯'৭		১২'৩	৭ ৭	৭'৮	
বোম্বাই	৫৮'৬	৬৪'৩	৬১'৬		১৮'২	১২'৭	১২'২	
মধ্যপ্রদেশ	৭০'০	৭৫'৫	৭৪'২		১৬'২	১০'২	৯'৩	
মাদ্রাজ	৬৯ ০	৬৮'৭	৭০'৮		১৭'৫	১৩'৪	১১ ৩	
উ-প-সী-প্রদেশ	৫৬'৯	৬৬'৭	৬৫'০		১৯'৪	১১'৫	১২'৬	
পাঞ্জাব	...	৫৮'০	৫৯'০		...	২০'৫	১৯'৩	
যুক্তপ্রদেশ	৬৫'৫	৭১'৬	৭৫'০		১৪'৯	১২'২	১১'০	
বর্মা	৬৬'১	৬৯'১	৭০'৭		১৮ ৬	৬'৮	৬'৯ *	

* Jathar & Beri, Indian Economics, 3rd ed., vol. I, p. 139.

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

অক্ষম ও অকর্মণ্য

কোনো দেশেই সকল লোক সুস্থ ও কর্মঠ নহে; অন্ধ, খঞ্জ, বোবা-কালা ও কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তেরা কাজ করিতে পারে না। সমাজ বা রাষ্ট্র তাহাদের দুঃখকে লাঘব করে। এদেশে সমাজই এতকাল এই দুঃস্থদের দুঃখ দূর করিবার ভার লইয়াছিল। এখন জীবনের আদর্শ পরিবর্তিত হইয়াছে। সুতরাং ইহারা নূতন সমস্যা সৃষ্টি করিতেছে।

বাঙলাদেশে উন্মাদের সংখ্যা লক্ষকরা ৪৪ জন; দশ বৎসর পূর্বে ছিল ৪১ জন করিয়া। ইহার মধ্যে রাজসাহী বিভাগে (৫৮) ও চট্টগ্রামে উন্মাদের অনুপাত বেশি। উন্মাদের চিকিৎসা ও রক্ষার জন্য বর্তমানে বাঙলাদেশে কোনো হাসপাতাল নাই;* বহরমপুর ও ঢাকার পাগ্‌লাগারদ ১৯২৫ সাল হইতে উঠিয়া গিয়াছে; এখন বাঙলার রোগীরা রাঁচির হাসপাতালে আশ্রয় পায়। বোম্বাই (৫৯) ও বর্মা (৯৯) ছাড়া ভারতের আর কোনো প্রদেশে উন্মাদের সংখ্যা এত বেশি নয়।

কালা ও বোবার অনুপাত একলাখে ৭০ জন; দশ বৎসরে লক্ষকরা ৩ জন করিয়া বাড়িয়াছে। জলপাইগুড়ি (১৫৪), দার্জিলিঙ (১৮১) ও সিকিমে (১৪৯) ইহাদের সংখ্যা বেশি। ইহাদের শিক্ষার জন্য কলিকাতা, ঢাকা, মৈমনসিংহ, বরিশাল ও চট্টগ্রামে বিদ্যালয় আছে; ইহার মধ্যে কলিকাতার স্কুলই বিখ্যাত। ১৮৯৩ সালে উহা প্রতিষ্ঠিত হয়; এ পর্যন্ত ৮০০ ছাত্র ইহাতে শিক্ষা লাভ করিয়াছে।

অন্ধের সংখ্যা ৩৭,৪০০ বা লক্ষকরা ৭৩ জন। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়ায় লক্ষকরা ১০৯ হইতে ১৩০ জন অন্ধ। অন্ধদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় কলিকাতায় আছে।

কুষ্ঠের অনুপাত লক্ষকরা ৪২; দশ বৎসর পূর্বে লক্ষকরা ৩৩ ছিল। বর্দ্ধমান বিভাগে এই রোগ খুব প্রবল; বর্দ্ধমানে (১৩৮), বীরভূমে (১৮৯),

* অল্পদিন হইল কলিকাতার উপকণ্ঠে একটি হাসপাতাল হইয়াছে।

বাঁকুড়ায় (৩১৪) কুষ্ঠের সংখ্যা বেশি। দারিদ্র্য, অপরিচ্ছন্ন আহার, আবাস ও কুৎসিৎ ব্যাধি ও তাহার গ্রাম্য চিকিৎসা—এই ব্যাধি প্রসারের অন্যতম কারণ। বর্তমানে অনেক হাসপাতালে চালমুগরার ইন্‌জেকসান চিকিৎসা হইতেছে। ইহাদের সেবার জন্য দুই চারিটি আশ্রম আছে; অধিকাংশগুলি খ্রীষ্টানদের দ্বারা পরিচালিত।

এক লাখ লোকের মধ্যে

	উন্মাদ		বোবা-কালা		অন্ধ		কুষ্ঠগ্রস্ত	
	১৯২১	১৯৩১	১৯২১	১৯৩১	১৯২১	১৯৩১	১৯২১	১৯৩১
বঙ্গদেশ	৪১	৪৪	৬৭	৭০	৭২	৭৩	৩৩	৪২
বৃটিশ বাঙলা	৪০	৪৩	৬৭	৭১	৭২	৭৩	৩৩	৪২
বর্দ্ধমান বিভাগ	২৬	৩৭	৬৬	৭৫	৯০	১০১	৯০	১১২
বর্দ্ধমান	২৭	৩৯	৭২	৮০	১০৫	১১৫	১১২	১৩৮
বীরভূম	২২	২৫	৬০	৮৬	৯৫	১০৯	১৪৮	১৮৯
বাঁকুড়া	২৮	৩৭	৬৯	৮৪	১৬০	১৩০	২৭০	৩১৪
মেদিনীপুর	২৪	৩৪	৮০	৬৩	৮৭	৯৩	৪৮	৫৯
হুগলী	২০	৪০	৩১	৭১	৬০	৯১	১৫	৩০
হাবড়া	৪২	৪৮	৫৬	৯৬	৭৫	৭৫	১৭	২১
প্রেসিডেন্সী বিভাগ	৪৪	৪২	৬১	৫১	৭৪	৭৪	২৪	২৪
২৪ পরগণা	৩৮	৪৫	৪২	৫৬	৬০	৭০	১০	১৪
কলিকাতা	৩৫	৩৫	৫৩	২৯	৫৮	৪৯	২৯	২১
নদীয়া	৩২	৪৪	৫০	৬০	৯১	৯৬	২৮	৩১
মুর্শিদাবাদ	৭৬	৩১	৮০	৬০	১০৭	১১৭	৫৭	৬৪
যশোহর	৪৩	৪১	৯৫	২৬	৭৫	৬৪	১৩	১৩

খুলনা	৪৮	৫০	৫২	৬৯	৬২	৫৫	৯	১১
রাজসাহী বিভাগ	৫০	৫৮	৮৩	৯৩	৭৭	৮১	২৬	৪২
রাজসাহী	৩৭	৪৫	৬০	৭১	৬৯	৭৩	১০	২০
দিনাজপুর	৫৫	[illegible]	৭৬	৯৮	৭৬	৭৪	৮	৩৩
জলপাইগুড়ি	৭২	৭৩	১৩৫	১৫৫	৮৭	৮৭	৫২	৯৭
দার্জ্জিলিং	২০	১৪	১৬২	১৮১	৫২	৬১	২৮	৪৯
রঙ্গপুর	৬৩	৭২	৮৬	৯৩	৭৭	৭৪	৫০	৬২
বগুড়া	৪৭	৫৮	৭১	৭১	৭৩	৯৭	১৬	১৮
পাবনা	৪৯	৫৮	৮৮	৭৭	৮৪	৯১	১৪	১৫
মালদহ	২০	৩৬	৫৪	৭০	৭৮	১১১	২৪	৪৩
ঢাকা বিভাগ	৩৯	৩৮	৫৪	৭১	৬১	৫৯	২০	২৩
ঢাকা	৪৯	৩৩	৭৯	৬৭	৭২	৫৭	২২	১৬
মৈমনসিংহ	৩৫	৪৬	২১	৮৭	৫৪	৬৮	৩১	৪২
ফরিদপুর	৪০	৩০	৮৬	৬০	৭৬	৫৩	১৩	৭
বাখরগঞ্জ	৩১	৩৮	৬১	৫৭	৫০	৫২	৬	৯
চট্টগ্রাম বিভাগ	৪০	৪২	৭৮	৫৯	৫৮	৫২	১৫	১৭
ত্রিপুরা	৩১	৩১	৭৮	৫৬	৫৮	৫০	১৮	১৫
নোয়াখালি	২৯	৩৪	৭৩	৬৩	৪৭	৪০	৪	১১
চট্টগ্রাম	৫৬	৫৮	৭৩	৬১	৫৬	৬৩	১১	২০
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	১৩৯	১২১	১৫৬	৬২	১৫৯	৯৫	৮৮	৯২
কুচবিহার	৮২	৭৯	৮৮	৩৬	৮৯	৭৩	৫৫	৪৫
ত্রিপুরা	৬১	৬১	৭৯	৫৬	৭২	৫৯	৩৯	৩৮

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বাঙলার সমাজ

বাঙলার ভিতরে বা সীমান্তে যে-সব লোক বাস করে, তাহারা সকলে এক জাতের নয়, এক ধর্মের নয়, এক ভাষাভাষীও নয়; এ-দেশের অনেক হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান এক জাতি সম্ভূতও বটে, আবার অনেকে নয়ও বটে; বাঙালী জাতি কিভাবে গঠিত হইয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক্।

আর্যরা যখন এদেশ জয় করেন, তাহারও পূর্বে এদেশে প্রাক্-আর্য বাসিন্দা নানা জাতির লোক বাস করিত। আর্যরা মুষ্টিমেয় হইলেও পরাক্রমশালী ছিলেন; গঙ্গা নদী বাহিয়া তাঁহারা ধীরে ধীরে এদেশে উপনিবেশ স্থাপন ও দেশ জয় করিতে আরম্ভ করেন। প্রাচীন বাসিন্দাদের কয়েকটি শাখা ছোটনাগপুরের পর্বতে, কতকগুলি পূর্ববঙ্গের জলাভূমিতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। যাহারা বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকিল, তাহারা আর্যভাষা গ্রহণ, আর্যধর্ম ও আচার অনুকরণ করিয়া 'ভদ্র' সমাজের গা ঘেঁসিয়া ধাপে ধাপে বসিয়া পড়িল। জাতিসংঘাত আজ যেমন তীব্র, সেদিনও ভারতের অনার্যদের লইয়া জয়ী আর্যদের তেমনি সমস্যা হইয়াছিল; আর্যরা মুষ্টিমেয়, অনার্য দ্রাবিড় ও মোঙ্গলীয়রা অগণ্য; সুতরাং এই অগণিত অনার্যদের সহিত নিরন্তর বিরুদ্ধতা করিয়া বাঁচা অসম্ভব, আবার তাহাদিগকে লোপ করাও সম্ভব হইল না; অথচ সমগ্র ধর্মশাস্ত্রে অনার্যদের মধ্যে সেই মনোভাবই দেখিতে পাই, যাহা কৃষ্ণাঙ্গের প্রতি শ্বেতাঙ্গরা আজও বহন করেন। কালে আর্য, দ্রাবিড় ও মুণ্ডারীদের সংমিশ্রণে বাঙালী জাতির বিচিত্র বর্ণ সৃষ্ট হইল। এই তিন জাতিই যে কেবল বাঙালীকে গঠন করিয়াছে, তাহা নহে; পূর্ববঙ্গের পূর্বদিকস্থ পর্বত ভেদ করিয়া মোঙ্গলীয়দের নানা শাখা এদেশে আসিয়াছিল; তাহাদের সহিতও স্থানীয় আদিমদের সংমিশ্রণ হইয়াছিল। আর্য, দ্রাবিড়-মুণ্ডারী ও মোঙ্গল—শ্বেত, কৃষ্ণ ও পীত—এই

তিন বর্ণের সংমিশ্রণে বাঙালী জাতি গঠিত; এই ত্রিস্রোতা প্রাণশক্তির দ্বারা বাঙালী সঞ্জীবিত হইয়াছে।

কিন্তু হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রবেশ করে নাই, বা ইস্‌লামধর্ম গ্রহণ করিয়া একীকৃত হয় নাই—এমন বিস্তর জাতি বাঙলার সীমান্তে রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে চাক্‌মা, লুশাইরা চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশে বাস করে। ত্রিপুরা জেলার পূর্বদিকে বাস করে টিপ্‌রা, কুকী; সুরমা উপত্যকার পূর্বে থাকে মণিপুরীরা। টিপ্‌রাদের এক অংশ সম্পূর্ণরূপে বাঙালী হইয়া গিয়াছে। মণিপুরীরা বাঙালী না হইলেও হিন্দু-বৈষ্ণব হইয়াছে। মৈমনসিংহের উত্তরে যে পর্বতসারি আছে, তাহাতে গারো, খাশি, জয়ন্তি ও নাগা জাতি বাস করে। ইহারা পূর্বে অসভ্য ছিল, এখনও অনেকে অত্যন্ত বন্য ভাবাপন্ন; তবে খ্রীষ্টান পাদরীদের চেষ্টায় এইসব জাতির মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, সভ্যতা প্রসার লাভ করিয়াছে। খাশি জাতির প্রায় পনের আনাই খ্রীষ্টান। ইহাদের ভাষায় রোমান লিপিতে বহু গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। বাঙলার উত্তরে দার্জিলিঙ ও ভুটানে বাস করে লেপ্‌চা ও তিব্বতী বা ভোট; ইহারা বৌদ্ধ। এ ছাড়া বিস্তর নেপালী দার্জিলিঙে বাস করে; উত্তরবঙ্গের অনেক জায়গায় ইহারা চাষবাস ও দুগ্ধের ব্যবসা করে।

বাঙলার পশ্চিমে সাঁওতালপরগণা। কিন্তু বাঙলার মধ্যে বীরভূম, বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমানে বহুসহস্র সাঁওতাল বাস করিতেছে। ইহারা চাষী ও শ্রমজীবী। নিজেদের জেলা ছাড়িয়া গঙ্গা পার হইয়াও দিনাজপুরে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। রেলপথের সাহায্যে তাহারা আরও দূরে গিয়া বাস করিতেছে। সাঁওতালীভাষাভাষী কোড়া নামে একটি উপজাতি বীরভূম ও সাঁওতাল-পরগণায় বাস করে; ইহারা ক্রমশ হিন্দুভাবাপন্ন ও বাঙলাভাষাভাষী হইয়া আসিতেছে। সাঁওতালদের মধ্যে খ্রীষ্টানরা ধর্মপ্রচার কার্য করিতেছেন। দুমকা, বেনাগড়িয়া এইসব মিশনের কেন্দ্র। এই প্রত্যন্তবাসী আদিমরা এখন বাঙলার আর্থিক জীবনে কায়েমী হইয়া বসিয়াছে। ১৮৯১ সালে উচ্চবর্ণের সংখ্যা ছিল সাড়ে ২২ লক্ষ; চল্লিশ বৎসর পরে ১৯৩১ সালে দেখি ৩১ লক্ষ দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ ১০০র স্থানে ১৩৭ হইয়াছে। সেই সময়ে পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে আদিমরা বাড়িয়াছে ১০০ হইতে ৩১৯। অর্থাৎ উচ্চবর্ণ বাড়িয়াছে

চল্লিশ বৎসরে দেড়গুণের কম; আর এই আদিম জাত বাড়িয়াছে সওয়া তিনগুণের কাছাকাছি।

এই সীমান্ত বা প্রত্যন্তবাসী বিচিত্রজাতির কথা বাদ দিলে খাশ বাঙলার বাসিন্দারা প্রধানত হিন্দু ও মুসলমান—এই দুই প্রধান ধর্মে বিভক্ত। আদিম হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণাদি বর্ণদ্বারা গঠিত। তারপর বিজিত দেশের যাহারা আর্যশক্তিকে স্বীকার করে নাই, তাহাদিগকে আর্যরা ধ্বংস করে নাই, সমাজের নানা স্তরে স্থান দিয়া কোনো মতে তাহাদিগকে নিজের লোক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু তাহারা সম্পূর্ণরূপে যে তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করে নাই, তাহার প্রমাণ হইল যখন ইস্‌লাম আসিল। ইস্‌লামের উদার ধর্মনীতি বাঙলার তথাকথিত হিন্দুদের আহ্বান করিয়া লইল। *পূর্ব-বঙ্গের জলাভূমিতে যাহারা আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাদের একদল ইস্‌লামের আহ্বানে সাড়া দিল, যাহারা তখন হিন্দুসমাজ ত্যাগ করে নাই, তাহারা ঊনবিংশ শতাব্দীতে খ্রীষ্টান পাদরীদের আহ্বানে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। হিন্দু-সমাজ বিপুল কিন্তু বলিষ্ঠ নহে।

বাঙলাদেশের আড়াই কোটি হিন্দু এক নহে, ইহাদের মধ্যে অসংখ্য ভেদ; স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য, জলচলনীয়, অচলনীয় লইয়া এত ভাগবিভাগ আছে যে, তাহা লিখিতে গেলে একখানি দীর্ঘ গ্রন্থ হয়; বাঙলায় সেরূপ গ্রন্থের অভাব নাই; কিন্তু আমরা সেই অভাবাত্মক, বিরোধমূলক আত্মঘাতী আদর্শকে অযথা আলোচনার দ্বারা লোকের মনে ক্ষুব্ধতা আনিতে চাহি না; তবুও সমাজের যথার্থ অবস্থাটা জানা প্রয়োজন। হিন্দুসমাজের নেতা, গুরু, শিক্ষক ও পুরোহিত হইতেছেন ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণের সংখ্যা হিন্দু জন-সংখ্যার শতকরা মাত্র তিনজন। বিশেষ কতকগুলি শক্তি, সাধনা ও গুণের দ্বারা এককালে তাঁহারা সমাজে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। আবার ব্রাহ্মণ বলিলেও একটি বর্ণ বুঝায় না; সপ্তশতী, রাঢ়ী, বারেন্দ্র, মধ্যশ্রেণী, বৈদিক, গ্রহবিপ্র, পীরালী, অন্ত্যজ জাতির পূজারী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বহু ভাগ আছে; ইহাদের কাহারও সহিত কাহারও বিবাহাদি হয় না; এমন কি, গ্রহবিপ্রাদি

* বিনয়কুমার সরকার, বাড়তির পথে বাঙালী, পৃঃ ২৫৭।

ব্রাহ্মণরা ব্রাহ্মণসমাজে অপাংক্তেয়; পীরালী ব্রাহ্মণরা জাতিচ্যুত। এককালে আর্য-বিজিত জাতিদের মধ্য হইতে অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান্ ও শিক্ষিত লোক-দিগকে ব্রাহ্মণ করিয়া লওয়া হইত যেমন আজকাল খ্রীষ্টানরা দেশীয় লোকদের মধ্য হইতে পাদরী করিয়া লয়।

বৌদ্ধযুগে বাঙলাদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবলতা সুস্পষ্ট হয় নাই; ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানের সময় দেখা গেল মাত্র সাত শত ঘর ব্রাহ্মণ বাঙলায় আছেন, তাঁহারা ক্রিয়াকর্মবিহীন, আচারহীন, বেদ-অনভিজ্ঞ। প্রবাদানুসারে রাঢ়দেশের শূরবংশীয় রাজা আদিশূর (৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে) কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন সদ্‌ব্রাহ্মণকে সপুত্রপরিজন এদেশে আনয়ন করেন। কালে তাঁহাদের বংশধরগণের যাঁহারা রাঢ়দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন তাঁহারা রাঢ়ী-শ্রেণীয় ও বরেন্দ্রভূমে যাঁহারা বাস করিতে থাকেন তাঁহারা বারেন্দ্রশ্রেণীয় বলিয়া পরিচিত হইলেন।

একাদশ শতাব্দীতে বাঙলার হিন্দুরাজা বল্লালসেন আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি নবগুণ-সম্পন্ন ৩৩ জন ব্রাহ্মণকে 'কুলীন' করেন, অর্থাৎ সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করেন বলিয়া একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। বল্লালী প্রবাদানুসারে অবশিষ্ট ব্রাহ্মণরা শ্রোত্রীয় বলিয়া খ্যাত হইলেন,—ইহা ইংল্যাণ্ডের 'লর্ড' ও 'আর্ল' ইত্যাদির ন্যায় উপাধি। কিন্তু কালে কুলীন পণ্ডিতদের বংশধরের মধ্যে নানা দোষ ঢুকিল। মুসলমানদের বাঙলা জয়ের ফলে নানা শ্রেণীর মধ্যে নানা স্বেচ্ছাচার, কদাচার দেখা দিল, যেমন হইয়াছিল ইংরেজদের আগমনের পর বাঙালী যুবকদের মধ্যে। ব্রাহ্মণ সমাজের কাহারও কাহারও মধ্যে শৈথিল্য প্রবেশ করিয়াছিল। পুনরায় সংস্কারের প্রয়োজন হইল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে দেবীবর মিশ্র নবগুণবিহীন কুলীনকে ৩৩টি 'মেল'-এ বিভক্ত করিলেন; এই শ্রেণীকরণ হইল কাহার কি দোষ আছে, তাহা দেখিয়া। এ ছাড়া গ্রাম্য দলাদলি, চিরন্তন হিংসাদ্বেষও অনেক ভাগাভাগির জন্য দায়ী। পূর্বে সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে বিবাহাদি চলিত। দেবীবরের সংস্কারের ফলে সেটি বন্ধ হইল এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর দেবীবর ঘটকের আদেশ বিংশশতাব্দীতে অক্ষুন্ন হইয়া বজায় আছে। এই নিষেধাজ্ঞার ফল হইল কুলীনকন্যাদের জন্য

বর পাওয়ার সমস্যা। ইহারই ফলে বহুবিবাহপ্রথা কুলীনদের মধ্যে প্রচলিত হইল।

বর্তমানে ব্রাহ্মণের সংখ্যা প্রায় সাড়ে চৌদ্দ লক্ষ। ব্রাহ্মণদের মতে বাঙলার ব্রাহ্মণেতর সকলজাতি শূদ্র। তাঁহাদের এই মত বর্তমানে সর্বত্র স্বীকৃত নহে। তবে ব্রাহ্মণসমাজের দোষগুলি সকল সমাজই অল্প-বিস্তর গ্রহণ করিয়াছে; কারণ, নিজ শ্রেষ্ঠত্ব বা আভিজাত্য প্রমাণের একমাত্র উপায় অভিজাতকে অনুকরণ করা। শূদ্রের মধ্যে তাঁহারা কয়েকটি ভাগ করিয়াছিলেন, যেমন কায়স্থ; জলচলনীয় শূদ্র, যেমন নবশাখ; তাহার পর জলঅচলনীয় শূদ্র ও সর্বনিম্নে অস্পৃশ্য শূদ্র। বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে এইপ্রকার মতবিশিষ্ট লোকের সংখ্যা ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। তবে এই অত্যন্ত আধুনিক যুগে বঙ্গীয় বর্ণাশ্রম স্বরাজ্যসঙ্ঘ পুরাতন ভেদরীতি ও নীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টান্বিত হইতেছেন এবং আরও আশ্চর্যের বিষয় ইহার নেতাদের মধ্যে অ-ব্রাহ্মণ শিক্ষিত লোক আছেন, যাঁহারা স্বেচ্ছায় নিজেদের হীনত্বকে স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া গর্ব করিতেছেন এবং এই ভেদনীতির পোষকতা করিতেছেন।

বাঙলাদেশে ব্রাহ্মণদের এই কার্যের বিরুদ্ধে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্বে কায়স্থ সমাজের কেহ কেহ প্রতিবাদ জানান ও আপনাদিগকে 'ক্ষত্রিয়' বলিয়া অভিহিত করেন। সেই হইতে বাঙলার নানা বর্ণ নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতেছেন এবং কেহই যে 'নীচ' নহে—ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য শাস্ত্র মন্থন করিতেছেন। এমনকি, গবর্মেন্ট ভোটের সুবিধা দিবার অঙ্গীকারে যাহাদের অস্পৃশ্য বলিয়া শ্রেণীত করিয়াছেন, তাহারা সরকারী রায় মানিতে রাজি নহে।

বাঙলাদেশের সকল বর্ণের মধ্যে আত্মোন্নতির চেষ্টা দেখা দিয়াছে। কায়স্থরা ক্ষত্রিয় বলিয়া উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন; বৈদ্যরা আপনাদিগকে বৈদ্য-ব্রাহ্মণ—সেন শর্মা বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। চাষী-কৈবর্তরা মাহিষ্য, নাপিতরা সাবিত্রী ব্রাহ্মণ, ধোপা সভাসুন্দর প্রভৃতি নাম লইতেছে। ১৯২১ সালের আদমসুমার গ্রহণকালে বহু বর্ণ নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া সরকারের কাছে দরখাস্ত করে; সেই দরখাস্তগুলির ওজন ছিল দেড় মণ। ভারতবর্ষময় এই আন্দোলন চলিতেছে।

বাঙলাদেশের বৈদ্য ভারতের আর কোথায়ও নাই। বর্তমানে বৈদ্যরা ব্রাহ্মণ বলিয়া দাবী করিতেছেন; কিন্তু পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো স্থানে যেমন সিলেট-কাছাড় ও মৈমনসিংহ জেলার বৈদ্যদের সহিত স্থানীয় কায়স্থদের বিবাহ হয়, বৈদ্য-ব্রাহ্মণে বিবাহ বাঙলায় হয় না। বৈদ্যরা সংখ্যায় লক্ষাধিক মাত্র; ইহাদের জাত-ব্যবসা ছিল চিকিৎসা। কিন্তু ইংরেজযুগে বিলাতি চিকিৎসাশাস্ত্র যখন জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলেই পাইতে লাগিল ও প্রাচীন চিকিৎসা প্রণালী অচল বলিয়া লোকে সাব্যস্ত করিল, তখন বৈদ্যরা ইংরেজি শিখিয়া নানা চাকুরীতে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। শিক্ষায় বৈদ্যরা অগ্রণী; ইহাদের অধিকাংশই চাকুরীজীবী।

বাঙলাদেশের যে-সব জাতির মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা অত্যন্ত তীব্রভাবে দেখা দিয়াছে—সে হইতেছে পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্ররা। ইহারা সাহসী, স্বাস্থ্যবান্ আত্মনির্ভরশীল, বুদ্ধিমান্। হিন্দুসমাজের দুর্ভাগ্য যে তাহারা এমন একটি বলিষ্ঠ জাতিকে অস্পৃশ্য কবিয়া দূরে সবাইয়া রাখিয়াছে। মধ্যযুগে ইহারাই ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, বর্তমানে ইহাবাই খ্রীষ্টীয় ধর্ম গ্রহণ করিতেছে এবং মাঝে মাঝে বর্ণ হিন্দুদেব অবিচাবে সমাজ ত্যাগ করিয়া ইস্‌লাম বা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে। এখন ইহারা প্রতিক্রিয়া-পরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে। নিজেদের ইহারা নমঃব্রাহ্মণ এমন কি, শুধু ব্রাহ্মণ বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেছে। বলা বাহুল্য, ইহা দ্বারা তাহারা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া লইতেছে। ইহাদের সংখ্যা ২১ লক্ষ। বাঙলার ধনদৌলত, বাঙলার গৌরব গঠনে ইহাদের স্থান খুবই উচ্চে।

হিন্দুসমাজের অধিকাংশ বর্ণই পেশাগত। বৈশ্য বলিতে সাধারণ লোক বুঝাইত। বাঙলায় বৈশ্য নাই, তবে নানা নামে ও পেশায় তাহারা পরিচিত; যেমন মোদক বা ময়রা, কাঁসারি, শাঁখারি, গন্ধবণিক্, সুবর্ণবণিক্, তিলি, তাঁতি, কুম্ভকার, কর্মকার, গোয়ালা ইত্যাদি। কিন্তু এইসব বর্ণের মধ্যে আবার পাঁচদশটি ভাগ আছে। খাওয়া, ছোঁয়া, বিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা ব্রাহ্মণদেরই অনুকরণে গঠিত।

পেশা বা উপজীবিকা দিয়া সকল বর্ণের নাম হয় নাই। জল অচলনীয় বহু অস্পৃশ্য জাতি প্রাচীন দ্রাবিড় বা মুণ্ডারী জাতির বংশধর। ইহাদের সংখ্যা

খুবই বেশি। ২ কোটি ২২ লক্ষ হিন্দুর মধ্যে ৮৯ লক্ষ তথাকথিত অস্পৃশ্য। ১৯৩১ সালের হিসাবে প্রত্যেক হাজার জন হিন্দুর মধ্যে ৩৭৮ জন অস্পৃশ্য; ১৯২১ সালের হিসাবে ৪৭৩ জন! বীরভূম জেলায় হাজার করা ৫৭০, খুলনায় ৬৫৪, চট্টগ্রাম পার্বত্যপ্রদেশে ৮৮৫ জন অস্পৃশ্য! এছাড়া আদিমরা অস্পৃশ্য, মুসলমানরা অস্পৃশ্য!

প্রত্যেক বর্ণের মধ্যে কোনো অনিয়ম বা অন্যায় হইলে সেই বর্ণের পাঁচজনে মিলিয়া তাহার ব্যবস্থা করে; সামাজিক শাস্তি নানারূপ; একঘরে করা, ধোপা-নাপিত বন্ধ করা, ঘাটে জল সরিতে না দেওয়া ইত্যাদি। এককালে এইসব শাসনের ফলে লোকে সহসা কোনো পাপ প্রকাশ্যে করিতে সাহস পাইত না। এখন সমাজের সে জোর নাই। তবে নিম্ন-শ্রেণীর মধ্যে ইহার শাসন এখনো প্রবল।

হিন্দুসমাজ এককালে আর্থিক বা অন্ন-সমস্যার সমাধান করিয়াছিল বর্ণভেদের দ্বারা; প্রাচীন নীতি অনুসারে নিজ পেশা বা বৃত্তি ত্যাগ করিয়া অন্যের বৃত্তি গ্রহণ অধর্ম বা অকর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। সেইরূপ করিলে তাহাকে সমাজ শাস্তি দিত; সেই শাস্তির নাম প্রায়শ্চিত্ত। বর্তমানে নানা কারণে সমাজের শাসন আর কার্যকরী নয়, পেশা বা বৃত্তি সম্বন্ধে কোনো নিয়ম-নিষেধ নাই।

বর্তমান বাঙলাদেশ যেভাবে গঠিত, তাহাতে এ প্রদেশে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। মুসলমান ধর্ম আরব হইতে আসিয়াছে; উহা সেমেটিক জাতির মধ্যে প্রথম উদিত হয়; তারপর মুসলমান তুর্কীদের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্ম বাঙলাদেশে প্রবেশ করে। গত সাত শত বৎসরের মধ্যে বাঙলার অর্দ্ধেকের উপর লোক ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে; এখনো গ্রহণ করিতেছে। কারণ, মুসলমান ধর্মনীতি সহজেই মানুষকে গ্রহণ করে হিন্দুধর্ম গ্রহণ হইতে বর্জনই করিতে বেশি তৎপর। ফলে হিন্দুসমাজের অস্পৃশ্য জনসঙ্ঘের কেহ কেহ ইস্‌লামের আহ্বানে সাড়া দিয়াছিল এছাড়া যে-সব তুর্কী, পাঠান, মুঘল, পারসী যোদ্ধা, ওমরাহ, জমিদার ব্যবসায়ী, মোল্লা, মৌলভী আসিয়াছিলেন তাঁহাদের বংশধরের বিবাহাদি করিয়া বহু বিস্তৃত হইয়াছেন। লোভে, ভয়ে, জবরদস্তিতে

যে কেহ কেহ স্বধর্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাও ঐতিহাসিক সত্য। তবে নিম্নশ্রেণীর অধিকাংশ লোক ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করে নানা সামাজিক সুবিধার জন্য; মুসলমান হওয়া মাত্র দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান তাহার আত্মীয় হইল; ধোপা, নাপিত সকলেই তাহাকে সেবা করিল। উন্নতির পথে তাহার জন্মগত বর্ণদোষ আর বাধাস্বরূপ থাকিল না।

হিন্দু-মুসলমান বহুকাল গ্রামের মধ্যে পাশাপাশি বাস করায় পরস্পরের অনেক ধর্মনীতি, আচার-ব্যবহার, আদব-কায়দা পরস্পর গ্রহণ করিয়াছে। শুভদিন দেখিয়া বিবাহ দেওয়া, অদিনে বাঁশ না কাটা, স্বামীর নাম না করা, কপালে সিঁদূর দেওয়া, জামাইষষ্ঠী, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, নবান্ন প্রভৃতি বিচিত্র লোকাচার মুসলমানদের মধ্যে দেখা যায়; মুসলমানী পঞ্জিকাও আছে। হিন্দুদের মধ্যে সত্যপীরের দরজায় ছিন্নি দেওয়া, মহরমের সময় লাঠিখেলা প্রভৃতির রেওয়াজ এখনও আছে। বর্তমানে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্বের সদ্ভাব লোপ পাইতেছে এবং উভয় ধর্মই অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক হইয়া উঠিতেছে।

বাঙলার জন-সংখ্যার মধ্যে মুসলমানরাই প্রধান; সেইজন্য রাজনীতি ক্ষেত্রে তাহাদের প্রচুর অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু জন-সংখ্যা ছাড়া আর কোনো বিষয়ে ইহারা হিন্দুদের সমকক্ষ এখনো হইতে পারে নাই। তবে তাহাদের মধ্যে আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ কবিবার জন্য আন্দোলন চলিতেছে এবং ভরসা হয়, তাহারা কয়েক বৎসরের মধ্যে হিন্দুদের সমকক্ষ হইবে।

বাঙলার জন-সংখ্যার অনুপাত *

	মোট জন-সংখ্যা	জোয়ান জন-সংখ্যা
মুসলমান	৫৪.৮	৫১.৩
হিন্দু	৪৩.১	৪৬.৬
খ্রীষ্টান	০.৪	০.৪
অন্যান্য	১.৭	১.৭

(B. N. Dutta Roy, Sir N. N. Sircar's Speeches and Pamphlets, 1934, pp. 17-25

শিক্ষায় হিন্দু-মুসলমানের অনুপাত

	শিক্ষিত	ইংরেজী জানা	হাইস্কুলে	ইন্টার কলেজে	ডিগ্রিক্লাসে	পোষ্ট গ্রাজুয়েটে
মুসলমান	৩৩·৫	২৪·৯	১৭·৯	১৩·৬	১৪·২	১৩
হিন্দু	৬৪·২	৬৯·৬	৭৯·৬	৮৩·৬	৮২ ৮	৮৫·৭
খ্রীষ্টান	১·৫	৪·৯	১·৮	২·২	২·২	১·২
অন্যান্য	০·৮	০·৬	০·৭	০·৬	০·৮	০·১

	মেডিকেল স্কুল	টেক্নিক্যাল ও শিল্প	ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল	কমার্স স্কুল	ব্যাঙ্ক, বীমাদিতে নিযুক্ত	মেডিকেল পেশা
মুসলমান	১২ ১	১৯·৯	১৩	৭·৮	১৪·৯	১৭·
হিন্দু	৮৬·২	৬১·৩	৮৫·৫	৮৬·০	৮৩·০	৭৯ ৭
খ্রীষ্টান	০·৮	১৫·৭	০·৬	৬·০	২·১ (খ্রীষ্টান ও অন্যান্য)	২·৪ (খ্রীষ্টান ও অন্যান্য)
অন্যান্য	০·৯	৩·১	০·৯	০·২		

	আইন-ব্যবসা	কৃষিকর্মে লিপ্ত	ভিক্ষুক	জেলবাসী
মুসলমান	১১·৬	৬২·৭	৫২ ৭	৫৩·১
হিন্দু	৮৭·৬	৩৪·৭	৪৬·৭	৪২·৭
খ্রীষ্টান	০·৮ (খ্রীষ্টান ও অন্যান্য)	২·৬ (খ্রীষ্টান ও অন্যান্য)	০·৬ (খ্রীষ্টান ও অন্যান্য)	০·৪
অন্যান্য				৩ ৮

বাঙলার বর্ণ

আগুরি (উগ্রক্ষত্রিয়)। বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও হাওড়া জেলায় অধিক সংখ্যক বাস করে। মুঘল যুগ হইতে ইহারা বাঙলাদেশে শক্তিশালী বর্ণ বলিয়া পরিচিত। 'জন' ও 'সুত' দুইটি ভাগে বিভক্ত ; জন-আগুরিরা বার দিন অশৌচ ধারণ করে, উপবীত লয়। 'সুত'রা সাধারণ শূদ্রের ন্যায় একমাস অশৌচ পালন করে। বহুকাল হইতে ইহারা উগ্রক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত

হইতেছে। সেন্সাস্ অনুসারে জন-সংখ্যা ১৯০১ সালে ৭৯,৬৭৫; ১৯১১ সালে ৭৯,২৭২; ১৯২১ সালে ৬৮,৮১৬।

আদি কৈবর্ত (জালিয়া কৈবর্ত)। মেদিনীপুর জেলায় এই জাতির প্রধান বাস হইলেও দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের প্রায় জেলাতেই ও বিশেষভাবে মৈমনসিংহে ইহারা বাস করে। ইহাদের অনেকে 'মাহিষ্য' বলিয়া পরিচয় দিতেছে। ১৯৩১ সালে জন-সংখ্যা ছিল ৩,৫২,০৭২।

আগরবালা। ইহারা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে আসিয়া বাঙলায় বাস করিতেছে; বোধ হয় আগ্রা-বালা হইতে শব্দটি হইয়াছে। কলিকাতা, মালদহ, জলপাইগুড়ি, রাজসাহীতে অধিকাংশ বাস করে; জন-সংখ্যা ১৯,৩৪৭। ইহাদের মধ্যে জৈন ও হিন্দু আছে।

বাগ্‌দী। বর্দ্ধমান বিভাগের আদি বাসিন্দা। আটনয়টি উপজাতিতে বিভক্ত; লোহার বাগ্‌দী, লেট্ বাগ্‌দী, মাল বাগ্‌দী, তেঁতুলে, ক্ষেত্রি, কুস্‌মেতা, নোদা প্রভৃতি।

১৯০১ ...	১০,৩২,০০০	১৯১১ ...	১০,১৬,০০০
১৯২১ ...	৮,৯৫,৩৯৭	১৯৩১ ...	৯,৮৭,৫৭০

বৈদ্য। বাঙলার চিকিৎসা ব্যবসায়ী। ইহাদের একশ্রেণী বৈদ্য-ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। জন-সংখ্যা—

১৯০১ ...	৮১,২১৮	১৯১১ ...	৮৮,৭৯৬
১৯২১ ...	১,০২,৯৩১	১৯৩১ ...	১,১০,৭৩৯

বৈষ্ণব ('বোষ্টম')। হিন্দুসমাজের যে-কোনো বর্ণ হইতে নর-নারী বৈষ্ণব হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে জাতিভেদ নাই। 'বোষ্টম' ও বৈষ্ণব পৃথক্‌ভাবে সমাজে পরিচিত।

১৯০১ ...	৪,০০,০০০	১৯১১ ...	৪,২৩,৯৮৫
১৯২১ ...	৩,৭৮,১০৭	১৯৩১ ...	৩,৩৭,৭৭১

বারুই। ইহারা এখন বারুজীবি বলিয়া লিখিত হয়। ইহাদের জাতি-ব্যবসা পানের চাষ। ১৯০১ সালে বিহার ও বঙ্গে ইহাদের সংখ্যা ছিল ২·৯৩ লক্ষ। ১৯২১ সালে ১·৮৫ লক্ষ; ১৯৩১ সালে ১·৯৫ লক্ষ।

বাউরি। পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় দেশে ও মানভূমে বাস করে। ১৯২১ সালে

৩'০৩ লক্ষ, ১৯৩১ সালে ৩'৩১ লক্ষ জন-সংখ্যা। বর্দ্ধমান জেলাতে এক-তৃতীয়াংশ বাস করে।

বেদিয়া। মুণ্ডারী জাতির যাযাবর ধরণের জাত। বগুড়া, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ির দিকে বেশি আছে। ইহাদের সংখ্যা ৭,২৬৩।

বেলদার। তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ; মালদহ ও দিনাজপুরে বাস করে।

বড়ুয়া। চট্টগ্রাম বিভাগে আছে ; অধিকাংশ বৌদ্ধ। সংখ্যা ৩,১৩৫ মাত্র।

ভুঁইমালি। হিন্দুসমাজে অতি নিম্নস্থান অধিকার করে। বর্তমানে তাহারা বৈশ্যমালি বলিয়া পরিচয় দেয়। সংখ্যা ৭২,৮০৪।

ভুঁইয়া। পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষভাবে বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরে বাসস্থান। ১৯২১ সালে ৫৯ হাজার ছিল, ১৯৩১ সালে ৪৯ হাজার।

ভূমিজ। প্রধানত মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ায় বাস। সংখ্যা ৮৫,১৬১।

বিন্দ। মালদহ জেলায় প্রধানত থাকে ; বিহার হইতে মাটিকাটা কাজের জন্য আসিয়া বাস করিতেছে। জন-সংখ্যা ১৯,৫১৮।

ব্রাহ্মণ। ১৯২১ সালে ব্রাহ্মণের সংখ্যা ছিল ১৩,০৯,০০০ ; ১৯৩১ সালে হয় ১৪,৪৭,০০০ ; অর্থাৎ দশবৎসরে ১০'৬% হারে বৃদ্ধি হয়। সমগ্র হিন্দু জন-সংখ্যার ৬'৫ ভাগ ব্রাহ্মণ।

চাক্‌মা। চট্টগ্রাম পার্বত্যপ্রদেশের অধিবাসী ; এক্ষণে বাঙালী ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে। জন-সংখ্যা ১,৩৫,৫০০।

ধোপা। বাঙলার সকল জেলাতেই আছে ; তবে মেদিনীপুরে অনেক বাস করে। বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা, নোয়াখালিতে বিশ হাজারের উপর করিয়া বাস করে। জন-সংখ্যা ২,২৯,৬৭২।

ডোম। বর্দ্ধমান বিভাগে প্রধানত বাস করে। এই বিভাগের ডোমরা অন্য জেলার ডোমদের হইতে অনেক তফাৎ। সংখ্যা ১,৪০,০০০।

দোসাদ। আদিবাস বিহার ও ছোটনাগপুরে। বাঙলাদেশে ৩৬ হাজার দোসাদ বাস করে। সহিস ও অন্যান্য কাজ করে।

গড়েরি। বিহার অঞ্চল হইতে আসিয়া বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদে বাস করিতেছে। ভেড়া চরানো, কম্বল বানানো ইহাদের পেশা।

গারো, হদি, হজং। হদিরা হৈহয় ক্ষত্রিয় বলিয়া আপনাদিগকে পরিচিত

করিতেছে। গারো, দলু, কোচ, হদি, হজঙ, রভস্, মেখ্, রাজবংশীরা কাছাকাছি উপজাতি। হদিরা আত্মোন্নতির চেষ্টা করিতেছে; উপবীত ধারণ করিয়া তাহারা ভদ্রজাতে উঠিবার জন্য ব্যস্ত। গারোরা হদিদের নিকটতম আত্মীয় হইলেও আদিমত্ব রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। মৈমনসিংহে গারোর সংখ্যা ৩৯ হাজার; হদির সংখ্যা ১৯ হাজার; হজঙের সংখ্যাও ১৯ হাজারের উপর।

গোয়ালা। গোয়ালারা যাদব বলিয়া পরিচিত হইতেছে। পশ্চিম ও মধ্য বাঙলায় ইহারা প্রবল হইলেও ঢাকা, মৈমনসিংহে অনেক গোয়ালা আছে। ১৯৩১ সালে সংখ্যা ছিল ৫,৯৯,০০০।

হাড়ি। পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরে দিনাজপুরে বেশি আছে। সংখ্যা ১,৩২,৪০১। গত কয়েক সেন্সাসে ইহাদের সংখ্যা ক্রমশই হ্রাস পাইতেছে দেখা যায়।

ঝালো, মালো। ইহারা ঝল্ল মল্ল ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেছে। তাহারা বলে যে, তাহারা রাজপুতানার ঝালবার ও মল্লগড় হইতে আসিয়াছিল। সংখ্যা ১,৯৮,০০০। মৈমনসিংহ, পাবনা, ঢাকা, যশোহরে ইহাদের সংখ্যা বেশি।

জোগি বা জুগি। পূর্ববঙ্গ ও বিশেষভাবে ত্রিপুরা, নোয়াখালি, মৈমনসিংহে ইহাদের বাস। জন-সংখ্যা ৩,৮৪,৬০০। পূর্বে ইহারা 'নাথ' সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, এখন হিন্দু। গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস, ময়নামতীর গান প্রভৃতি গাথা এই সম্প্রদায়ের।

কলু, তেলি, তিলি। এই তিনটি বর্ণের মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। পেশাগত ভেদ হইতে এই জাতগুলির উদ্ভব। ইহাদের সংখ্যা ৫,০৩,১০০। তেল তৈরী, তেল বিক্রী ও পানের ব্যবসা প্রধান পেশা।

কামার ও কর্মকার। বাঙলাদেশে বাঙালী কামার, পশ্চিমা লোহার ও পশ্চিমবঙ্গে লোহার—এই তিনশ্রেণী আছে। বাঙালী লোহার নবশাখের অন্তর্গত। বাঙালী লোহাররা বাগ্দী, বোধ হয় লোহার খনি ও শালে কাজ করিত। বাঙলায় কর্মকারদের দুটি সভা আছে। বঙ্গীয় ক্ষত্রিয় কর্মকার সভা ও বঙ্গীয় কর্মকার সম্মিলনী। বাঙালী কামারের সংখ্যা ২,৫৬,৮৮০; সকল শ্রেণীর কামার ৩,১৫,৭১০।

কাঁদরা। মেদিনীপুরেই বাস। মাছধরা ও বিক্রী, বিবাহের সময় বাতি ধরা, নাচ (পাইকান নাচ) ব্যবসা। বিধবা-বিবাহ, সাঙা প্রভৃতি আছে; মৃতদেহ দাহ করে ও কবর দেয়। নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য করেন।

কেওড়া। ২৪-পরগণা, হাওড়া ও হুগলিতে প্রধানত বাস করে। জন-সংখ্যা ১,০৭,৯০০।

কাপালি। ২৪-পরগণা, খুলনা, যশোহর ও পূর্ববঙ্গের কোথাও কোথাও বাস করে। পাটের চট বোনা ব্যবসা ছিল। ইহারা বৈশ্য বলিয়া দাবী করিতেছে। জন-সংখ্যা ১,৬৫,৫০০।

কায়স্থ। ইহারা এখন ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবী করেন। ১৯৩১ সালে জন-সংখ্যা ১৫,৫৮,৪০০। ১৯২১ সাল হইতে ২০% বাড়িয়াছে। বৃদ্ধির কারণ 'ভারতপরিচয়ে' দিয়াছি।

কোচ, পলিয়া, রাজবংশী। উৎপত্তি একই মনে হয়। তবে বর্তমানে রাজবংশীরা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয় এবং কোচ-পলিয়াকে কিছুতেই সে-অধিকার দিতে রাজি নহে। ১৯১১ সালে এই তিনটি জাতির সংখ্যা ছিল ১৯,৩৩,৮০০। বর্তমানে ১৯,৩০,০০০। কোচরা মৈমনসিংহ ও বগুড়ায় বেশি।

কোড়া। বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুরে বাস করে ও মাটি কাটা পেশা। ইহাদের ভাষা সাঁওতালির অপভ্রংশ। জন-সংখ্যা ৪৯ হাজার। অধিকাংশই হিন্দু তবে আদিমও আছে।

কুকি। পার্বত্য জাতি। ত্রিপুরা জেলা ও চট্টগ্রাম পার্বত্য প্রদেশে ১৬ হাজার কুকি বাস করে। ত্রিপুরারাজ্যে অধিকাংশ বাস করে।

কুম্ভকার বা কুমার। বাসনপাত্র করা ব্যবসা। জন-সংখ্যা ২,৮৯,৮০০।

কুর্মি। পশ্চিমবঙ্গ ও মেদিনীপুরে সংখ্যাধিক্য, রাজসাহীতেও বাস করে। জন-সংখ্যা ১,৯৪,০০০০।

লোধ। জন-সংখ্যা ১১ হাজার; ইহার মধ্যে মেদিনীপুরেই ৯,৮০০ বাস করে।

মঘ। চট্টগ্রামের বাসিন্দা; ইহারা বাঙলা ভাষাভাষী এবং মগধের বৌদ্ধ-ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবী করিতেছে।

মাহিষ্য। বাঙলাদেশে সংখ্যায় ইহারা প্রবলতম জাতি। ইহাদের সংখ্যা ২৩,৮১,০০০। মেদিনীপুর ও ২৪-পরগণায় ইহারা প্রবল; তবে সব জেলাতেই বাস করে। পূর্বে ইহারা কৈবর্ত নামে পরিচিত ছিল।

মহ্‌লি। ইহারা আদিম জাতি; ক্রমশ হিন্দু ও বাঙালী হইতেছে। জলপাইগুড়ি, মেদিনীপুর, দিনাজপুরেই ৭০ ভাগ বাস করে। জন-সংখ্যা ১৬ হাজার।

মাল। ইহাদের একশাখা পট আঁকে, গরুর চিকিৎসা করে। দরিদ্ররা টিকে তৈরী করে। ১৯৩১ সালে সংখ্যা ১,১১,৪২২; ১৯২১ হইতে ৫·২% কম। এই জাতি পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান হইয়া যাইতেছে। হিন্দুসমাজে তাহাদের স্থান অতি নীচু।

মালি। ফুলের কাজ ব্যবসা। জন-সংখ্যা ৭৯ হাজার; ১৯২১ হইতে ২৩ হাজার বেশি। ইহার কারণ অনেক ভুঁইমালি মালি বলিয়া পরিচয় দিয়াছে।

মাল্লা। নৌকার কাজ জাত ব্যবসা। মৈমনসিংহে সংখ্যা বেশি। জন-সংখ্যা ২৬,২০০০।

মাল পাহাড়িয়া। দুমকায় আদিনিবাস। বর্তমানে রাজসাহী, জলপাই-গুড়ি, দিনাজপুরে ৮৪% ভাগ বাস করে; কুলি হইয়া গিয়া বাস করে। অধিকাংশই হিন্দু।

মেথর। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা ব্যবসা। সমগ্র দেশে ২২,২৮১ জন মেথর আছে। কলিকাতায় ৭,৩০০, ২৪-পরগণায় ২,২০০ বাস করে। এ ছাড়া প্রত্যেক শহরে নগরে বাস করে। ইহাদের ভাষা হিন্দী; তবে অনেক জায়গায় বাঙলা হইয়া যাইতেছে। কলিকাতার নিকট কোনো কোনো স্থানে মেথরের কাজ মেদিনীপুরের হাড়িরা করে।

মুচি। চামড়ার কাজ ব্যবসা। সংখ্যা ৪,১৪,২২০। বেশি মুচির বাস বর্দ্ধমান (৬৩ হাজার), বীরভূম (৪৩), যশোহর (৩৭), ২৪-পরগণা (৩৩), নদীয়া (৩০), মৈমনসিংহ (২৪), ঢাকা (২৩), মুর্শিদাবাদ (২২), খুলনায় (২১)। উত্তরবঙ্গে অপেক্ষাকৃত কম। ইহাদের অধিকাংশই দিনমজুর।

মুণ্ডা। সংখ্যা ১,০৮,৬০০; ইহার মধ্যে ৬৩ হাজার হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়াছে। জলপাইগুড়িতে একতৃতীয়াংশ বাস করে।

মুসাহার। পাল্কী-বেহারা ও মজুর। মালদহ, দিনাজপুর ও রঙ্গপুরে বেশি বাস করে। জন-সংখ্যা ১১,৭৮৪।

নাগর। চাষী। ১৬,১৬৪ জন মাত্র। ইহার মধ্যে মালদহে বাস করে ১৪,৩০০।

নমশূদ্র। ঢাকা ও প্রেসিডেন্সী বিভাগে প্রবল। জন-সংখ্যা ২০,৯১,০০০।

নাপিত। ক্ষৌরকার্য করা ব্যবসা; জন-সংখ্যা ৪,৫১,০০০। বাঙলার সর্বত্র বাস করে। গ্রাম অঞ্চলে বাঙালী নাপিত হ্রাস পাইতেছে; শহরে পশ্চিমা নাপিত আসিতেছে। নাপিত অন্য পেশা লইতেছে।

নট। নিম্ন শ্রেণী; সংখ্যা ৭,৩৮৪ মাত্র। বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা, নোয়াখালি জেলায় দেখা যায়।

ওরাঁও। আদিম বাস ছোটনাগপুরে। বর্তমানে ২,২৮,১০০ বাঙলায় বাস করে। অধিকাংশ বাস করে জলপাইগুড়িতে (১,২৭ হাজার)। উত্তরবঙ্গেই অবশিষ্টরা থাকে। ইহাদের মধ্যে ৬৪ হাজার হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়াছে।

পাশি। ইহাদের পেশা মদের জন্য তাল ও খেজুর গাছ কাটা। সংখ্যা প্রায় ১৯ হাজার। ২৪-পরগণায় সাড়ে ছয় হাজার বাস করে; ইহারা হিন্দীভাষী।

পাটনী। নৌকার কাজ জাত ব্যবসা। ইহাদের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। সংখ্যা ৪০,৭৬৬।

পোদ। ইহারা পৌণ্ড ক্ষত্রিয় পদবী লইতেছে: সংখ্যা ৬,৬৭,৭০০। ২৪-পরগণায় প্রায় ৪ লক্ষ বাস করে, খুলনায় ১,৮২,০০০।

রাজপুত। সংখ্যা ১,৫৭,০০০।

রাজু। মেদিনীপুরে প্রবল। সংখ্যা ৫৬ হাজার।

রাজবার। ছোটনাগপুর, বিহার ও পশ্চিম বাঙলায় বাস। সংখ্যা ২১,৩০০।

সদ্‌গোপ। বাঙলার সর্বত্র থাকিলেও পশ্চিম বাঙালায় ইহারা প্রবল,—প্রায় তিনভাগের দুইভাগ বাস করে। সংখ্যা ৫,৭১,৭০০।

সাঁওতাল। ছোটনাগপুরের আদিম বাসিন্দা। বাঙলায় ৭,৯৬,৬০০ বাস করিতেছে; দশ বৎসরে ১১·৯% হারে বাড়িয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৪,৩৩ হাজার হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়াছে।

সাহা। পূর্বে সাহা ও শুঁড়ি একত্র লেখা হইত; এখন সাহারা পৃথক্ হইয়াছে। ১৯২১ সালে সাহাদের সংখ্যা ছিল ৩,৬০,০০০, ১৯৩১ সালে ৪,২৯,০০০; শুঁড়ির সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে ৯২ হাজার হইতে ৭৭ হাজার। পূর্ববঙ্গের সাহারা বিত্তায়, বুদ্ধিতে, ধনে বিখ্যাত। পশ্চিম বঙ্গের শুঁড়িরা প্রবল।

সূত্রধর বা ছুতোর। কাঠের কাজ জাত ব্যবসা। ইহাদের কেহ কেহ বিশ্বকর্মা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে চাহে।

তাঁতি। জন-সংখ্যা ৩,৩০,৫০০। সংখ্যা ক্ষয়িষ্ণু। পশ্চিমবঙ্গে, কলিকাতা ও ২৪-পরগণায় ইহারা প্রবল।

টিপ্‌রা। ত্রিপুরার বাসিন্দা; চট্টগ্রামেও আছে। সংখ্যা ২,০৩,০০০।

তিয়র। জন-সংখ্যা ক্ষয়িষ্ণু। ১৯১১ সালে ২,১৫,০০০, ১৯২১ সালে ১,৭৫,০০০, ১৯৩১ সালে ৯৬,৪০০। অনুমান করা হয়, ইহারা অন্য জাতের মধ্যে নাম দিতেছে।

তুরি। ছোটনাগপুরের আদিম। দিনাজপুর, মালদহ, জলপাইগুড়িতে ১৭,৫০০ বাস করে। চুবড়ী, পেতে তৈরী করে।

জয়েণ্ট কমিটি রিপোর্টে বাঙলাদেশের যে-সব অন্ত্যজ জাতির নাম আছে, তাহার তালিকা। (দ্রষ্টব্য vol. I, p. 377)

আগরিয়া	ঝালোমালো	মল পহাড়ি
	কদর	মেখ
বহেলিয়া	খয়রা	মেথর
বাউরি	কলয়ার	মুচি
বেদিয়া	কান	মুণ্ডা
বেলদার	কন্দ	মুসাহার
বেরুয়া	কাঁদরা	নাগর
ভাটিয়া	কেওড়া	নগেসিয়া
ভুঁইমালি	কাপালি	নৈয়া
	কাপুরিয়া	নমঃশূদ্র
ভুমিজ	কারঙ্গা	নাথ

ভিন্দ
বিন্‌জিয়া
চামার
ধেনুয়ার
ধোপা
দাই
ডোম
দোসাদ
গারো
ঘাসি
গোন্‌রি
হদি
হজঙ
হালালখোর
হাড়ি
হো
জালিয়া কৈবর্ত

কষ্ট
কাউর
খণ্ডায়েৎ
খটিক
কিচক
কোচ
কোনাই
কোনয়ার
কোড়া
কোটাল
লালবেগি
লোধ
লোহাব
মহর
মহ্‌লি
মাল
মাল্লা

মুনিয়া
ওরাঁও
পলিয়া
পান
পাশি
পাটনি
পোদ
পুণ্ড্রি
রভ
রাজবংশী
রাজু
রাজবার
সাঁওতাল
সাগরদিপেশা
স্নক্রি
শুঁড়ি
তিয়র
তুরি

ইহাদের মধ্য হইতে ৩০ জন সদস্য বাঙলার ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত হইবে। বলা বাহুল্য, অন্ত্যজ বলিলে একটি জাতি বুঝায় না। পরস্পরের মধ্যে উপর-নীচ বোধ, ঘৃণা, অবজ্ঞা বর্ণহিন্দুদের ন্যায়ই তীব্র।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বাঙলার ইতিহাস

প্রাচীনকালে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ছিল 'আর্য' বা ভদ্রলোকের বাসের অনুপযোগী, এই অনার্য ভূমিতে আসিলে সদাচারী ব্রাহ্মণদের পতন হইত; শাস্ত্রে তাঁহাদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত বিধি ছিল। আর্যাবর্তের নিষ্ঠাবান্ লোকেরা বহুকাল এদেশে আসেন নাই। দুই একটি আর্য উপনিবেশ উত্তর-বিহারে স্থাপিত হইয়াছিল, যেমন ক্ষত্রিয় মিথি মিথিলা স্থাপন করেন। অবশিষ্ট দেশ অনার্যভূমি ছিল। রামায়ণে তাড়কা-বধের গল্পের মধ্যে আমরা এই অনার্য ভূমি অধিকারের ইতিহাস পাই। ক্রমশ ক্ষত্রিয়েরা এদেশে আসিতে লাগিলেন, স্থানীয় স্ত্রীলোকদিগকে বিবাহাদি করিলেন, এবং দেখিতে দেখিতে আর্য-ভাষাভাষী এক শ্রেণীর অর্দ্ধক্ষত্রিয় পূর্ব ভারতে দেখা দিল। নিষ্ঠাবান্ বর্ণক্ষত্রিয়রা এই বর্ণশঙ্কর জাতিকে ঘৃণা করিতেন; যেমন চিরদিন বর্ণশঙ্কর জাতিকে উচ্চবর্ণের লোকেরা করিয়া থাকেন।

আর্যবীর রামচন্দ্র পাষাণী অহল্যা অর্থাৎ যে-জমিতে হাল চাষ হয় নাই (অ-হল্যা) সেই জমিতে কৃষি বিস্তার করেন। রোমানরা যেমন অধিকৃত দেশে চাষ-বাস সুরু করিত, এও সেই রকমের অধিকার ও জয়।

মহাভারতে দেখিতে পাই মগধের রাজা জরাসন্ধ এই বর্ণশঙ্কর ক্ষত্রিয়দের নেতা হইয়া বর্ণক্ষত্রিয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করিতেছেন। পূর্ব ভারতবর্ষ হইতেছে এই শঙ্কর ক্ষত্রিয়ের বাসভূমি। উত্তরবঙ্গের দৈত্যপতি বাণ, পুণ্ড্রক, প্রাগ্জ্যোতিষপুরের নরক সকলেই আর্যদের গতিরোধের জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করেন। মগধের শিশুনাগ বংশ, নন্দবংশ, মৌর্য বংশ—কেহই সৎ ক্ষত্রিয় নহেন; দেব-দ্বিজে ভক্তিমান্ ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের খ্যাতি ছিল না। অপর দিকে বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে বুদ্ধ ও মহাবীরকে দাঁড়াইতে দেখি; তাঁহারাও সৎক্ষত্রিয় নহেন। বেশ দেখা যায়, পূর্ব ভারতের চিন্তাধারায় ও কর্মচেষ্টায় একটা বৈশিষ্ট্য ছিল—এবং সে-বৈশিষ্ট্য আজও নষ্ট হয় নাই। এই বৈশিষ্ট্য আর্য ও

দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণের ফলে; আর্যদের জ্ঞাননিষ্ঠা ও দ্রাবিড়দের ভক্তি, প্রেম, ভাবোচ্ছ্বাস মিলিত হইয়াছে বাঙালীর জীবনে। সেইজন্য বাঙলার মধ্যে একদিকে পাই নৈয়ায়িকদের কুটিল ন্যায়, অপর দিকে পাই বৈষ্ণবের রসধারা; এছাড়া তৃতীয় স্তরও একটি ছিল; সেটি হইতেছে মুণ্ডারীধারা, যাহাদের বিশেষত্ব ছিল শক্তিপূজা, কালীপূজা।

বাঙলাদেশের সভ্যতার ভারকেন্দ্র ভৌগোলিক পরিস্থিতির সহিত পরিবর্তিত হইয়াছে। সেকন্দরের ভারত আক্রমণের সময় পূর্ব ভারতে প্রাচ্য ও গঙ্গারাঢ় নামে দুটি পরাক্রমশালী রাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাই, এই গঙ্গারাঢ় হইতেছে বর্তমান রাঢ়মণ্ডল। বঙ্গ বলিতে বুঝাইত পূর্ববঙ্গ; উত্তরবঙ্গের নাম ছিল পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, বরেন্দ্র নাম ভৌগোলিক নাম; সমতট দক্ষিণবঙ্গের নাম; রাঢ় পশ্চিমবঙ্গ। অবশ্য ঐতিহাসিক যুগেও যেমন বহু প্রদেশেরই সীমানা ও নাম পরিবর্তিত হইয়াছে, প্রাচীন যুগেও একই নাম বরাবর ছিল না। যতদূর মনে হয়, খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দী হইতেই বাঙলার অনেক স্থানেই ছোটখাটো রাজা রাজত্ব করিতেন। ব্যবসা-বাণিজ্য সমুদ্রপথে চলিতে সুরু হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম এই অনার্য দেশকে দীক্ষিত করিয়াছিল,

তাম্রলিপ্তি প্রথম শতাব্দী এমন'কি অশোকের সময়েও পূর্ব ভারতের বন্দররূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। তাম্রলিপ্তি নাম সম্বন্ধে এখনো কোনো স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই; তবে আমাদের সন্দেহ হয় 'তাম্রের' সহিত এখানকার কোনো সম্বন্ধ ছিল। বাঙলাদেশের পশ্চিমে রাকা মাইনস্ বা খনিতে কয়েক বৎসর পূর্বে তাম্রচুর উত্তোলন করা হইত; শোনা যায় এখানে য়ুরোপীয় কোম্পানী কাজ করিবার পূর্বে অতিপ্রাচীনকালে বহুদূর পর্যন্ত মাটি খুঁড়িয়া লোকে তামা তুলিয়াছিল। সম্ভবত এই বন্দর হইতে তাম্র রপ্তানী হইত এবং বাঙলার সর্বত্র চালান যাইত।

বাঙলার বন্দর দিয়া আসিত বাঙলার মুদ্রার প্রতীক 'কড়ি', যেমন আজ কাল আসে রৌপ্য; কড়ি সমুদ্রে পাওয়া যায়। এ ছাড়া উত্তর ভারতের রাজাদের বিলাসের সামগ্রী যেমন গরম মশলা, চন্দন, কর্পূর প্রভৃতি সমুদ্র-পথে আসিত। সেইজন্য অতি প্রাচীনকালেই বাঙলার বৈশিষ্ট্য গ্রীক্ ভৌগোলিক টলেমির কাছে ধরা পড়িয়াছিল।

তাম্রলিপ্তি* পরবর্তীযুগে বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও বাণিজ্যের বিরাট কেন্দ্র হয়। ফা-হিয়ান (৪১০ খ্রীষ্টাব্দ) এখানে কিছুকাল বাস করেন ও এখানেই জাহাজে চড়িয়া সিংহলে যান। বিজয়সিংহও বোধহয় এই পথ দিয়া সিংহলে যান।

উত্তরবঙ্গের এ সময়ের আর কোনো রাজার ইতিহাস পাওয়া যায় না; তবে কামরূপ ছিল প্রবল পরাক্রমশালী স্বাধীন দেশ এবং বোধহয় আসামের কিয়দংশ ও উত্তরবঙ্গের কিয়দংশ কামরূপ রাজ্যভুক্ত ছিল। বৌদ্ধপ্রভাব কামরূপে কখনো প্রবল হয় নাই; এবং রাজারা দেব-দ্বিজে ভক্তিমান্ ছিলেন।

বাঙলাদেশে প্রথম বড় রাজা হন শশাঙ্ক নরেন্দ্রাদিত্য; ইঁহার রাজধানী ছিল রাঢ়দেশে গঙ্গার পশ্চিমতীরে কর্ণসুবর্ণে; পণ্ডিতরা অনুমান করেন ইনি প্রাচীন গুপ্তরাজবংশের লোক। সে-সময়ে মালবেও এক গুপ্ত পরিবার রাজত্ব করিত। এই দুই গুপ্ত পরিবার মিলিত হইয়া, উত্তর ভারতের প্রবল নরপতি মৌখার-রাজকে পরাজিত ও নিহত করেন। রাজ্যশ্রীর গল্প সুপরিচিত। কর্ণসুবর্ণের শ্রেষ্ঠীরা সিংহলের সহিত বাণিজ্য করিয়া ধনী হইয়াছিল। শশাঙ্ক যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন উত্তর ভারতেশ্বর হর্ষবর্দ্ধন বঙ্গদেশ জয় করিতে পারেন নাই।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হুয়েন-ৎসাঙ (৬৩০-৬৪৪) বঙ্গদেশে আসেন ও কর্ণসুবর্ণের বৌদ্ধবিহার ও হিন্দুদেবমন্দিরাদি দেখেন। সপ্তম শতাব্দীর বহু পূর্ব হইতে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া আসিতেছিল—ইহা চীন পরিব্রাজকের ভ্রমণকাহিনী পাঠ করিলেই বুঝা যায়। কিছুকাল হইতে উত্তর ভারতে ও বাঙলার নানাস্থানে রাজারা ব্রহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টান্বিত হইতেছিলেন। বাঙলাদেশে শূর ও চন্দ্রবংশ বিখ্যাত। এই শূর বংশের আদিশূর নামে কোনো রাজা কনৌজ হইতে পাঁচজন নিষ্ঠাবান্ পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে বাঙলাদেশে আনয়ন করেন (আনুমানিক ৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে); কারণ বাঙলাদেশে শাস্ত্রাদি আলোচনার উপযুক্ত ব্রাহ্মণ তখন ছিল না। এদেশে ব্রহ্মণ্যধর্মের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হইতে প্রায় চারিশত বৎসর লাগে; কারণ বাঙলার এই সময়কার নূতন রাজবংশ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের পক্ষপাতী ছিল।

খ্রীষ্টীয় ৭৫০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে গোপাল নামে এক ভূস্বামীকে লোকে

* তাম্রলিপ্তি—বর্তমান তমলুক—মেদিনীপুর জেলায়, সমুদ্রের বন্দর।

বঙ্গদেশের রাজা করিয়া দেয়। ইহার বংশধরেরা ইতিহাসে 'পাল' নামে খ্যাত। ইহাদের আদি রাজধানী কোথায় ছিল সঠিক জানা যায় না; তবে মুদ্‌গগিরি বা মুঙ্গেরে একটা বড় কেন্দ্র ছিল; পরে গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করেন। তখন মিথিলা গৌড়দেশের ও গৌড়ীয় সংস্কৃতির মধ্যেই ছিল। গোপালের পুত্র ধর্মপালই পালবংশকে যথার্থ গৌরবান্বিত করেন। তিনি দিগ্বিজয়ে বাহির হন ও উত্তর ভারতের বহুস্থান অধিকার করেন। ধর্মপাল ছিলেন নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ বা তান্ত্রিক বৌদ্ধ। তাঁহারই চেষ্টায় বোধহয়, নালন্দার মঠের অনুরূপ মঠ বিক্রমশিলায় স্থাপিত হয়; এই বিহার ছিল ভাগলপুর জেলায়; কহলগাঁও-এর ধ্বংসাবশেষকে মঠের স্থান বলিয়া কেহ কেহ নির্দেশ করেন। এ সময়ের বৌদ্ধধর্ম বড়ই বিকৃত; বুদ্ধের ধর্মের বিশুদ্ধতা নষ্ট হইয়া কতকগুলি তান্ত্রিক দেবদেবীর পূজা-আরাধনায় বৌদ্ধধর্ম পর্যবেশিত হইয়াছিল।

দেবপাল এই বংশের আর একজন খ্যাতনামা রাজা। তাঁহার সেনাপতি লবসেন (লাউসেন) আসাম ও কলিঙ্গ জয় করেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। লবসেন বা লাউসেন বাঙলার বীর; রামের বীরত্ব লইয়া যেমন রামায়ণ রচিত, ইহার বীরত্ব লইয়া 'ধর্মমঙ্গল' সাহিত্য রচিত হয় (সাহিত্য পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। দেবপালের রাজত্বকালে সুমাত্রা দ্বীপের এক হিন্দু রাজা নালন্দায় একটি সঙ্ঘারাম নির্মাণ করিয়া দেন; পালরাজাদের বড় বড় দীঘি উত্তরবঙ্গে আছে।

এই বংশের নবম রাজা মহীপাল সম্বন্ধে বাঙলায় বহু কিংবদন্তী আছে। এই সময়ে দক্ষিণ ভারত হইতে চোলরাজ রাজেন্দ্র বাঙলাদেশ আক্রমণ করেন। মহীপালের পর নরপালের সময় অতীশ দীপঙ্কর নামে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধক তিব্বতে যান। তিব্বতে সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম যায়; একাদশ শতাব্দীতে ধর্মের সংস্কারের জন্য ভোটরাজ দীপঙ্করকে আহ্বান করিয়া লইয়া যান। তিব্বতী ভাষায় পুরাণো বাঙ্গলায় লেখা গ্রন্থের অনুবাদ আছে। বিক্রমশিলা ওদন্তিপুর, জগদ্দলের বিহারে বহু ভোট ভিক্ষু সংস্কৃত শিখিয়া বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক গ্রন্থ তিব্বতীভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

এই পাল রাজাদের সময়ের বড় রকম একটি কীর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে; বগুড়া জেলায় পাহাড়পুর নামক স্থানে এক বিশাল মন্দির পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি আছে।

দক্ষিণ হইতে চোল রাজাদের আক্রমণের পর হইতে পাল রাজগণ দুর্বল হইয়া পড়েন ও উত্তরবিহারের সঙ্কুচিত রাজ্যে বহুকাল রাজত্ব করেন। বঙ্গের পশ্চিম দিকে সেন নামে এক রাজবংশ প্রবল হইয়া উঠিল। ইহারা দক্ষিণ ভারত হইতে আসিয়াছিল ও নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিল। বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে জাগিতেছিল, তাহারই সুযোগ গ্রহণ করিয়া সেনরা পাল রাজাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিতে সক্ষম হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

সেন বংশের বিখ্যাত নরপতি বল্লাল সেন। তিনি বাঙলাদেশে কুলীন-প্রথা প্রবর্তন করেন; বৌদ্ধ পাল রাজগণের সময়ে জাতিভেদ তীব্রভাবে ছিল না; ধর্মের ও সমাজের মধ্যে নানা অনাচার প্রবেশ করে। সমাজের মধ্যে আভিজাত্য সৃষ্টি করিবার জন্য নব গুণ-সম্পন্ন কয়েকটি ব্রাহ্মণকে তিনি কুলীন বা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিলেন। বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণসেন। তাঁহার সভায় ধোয়ি, জয়দেব প্রভৃতি কবি ছিলেন। লক্ষ্মণসেন এক সংবৎ প্রচলিত করেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে; তবে সে লক্ষ্মণ-সংবৎ যে এই লক্ষ্মণসেন কর্তৃক প্রচারিত হয়, সে বিষয়ে পণ্ডিতরা সন্দেহ করেন (১১১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে; বোধ হয় তাঁহার জন্ম সাল)। এই সাল এখনো মিথিলায় প্রচলিত আছে। তাঁহারই সময়ে প্রায় ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী মুসলমানরা মহম্মদ বিন বখ্‌তিয়ারের অধীনে মগধের শেষ পাল রাজা গোপালদেবকে পরাভূত করিয়া বঙ্গদেশ জয় করে। তুর্কীরা বৌদ্ধদের প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংস করে।

১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজকে তিরোরীর যুদ্ধে পরাভূত ও নিহত করিয়া উত্তর ভারত জয় করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বিশ্বস্ত সেনাপতি কুতুবুদ্দিন দিল্লীর সুলতান হইলেন; ইতিমধ্যে ১১৯৮ অব্দে তাঁহার সেনাপতি মহম্মদ বিন বখ্‌তিয়ার বাঙলাদেশ জয় করেন; অর্থাৎ পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে উত্তর ভারতের সমস্ত হিন্দুরাজা মুষ্টিমেয় তুর্কী আক্রমণকারীর পদানত হইল! বাঙলাদেশ কিভাবে অধিকৃত হইয়াছিল, তাহা লইয়া অনেক গবেষণা হইতেছে। তুর্কীরা সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়াই আসুক আর পশ্চাতে দশ সহস্র সৈন্য লইয়া আসুক, তাহারা যে অল্প সময়ের মধ্যে বাঙলা অধিকার করিয়াছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই।

তুর্কী সৈন্যের পিছনে আসিল ইস্‌লামের প্রচারকগণ; কেহ আফগানিস্থান,

কেহ পারস্য, কেহ আরব হইতে। এই বিপ্লবের সময় বহু পণ্ডিত শাস্ত্রগ্রন্থ লইয়া নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেইজন্য নেপালে বহু বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ এখনো পাওয়া যায়। বাঙলায় যাহারা ব্রহ্মণ্যধর্মের অভ্যুদয়ের সময় অস্পৃশ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহাদের অনেকে এখন ইস্‌লামের আহ্বানে সাড়া দিল।

তুর্কীরা গৌড়ে ও দিনাজপুরের নিকটস্থ দেবকোটে রাজধানী স্থাপন করে। শাসনকর্তা গিয়াসুদ্দিন দেবকোট হইতে গৌড় দিয়া গঙ্গা পার হইয়া পশ্চিম-বঙ্গের প্রতাপশালী বীরভূমের বীর রাজার রাজধানী রাজনগর (লখনুর) পর্যন্ত এক বাদসাহী রাস্তা নির্মাণ করেন। এই সময়ের বঙ্গীয় শাসনকর্তারা দিল্লীর বাদসাহকে কখনো মানিতেন, কখনো মানিতেন না। তুগ্রিল খাঁ কিছুতেই দিল্লীর বশ্যতা মানেন নাই; অবশেষে সুলতান বলবন স্বয়ং আসিয়া নৃশংসভাবে বাঙলাকে বিদ্রোহী হইবার সাজা দিয়া গেলেন। সমগ্র বাঙলা-দেশ তুর্কীদের দ্বারা বিজিত হয়। পরে দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুগলক বাঙলাকে তিনভাগে ভাগ করেন, পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী সপ্তগ্রাম, পূর্ববঙ্গের সুবর্ণগ্রাম ও উত্তরবঙ্গের গৌড়; এখন তিনটি নগরই লুপ্ত। তিন প্রদেশের শাসনকর্তা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে বিবাদ করিতেন, দিল্লীর দুর্বল বাদসাহরা ইহাদের আর সামলাইতে পারিলেন না। অবশেষে সামসুদ্দিন ইলিয়াস্ বাঙলা-দেশের স্বাধীন নরপতি বলিয়া নিজেকে প্রচার করিলেন।

স্বাধীন পাঠান নরপতিগণ (১৩৪৩-১৫৭৬) দুই শত বৎসরের উপর রাজত্ব করেন। মাঝে গণেশ দনুজমর্দন নামে এক হিন্দুরাজা কিছুকাল প্রবল হন; কিন্তু তাঁহার পুত্র যদু ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া জেলালুদ্দিন নাম গ্রহণ করেন। কিন্তু ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াও ইনি বেশি দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই; হাব্‌শী (আবিসিনিয়াবাসী) সেনানীরা তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সাত বৎসর যদৃচ্ছাক্রমে রাজত্ব করে। তবে এই অরাজকতা অধিকাংশ সময়ে রাজধানীর মধ্যে পর্যবেশিত থাকিত, মফঃস্বলের প্রতাপশালী জমিদারগণ যথাযথভাবে নিজ নিজ মহল শাসন করিতেন। আলাউদ্দিন হোসেন শাহ হাব্‌শীদের হাত হইতে বাঙলাদেশ উদ্ধার করেন ও রাজা হন।

হোসেন শাহ প্রজারঞ্জক ছিলেন। তাঁহারই এক সভাসদ পরাগল খাঁর

উৎসাহে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের কিয়দংশ অনুবাদ করেন। ইহার সময়ে চৈতন্য মহাপ্রভু বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন; রূপ ও সনাতন গোস্বামী দুই ভ্রাতা রাজ সরকারে কার্য করিতেন; ইহারা উভয়েই সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা চৈতন্যদেবের শিষ্য হন ও বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন। এই সময়কে মধ্যযুগের বাঙলার স্বর্ণময় যুগ বা গৌড়ীয় যুগ বলা হয়। একদিকে বাঙলার পণ্ডিতগণ সংস্কৃত নব্য ন্যায়শাস্ত্রের গভীর আলোচনায় রত, অপর দিকে একজন বাঙলা ভাষার মধ্য দিয়া সাহিত্য সৃষ্টিতে ব্যাপৃত। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি কাব্যের যে ধারা আরম্ভ করেন, তাহা এই যুগে বিশেষভাবে পুষ্টিলাভ করে।

হোসেন শাহের বংশধরগণ নিস্তেজ হইয়া পড়িলে বিহারের এক জায়গীরদার-পুত্র ধীরে ধীরে তথায় প্রবল হইয়া উঠেন ও বাঙলাদেশ অধিকার করেন; ইনি ইতিহাস-বিশ্রুত শের শাহ্। বিহার ও বাঙলাকে করায়ত্ব করিয়া তিনি সাময়িকভাবে বাবরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন; কিন্তু বাবরের মৃত্যুর (১৫৩০) পর হুমায়ুনকে তিনি গ্রাহ্য করিলেন না ও তাঁহাকে পরাভূত ও ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিয়া সম্রাট্ হইলেন। শের শাহের সময় দেশের অনেক উন্নতি হয়; সুবর্ণগ্রাম হইতে দিল্লী পর্যন্ত এক বাদসাহী শড়ক তৈয়ার করেন; বর্তমানে তাহা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে পরিচিত। ১৫৪৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শের শাহের মৃত্যুর পর বাঙলাদেশে তাঁহার বংশের চারিজন উপর্যুপরি শাসনকর্তা হন। অবশেষে পাঠান জাতীয় কররাণী বংশীয় সুলেমান বাঙলার অধিপতি হইলেন। এই সুলেমানের সময় তাঁহার সেনাপতি কালাপাহাড় উড়িষ্যা জয় করেন। তিনি আসামও আক্রমণ করেন। এই তিন দেশে কালাপাহাড় অসংখ্য হিন্দু দেবমন্দির ও দেবদেবী ধ্বংস করেন। কালাপাহাড় জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। নাম রাজু বা রাজচন্দ্র; পরে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন।

ইতিমধ্যে দিল্লীর সিংহাসনে আকবর বসিয়াছেন (১৫৫৬)। ১৫৭৬ সালে তিনি রাজা তোডরমল্লকে বাঙলা জয় করিতে পাঠান; তিনি দাউদ খাঁকে উড়িষ্যায় তাড়াইয়া লইয়া যান; কিন্তু সমগ্র বাঙলা সহজে বশ মানিল না;

জয় করিতে প্রায় ১০।১১ বৎসর লাগিল। সুন্দরবনের রাজা প্রতাপাদিত্যকে মানসিংহ পরাভূত করেন। প্রতাপাদিত্য ছাড়া ঢাকার জমিদার ঈশা খাঁ, বিক্রমপুরের কেদাররায় ও চাঁদরায়, চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ মুঘলদিগকে বাঙলা জয় করিতে খুবই কষ্ট দিয়াছিল।

মুঘল সম্রাট্‌দের সময় বাঙলাদেশ তাঁহাদের অধীন ছিল; মানসিংহ বাঙলার প্রথম সুবেদার; তিনি রাজমহলে রাজধানী স্থাপন করেন; কারণ, ইতিপূর্বে মহামারিতে গৌড় উৎসন্ন গিয়াছিল; মাঝে পাঠানরা তাণ্ডা নগরে রাজধানী করেন। বাঙলার সুবেদার ইস্‌লাম খাঁর সময়ে পর্তুগীজ বণিক্‌রা বাঙলায় বাণিজ্য করিতে আসে ও কুঠী স্থাপন করে; কিন্তু অল্পকাল মধ্যে এই বর্বর জাতির লোকেরা দেশের মধ্যে অত্যাচার সুরু করিল; ইহারা ও মগেরা (আরাকানবাসী বর্মীরা) মিলিত হইয়া দক্ষিণবাঙলায় লোকের বাস করা কঠিন করিয়া তুলিল। পর্তুগীজ ও মগদিগকে বশে রাখিবার জন্য সুবেদার ইস্‌লাম খাঁ রাজমহল ত্যাগ করিয়া ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন ও ১৬১২ অব্দে পর্তুগীজ ও মগদিগকে পরাভূত করিলেন। সুবেদার কাশিম খাঁ এই দুর্বৃত্তদের হুগলীস্থিত দুর্গ ধ্বংস করিয়া দেন; সেই হইতে বাঙলাদেশে তাহাদের ক্ষমতা লোপ পায়।

শাহ জাহানের রাজত্বকালে ইংরেজরা এদেশে বাণিজ্যের প্রথম সুবিধা লাভ করে (১৬৫০) ও হুগলীতে কুঠী স্থাপন করে। আরঙ্গজেবের সময় সায়েস্তা খাঁ যখন সুবেদার, তখন ইংরেজরা মুঘলদের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র করে। ফলে সায়েস্তা খাঁ ইহাদিগকে হুগলী হইতে তাড়াইয়া দেন। কিন্তু খোদ সম্রাট্‌ আরঙজেবের কৃপায় ইহারা পুনরায় বাঙলায় কুঠী করিবার জন্য স্থান পায়। ১৬৯১ সালে কোম্পানীর শাসনকর্তা জব্‌ চার্ণক বর্তমান কলিকাতায় তিনখানি গ্রাম ইজারা পান। সায়েস্তা খাঁর মৃত্যুর পর বাঙলাদেশে নানারূপ অশান্তি দেখা দিল; ইহার মধ্যে বর্দ্ধমানের জমিদার শোভা সিংহের বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য। এই গোলযোগের সময় য়ুরোপীয় কোম্পানীরা নিজ নিজ কুঠীর চারিপাশ সুদৃঢ় করিবার আদেশ পাইল; কলিকাতার 'ফোর্ট-উইলিয়াম' (তখন ইংল্যাণ্ডের রাজা উইলিয়াম তৃতীয়ের নামানুসারে) নির্মিত হয়।

আরঙজেবের মৃত্যুর (১৭০৭) কয়েক বৎসর পূর্বে যখন সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্য পতনের পূর্বে কাঁপিতেছে—দাক্ষিণাত্য হইতে মুর্শিদকুলি খাঁকে তিনি বাঙলার সুবেদার করিয়া পাঠাইয়া দেন। তিনি জবরদস্ত শাসক ছিলেন ও রাজধানী ঢাকা হইতে বর্তমান মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করেন; নগর তাঁহারই নামে পরিচিত হইল। ১৭২৮ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার পর সুজাউদ্দীন নবাব হন। ১৭৪০ সালে আলিবর্দি খাঁ সরফরাজকে যুদ্ধে নিহত করিয়া সুবেদার হন। মুঘল সম্রাট্ আলিবর্দিকে সুবেদার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন।

এই সময়ে পশ্চিম ভারতে মারাঠারা প্রবল হইয়া উঠে, ও ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সমগ্র ভারতকে ত্রাসে শঙ্কিত করিয়া তোলে। বাঙলা-দেশে তাহাদের উৎপাত অসহ্য হইয়া উঠিল; উত্তর হইতে আসিলেন পেশোয়ার সেনাপতি, দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে আসিলেন ভোঁসলার সেনাপতি। বর্গীর হাঙ্গামা বাঙালীর মনে এখনো আতঙ্ক সৃষ্টি করে। আলিবর্দি দিল্লীর বাদশাহের নিকট কোনো সহায়তা পাইলেন না, তিনি রাজস্ব পাঠানো বন্ধ করিযা দিলেন; বাঙলা প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন হইল। আলিবর্দি মারাঠাদিগকে উড়িষ্যা ছাড়িয়া দিলেন। ষোল বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৭৫৬ সালে আলিবর্দির মৃত্যু হইল।

বাঙলার মস্‌নদে বসিলেন যুবক সিরাজউদ্দৌলা; তাঁহাকে সদুপদেশ দিতে পারে এমন একজন লোক মুর্শিদাবাদে বা বাঙলায় তখন ছিল না; নিজের স্বার্থ ছাড়া রাষ্ট্র বা দেশ বলিয়া কোনো বিষয় বা বস্তু যে চিন্তনীয়, একথা তখনকার হিন্দু-মুসলমান, বাঙালী-অবাঙালী সকলেই ভুলিয়াছিল। অল্পবয়সী হঠকারী যুবক নবাবের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাঁহার সেনাপতি মীরজাফর, রাজবল্লভ প্রভৃতি অনেকে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন।

এদিকে কলিকাতার ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারীদের দুর্ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া সিরাজ সসৈন্যে কলিকাতা আক্রমণ করেন; কলিকাতা অধিকৃত হইল ও ফোর্টের পলায়নাবশিষ্ট সৈন্যগণ বন্দী হইয়া একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হইল। পরদিন প্রাতে দেখা গেল যে, বন্দী সৈন্যগণ মরিয়া গিয়াছে। এই ঘটনা ইতিহাসে 'অন্ধকূপ হত্যা' নামে সুপরিচিত। ইংল্যণ্ডে এই

ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা সে-সময়ে প্রচারিত হয় এবং বহুকাল ইতিহাসে উহা অবিসংবাদী তথ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু পরলোকগত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র গবেষণার ফলে পূর্বের ধারণা কথঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইয়াছে।

উক্ত ঘটনার কিয়ৎকাল পরেই ক্লাইব্ দক্ষিণ ভারত হইতে বঙ্গদেশে আসিলেন ও মুর্শিদাবাদের বিদ্রোহী দলের সহিত মিলিত হইয়া সিরাজকে পদচ্যুত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিলেন।

ইংরেজ কোম্পানীর সৈন্যেরা ক্লাইবের অধীনতায় মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করিতে আসিল; পথে পলাশীতে যুদ্ধ নামে মাত্র হইল; কারণ নবাবের সেনাপতিরা যুদ্ধ করেন নাই। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সিরাজ পলায়ন করিলেন; ধরা পড়িয়া মীরজাফরের পুত্র মীরণের আদেশে তাঁহার শিরশ্চেদ হইল।

পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফরকে ক্লাইব্ নবাব বলিয়া অভিনন্দিত করিলেন। মীরজাফর গদি পাইয়া কোম্পানীর সকলকে বখ্‌শিশ দিলেন; ক্লাইব্ একাই ২,৩৪,০০০ পাউণ্ড বা প্রায় সাড়ে ৩২ লক্ষ টাকা পাইলেন; তাছাড়া ত্রিশ হাজার টাকার এক জায়গীর লাভ করিলেন। অন্যান্যদের পাওনা নিতান্ত কম হয় নাই। কিন্তু মুর্শিদাবাদের রাজকোষে এত টাকা ছিল না; কিস্তিতে কিস্তিতে বখ্‌শিসের টাকা দেওয়া হইল। মোট কথা, নগদ সোনা-রূপার মুদ্রা যা ছিল, তা প্রায় সবই মীরজাফরকে তাঁহার মুকুটের বিনিময়ে দিতে হইল।

পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইব্ দেশে যান; সেই সময়ে মীরজাফরকে তাড়াইয়া তাঁহার জামাতা মীরকাসেমকে নবাব করা হয়; কিন্তু মীরকাসেম ইংরেজ কোম্পানীর ক্রীড়নক হইয়া থাকিলেন না। এতকাল ইংরেজ বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিত; কিন্তু নবাব যখন শুল্ক একেবারেই রদ করিয়া দিলেন, তখনই ইংরেজ বণিক্ তাঁহার উপর বিরক্ত হইল। ফলে মীরকাসেম ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ করিলেন; কিন্তু পরাভূত হইয়া দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। মীরজাফরকে পুনরায় নবাব করা হইল; তখন তিনি বৃদ্ধ অকর্মণ্য। ইতিমধ্যে ক্লাইব্ গবর্ণর হইয়া পুনরায় বাঙলাদেশে ফিরিয়া আসিলেন; আসিয়া তিনি মুঘলবাদশা দ্বিতীয় শাহ্ আলমের নিকট হইতে বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করিলেন (১৭৬৫)।

ক্লাইব্ চলিয়া গেলে বাঙলাদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়; ইহাকে ছিয়াত্তরের

মন্বন্তর (১১৭৬ সাল) বলে; শোনা যায়, বাঙলার এক তৃতীয়াংশ লোক এই সময় মারা যায়। পার্লামেণ্ট ভারতের রাজ্য-শাসন বিষয়ে সর্বপ্রথম হস্তক্ষেপ করিয়া রেগুলেটিং এক্ট (১৭৭২) পাশ করেন। সেই এক্ট অনুসারে ওয়ারেন হেষ্টিংস গবর্ণর জেনারেল হইলেন; তিনি রাজস্ব আদায় বিষয়ে সুব্যবস্থা করেন ও জেলায় জেলায় কলেক্টর নিযুক্ত করেন। মুর্শিদাবাদ হইতে অফিস, আদালত কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিয়া আনেন। হেষ্টিংসের সময়ে সুপ্রীম কোর্ট প্রভৃতি বিচারালয় হয়। উইলিয়ম জোন্স্ ভারতের ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের গবেষণার জন্য এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করেন। উইল্‌কিন্স সাহেব বাঙলা হরফ কাটিয়া প্রথম মুদ্রাযন্ত্রের অক্ষর তৈরী করেন।

হেষ্টিংসের শাসনকালের শেষাশেষি (১৭৮৪) পার্লামেণ্ট ভারত শাসন বিষয়ে আরও নিয়ম-নিষেধ প্রণয়ন করিয়া একটি এক্ট পাশ করেন।

হেষ্টিংসের পর আসেন কর্ণওয়ালিস্। তিনি বঙ্গদেশে জমিদারদের সহিত রাজস্ব বিষয়ে চিরস্থায়ী বন্দবস্ত করেন। ওয়েলেসলির সময় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়; এইখানে যুবক ইংরেজ সিবিলিয়ানদের শিক্ষা দেওয়া হইত। লর্ড এমহার্ষ্ট ও বেণ্টিঙ্কের সময় অনেক সামাজিক কুপ্রথা নিবারিত হয়; ইহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সতীদাহ নিবারণ; এই সময়ে রামমোহন রায় ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করেন। ১৮২৬ সনে আসাম অধিকৃত হয; উহা বর্মার অধীন ছিল; বর্মীরা প্রথম যুদ্ধে পরাভূত হইয়া আসাম ও আরাকান ছাড়িয়া দেয়। ১৮৩৭ সালে আসামে চা-কর কোম্পানী গঠিত হয়। ১৮৩৬ সালে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ (বর্তমান যুক্তপ্রদেশ) পৃথক্ ছোটলাটের হাতে অর্পণ করা হয়। ভারতের লাটসাহেব ১৮৫৪ সন পর্যন্ত সমগ্র ভারতের ও বাঙলাদেশের শাসনকর্তারূপে ছিলেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যুগের শেষ গবর্ণর লর্ড ক্যানিং; প্রথম ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব (১৮৫৫-৫৯)। ইঁহাদের সময় সিপাহী বিদ্রোহ হয়। বাঙলাদেশেও ইহার ধাক্কা আসিয়া লাগে, কিন্তু তেমন প্রবলভাবে নহে। হ্যালিডের শাসন কালে বাঙলাদেশে রেলওয়ে বিস্তৃত হয়; কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় ১৮৫৭ সালে স্থাপিত হয়; ১৮৫৯ সালে বঙ্গের প্রজাদের অধিকার

সম্বন্ধে সর্বপ্রথম আইন পাশ হয়। পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতালদের এক বিদ্রোহ সাময়িকভাবে গবর্মেণ্টকে অত্যন্ত বিব্রত করিয়াছিল। কিন্তু সব চেয়ে যে বিষয়টি গবর্মেণ্টকে বিব্রত করিয়াছিল, সে হইতেছে নীল চাষ লইয়া হাঙ্গামা। গত শতাব্দীর গোড়া হইতে নীলের চাষ বাঙলাদেশে সাহেব নীলকরগণ সুরু করেন। বর্তমানের পাটের ন্যায় নীলও ছিল বাঙলার একচেটিয়া; সুতরাং এটি ছিল খুব লাভের ব্যবসা। নীলকরগণ কৃষকদের উপর অনেক সময়ে নিদারুণ অত্যাচর করিত; অত্যাচারের মাত্রা যখন বাড়িয়া উঠিত, তখন মাঝে মাঝে দাঙ্গা হইত। চাষীরা ধর্মঘট করিয়া নীলবোনা, নীলকাটা বন্ধ করিতে লাগিল। গবর্মেণ্টের কাছে দরখাস্ত আসিতে লাগিল। ছোটলাট গ্রাণ্ট সাহেব এবিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য এক কমিশন বসান (১৮৬০)। ইহার পর বৎসর দীনবন্ধু মিত্র রচিত 'নীলদর্পণ' নামে এক নাটক প্রকাশিত হয়; ইহাতে কুঠীয়াল সাহেব ও তাহাদের অনুচরদের অত্যাচার বর্ণিত আছে। বইখানি দেশময় বিশেষ চঞ্চলতা সৃষ্টি করে; পাদরী লঙ সাহেব ইহার অনুবাদ করেন; তজ্জন্য তাঁহার কারাগার ও জরিমানা হয়। গবর্মেণ্টের সেক্রেটারী সিটন-কার সাহেব নাকি এই অনুবাদ করিতে বলেন ও তিনি কয়েকখানি ইংরেজি বই সরকারী দপ্তর হইতে বিলাত পাঠান; এই অপরাধে তাঁহার উপর সরকার নিন্দাবাদ করেন ও তিনি কার্য ছাড়িয়া দেন। কুঠীয়ালরা গ্রাণ্ট সাহেবের নামে দশ হাজার টাকার দাবী দিয়া মানহানির মোকদ্দমা করে; তাহারা একটাকা ডিক্রি পায়; হরিশ মুখুজ্জে 'হিন্দুপেটরিয়টে' ইহাদের বিরুদ্ধে লিখিতেন; তাঁহার বিরুদ্ধে ইহারা নালিশ করে; তিনি মরিয়া গেলে তাঁহার বিধবা স্ত্রীর বিরুদ্ধে তাহারা মোকদ্দমা চালায়।

১৮৬১ সালে ইণ্ডিয়া কাউন্সিল এক্ট পাশ হয়। কলিকাতায় হাইকোর্ট স্থাপিত হয়; ইহার কাজ ১৮৬২ সাল হইতে আরম্ভ হয়; বর্তমান হাইকোর্ট বিল্ডিং ১৮৬৪ সালে সুরু ও '৭২ সালে শেষ হয়। স্যর সিসিল বিডনের সময়ে কলিকাতা ম্যুন্সিপালিটি (১৮৬৩) আইন হয়। বাঙালী প্রথম সিবিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বোম্বাইতে আসিয়া কাজ গ্রহণ করেন। ১৮৬৮ সালে কেশবচন্দ্র সেন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। ১৮৭২

সালে প্রথম সেন্সাস বা আদমসুমার গৃহীত হয়। ১৮৭৪ সালে আসাম ও সুরমা উপত্যকা (সিলেট, কাছাড়) লইয়া পৃথক্ প্রদেশ গঠিত করিয়া এক চীফ কমিশনারের হস্তে অর্পিত হইল। ইহার পর ত্রিশ বৎসর বাঙলার আর কোনো বড় রকম পরিবর্তন হয় নাই।

এস্. সি. ইডন যখন ছোটলাট (১৮৭৭-৮২) তখন বড়লাট হইতেছেন লর্ড লীটন। এই সময়ে দেশীয় কাগজসমূহ গবর্মেণ্টের, ইংরেজ বণিক্ কুঠীয়াল ও মফঃস্বলের ম্যাজিস্ট্রেট্দের অনেক কাহিনী তীব্রভাবে প্রকাশ করিত। অপ্রিয় সমালোচনা বন্ধ করিবার জন্য গবর্মেণ্ট দেশী কাগজের বিরুদ্ধে এক আইন পাশ করিলেন। এই সময়ে বাঙলা 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ইংরেজি কলেবরে প্রকাশিত হইল।

লর্ড রীপন আসিয়া এই আইন রদ করিয়া দেন ও তিনি নানাভাবে দেশীয়দের সহিত সখ্যতা স্থাপনের চেষ্টা করেন। তাঁহার সময়ে শিক্ষা বিষয়ক কমিশন বসে; স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন আইন পাশ হয়; এই সময়ে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড, ম্যুন্সিপালিটি গঠিত হয়। এই সময়ের ইলবার্ট বিলের আন্দোলনের জন্য রীপন বিখ্যাত হইয়াছেন। দেশীয় সিবিলিয়ান ম্যাজিষ্ট্রেট্রা (তখন বিহারীলাল গুপ্ত ও রমেশচন্দ্র দত্ত ম্যাজিষ্ট্রেট্) সাহেব বা ফিরিঙ্গি অপরাধীর বিচার করিতে পারিতেন না। এই অনধিকার দূর করিবার জন্য আইন সদস্য ইলবার্ট সাহেব এক আইনের খশড়া প্রস্তুত করেন। ইহাতে ইংরেজরা খুব আপত্তি করে এবং এমন তীব্র আন্দোলন দেশময় সৃষ্টি করে যে, রীপন সে-আইন পাশ করিতে পারিলেন না। ইলবার্ট বিল পাশ না হওয়াতে বাঙালী বুঝিল সঙ্ঘবদ্ধ স্বল্পলোকে কতটা শক্তি ধারণ করে। ইহার কিছুকাল পরে কংগ্রেস গঠিত হয় (১৮৮৫)। বাহিরের ঘটনার মধ্যে বলিবার মত হইতেছে ডাফ্রীনের সময় উত্তরবর্মা জয় ও ১৮৯১ সালে মণিপুর জয়। মণিপুর জয় হওয়াতে উত্তরবর্মার সহিত সরাসরি যোগটা সম্পূর্ণ হইল।

১৮৯৯ সালে লর্ড কর্জন বড়লাট হইয়া আসেন। তিনি বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত করেন (১৯০৫); সেইজন্য তিনি অত্যন্ত অপ্রিয় হন। সেই হইতে বাঙলায় জাতীয় আন্দোলন নূতন রূপ লইয়াছে। ১৯১২ সালে বঙ্গচ্ছেদ রদ হয় ও কলিকাতা হইতে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়।

বাঙলার ফোর্ট উইলিয়মের গবর্ণরগণ

১৬৯০ জব্ চার্ণক কর্ত্তৃক কলিকাতা প্রতিষ্ঠা

১৭০০ স্যর চার্লস্ আইয়ার (Eyre),—ফোর্ট উইলিয়মের প্রথম গবর্ণর।

১৭০১ জন বীয়ার্ড

১৭০৩ মুর্শিদকুলি খাঁ সুবেদার।

১৭০৭ আরঙজেবের মৃত্যু।

১৭০৮ বিবদমান ইংরেজ কোম্পানী-গুলি একত্র হইল

১৭০৪-১০ পালাক্রমে গবর্ণর নিয়োগ

১৭১০ এন্থনি বেল্ট্ডেন্

১৭১১ জন্ রাসেল

১৭১৩ রবার্ট হেজেস্

১৭১৮ স্যামুয়েল ফীক্

১৭২৩ জন্ ডীন্

১৭২৫ মুর্শিদের মৃত্যু।

১৭২৬ হেন্রি ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড্

১৭২৮ এ. ষ্টীফেন্সন্, জন্ ডীন্

১৭২৫-৩৯ সুজাউদ্দীন নবাব।

১৭৩২ জন্ ষ্ট্যাক্হাউস

১৭৩৯ টমাস্ ব্র্যাডডিল

১৭৩৯ সরফরাজ খাঁ নবাব।

১৭৪০ আলিবর্দি বাঙলার নবাব।

১৭৪৬ জন্ ফরষ্টার্

১৭৪৮ উইলিয়াম বারওয়েল

১৭৪৯ আডাম ডসন্

১৭৫১ রঘুজি ভোঁসলাকে উড়িষ্যা ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

১৭৫২ উইলিয়াম ফিচ্; রজার ড্রেক্

১৭৫৬ এপ্রিল ৯, আলিবর্দির মৃত্যু; সিরাজউদ্দৌলা নবাব।

১৭৫৭ জুন ২৩, পলাশীর যুদ্ধ; মীরজাফর নবাব।

১৭৫৮ কর্ণেল রবার্ট ক্লাইব্	
১৭৬০ হলওয়েল ; ভ্যান্সিটার্ট	১৭৬০ মীরকাশিম নবাব মনোনীত
	১৭৬৩ মীরজাফর (পুনরায়) নবাব।
১৭৬৪ জন্ স্পেন্সার	১৭৬৪ বক্সারের যুদ্ধ।
১৭৬৫ লর্ড ক্লাইব্	১৭৬৫ দিল্লী সম্রাটের নিকট হইতে দেওয়ানী লাভ ; মীরজাফরের মৃত্যু ; নাজিম-উদ-দৌলা নবাব।
১৭৬৭ ভেরলেষ্ট	১৭৬৭ ক্লাইব্ বিলাত যান।
১৭৬৯ কার্টিয়ার	১৭৭০-৭১ বাঙলায় ছেয়াত্তুরে মন্বন্তর।
১৭৭২ ওয়ারেন হেষ্টিংস	
	১৭৭৩ বিলাতে রেগুলেটিং এক্ট পাশ।

বাঙলার ফোর্ট উইলিয়মের গবর্ণর-জেনারেলগণ

(১৭৭৩ অব্দের রেগুলেটিং এক্ট অনুসারে)

(১৭৭৪ হইতে ১৮৫৪ পর্যন্ত এই আশী বৎসর ভারতের বড়লাট বাঙলারও শাসনকর্তা ছিলেন)

১৭৭৪ ওয়ারেন হেষ্টিংস্

১৭৮৪ ৮৫ ম্যাক্‌ফারসন্ (অ)

১৭৮৬ কর্ণওয়ালিস্

১৭৯৩ স্যর জন্ শোর্

১৭৯৮ স্যর এ. ক্লার্ক (অ)

১৭৯৮ মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লি

১৮০৫ কর্ণওয়ালিস্ (২য় বার) ;
স্যর জর্জ বার্লো

১৮০৭ আর্ল অব্ মিণ্টো

১৮১৩ মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস

১৮২৩ জন আডাম্ (অ)

১৮২৬ লর্ড আমহার্ষ্ট

১৮২৮ বেইলী (অ)

১৮২৮ লর্ড বেণ্টিঙ্ক

ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারেলগণ

(১৮৩৩ অব্দের চার্টার এক্ট অনুসারে)

১৮৩৩ লর্ড বেণ্টিঙ্ক

১৮৩৫ স্যর চার্লস্ মেট্‌কাফ্

১৮৩৬ লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড — উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ পৃথক্‌ভাবে গঠিত হইল।

১৮৪২ লর্ড এলেনবরা

১৮৪৪ বার্ড্ (অ) ; হার্ডিংজ

১৮৪৮ মার্ক্‌ইস্ অব্ ডালহৌসি

১৮৫৪ বাঙলাদেশে পৃথক্ লেফটন্যাণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত হন।

১৮৫৬ লর্ড ক্যানিং

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে বৃটিশ পার্লামেণ্ট ভারত শাসনের ভার গ্রহণ করেন। ১৭৮৪, ৪ঠা সেপ্টেম্বর হইতে ১৮৫৮, ২রা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ভারত শাসনের ভার বোর্ড অব কণ্ট্রোলের উপর ন্যস্ত ছিল।

ভারত সচিব		ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারেল ও ভাইস্‌রয়	বঙ্গদেশ, বিহার-উড়িষ্যা ও আসামের লেফট্‌নাণ্ট-গবর্ণর
	১৮৫৪		ফ্রেডরিক্ হ্যালিডে
	১৮৫৫		
	১৮৫৬	লর্ড ক্যানিং	
	১৮৫৭		
লর্ড ষ্ট্যান্‌লি	১৮৫৮	লর্ড ক্যানিং, প্রথম ভাইস্‌রয়	
স্যর চার্ল্‌স্ উড্	১৮৫৯		জন্ পি. গ্র্যাণ্ট
	১৮৬০		
	১৮৬১		
	১৮৬২		সিসিল বীডন্
	১৮৬৩	লর্ড এলগিন্ ; নেপিয়ার ; ডেনিসন (অ)	
	১৮৬৪	লর্ড লরেন্স	
	১৮৬৫		
রীপন্, স্যালিস্‌বেরী	১৮৬৬		
নর্থকোট	১৮৬৭		উইলিয়ম গ্রে

আর্গাইল	১৮৬৮			
	১৮৬৯	লর্ড মেয়ো		
	১৮৭০			
	১৮৭১			
	১৮৭২	ষ্ট্র্যাচি ; নেপিয়ার (অ)		
	১৮৭৩	লর্ড নর্থব্রুক্		
স্যালিস্‌বেরি	১৮৭৪		রিচার্ড টেম্পল্	আসাম পৃথক্ প্রদেশ হইল ; চীফ্ কমিশনার—কিটিং
	১৮৭৫			
	১৮৭৬	লর্ড লীটন্		
	১৮৭৭		এশলি ইডন্	
ক্রানব্রুক্	১৮৭৮			বেইলি
	১৮৭৯		বেইলি (অ)	
হার্টিংটন	১৮৮০	লর্ড রীপন		
	১৮৮১			ইলিয়ট্
কিম্বারলী	১৮৮২		টমসন্	
	১৮৮৩			ওয়ার্ড

ভারত সচিব		ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারেল ও ভাইস্‌রয়	বঙ্গদেশ ও বিহার-উড়িষ্যার লেফটনাণ্ট-গবর্ণর	আসামের চীফ্‌ কমিশনার
	১৮৮৪	লর্ড ডাফ্‌রিন্‌		
রানডল্‌ফ্‌ চার্চিল	১৮৮৫		ককারেল (অ)	
ভাইকাউণ্ট ক্রস্‌	১৮৮৬			
	১৮৮৭		বেইলি	ফিট্‌জ প্যাট্রিক
	১৮৮৮	লর্ড ল্যান্সডাউন		
	১৮৮৯			ওয়েষ্টল্যাণ্ড ; কুইণ্টন
	১৮৯০		ইলিয়ট্‌	
	১৮৯১			কোলেট্‌ ; ওয়ার্ড
কিম্বারলী	১৮৯২			
	১৮৯৩		ম্যাকডোনাল্ড্‌ (অ)	
ফাউলার	১৮৯৪	লর্ড এল্‌গিন্‌		লায়েল
হ্যামিণ্টন	১৮৯৫		মেকেঞ্জি	
	১৮৯৬			কটন্‌
	১৮৯৭		ষ্টিভেন্স্‌ (অ)	
	১৮৯৮		উডবার্ণ	

	১৮৯৯	লর্ড কর্জন		
	১৯০০			ফ্লার
	১৯০১			
	১৯০২		বুর্দিলন (অ)	
ব্রড্রিক্	১৯০৩		লীথ ; ফ্রেজার	বোল্টন্ (অ)
	১৯০৪	লর্ড এম্পথিল্ (অ)		
				পূর্ববঙ্গ ও আসাম
				(১৬অক্টোবর গঠিত হইল)
জন্ মর্লী	১৯০৫	লর্ড মিণ্টো		লেফনট্যাণ্ট-গবর্ণর—ফুলার
	১৯০৬		হেয়ার (অ) ; স্লেক	লেন্স্লট হেয়ার
	১৯০৭			
	১৯০৮		বেকার	বেইলী (অ)
	১৯০৯			
	১৯১০	লর্ড হার্ডিংজ		

ভারত সচিব		ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয়	বাঙলার গবর্ণর	বিহার-উড়িষ্যার লেফট্‌নাণ্ট গবর্ণর	আসামের চীফ্ কমিশনর ও গবর্ণর
আল অব্ ক্রু	১৯১১				
	১৯১২		কারমাইকেল	ডিউক (অ) বেইলি*	আর্চডেল আর্ল†
	১৯১৩				
	১৯১৪				
চেম্বারলেন	১৯১৫			গ্যেট	
	১৯১৬	লর্ড চেমস্‌ফোর্ড			
মণ্টেগু	১৯১৭		লর্ড রোনাল্‌ডশে		
	১৯১৮				বেল
	১৯১৯				
	১৯২০			লর্ড সংহ	
	১৯২১	লর্ড রীডিং		হেনরি হুইলার	বেল
ভাইকাউণ্ট পীল্	১৯২২		লর্ড লীটন		
	১৯২৩				ম্যারিস্

* ১লা এপ্রিল, বিহার উড়িষ্যার প্রথম পৃথক্ ছোটলাট।

‡ প্রথম গবর্ণর।

১লা এপ্রিল, পুনরায় চীফ কমিশনারের অধীন হয়।

লর্ড অলিভিয়ার্;					
বার্কেনহেড্	১৯২৪				
	১৯২৫				কার্; রীড্
	১৯২৬	লর্ড আরুইন্			
	১৯২৭		জ্যাক্সন্	ষ্টিফ্নসন্	হ্যামণ্ড
ভাইকাউন্ট পীল্	১৯২৮				
ওয়েজউড্ বেন্	১৯২৯				
	১৯৩০				
স্যর সামুয়েল হোর্	১৯৩১	লর্ড উইলিংডন্			
	১৯৩২		এণ্ডারসন্	সিফ্টন্	মাইকেল কীন্
	১৯৩৩				
	১৯৩৪				
লর্ড জেট্ল্যাণ্ড্	১৯৩৫				
	১৯৩৬	লর্ড লিনলিথগো।			

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বাঙলায় জাতীয় জীবন

বাঙলাদেশেই ইংরেজ প্রথম রাজত্ব স্থাপন করেন; রাজ্য স্থাপন করিয়া তাঁহারা বাঙালীর ধর্ম-কর্ম কিছুতেই হস্তক্ষেপ করেন নাই। ইংরেজি ভাষা শিক্ষা বা য়ুরোপীয় ভাব-ধারা সম্বন্ধে জ্ঞান দিবার জন্য কোম্পানীর কোনো উৎসাহ ছিল না। বাঙালী হিন্দুরা ইংরেজি ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। ভাষা ভাবের বাহন; য়ুরোপের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বাণী ইংরেজি সাহিত্যের ভিতর দিয়া যুবক বাঙলাকে একদিন উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিল। য়ুরোপ হইতে প্রাপ্ত স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রেরিত হইয়া শিক্ষিত বাঙালী ক্রমশই ইংরেজ শাসনকর্তার ব্যবহার ও বিধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে সুরু করিল। এই রাজনৈতিক আলোচনায় যাঁহারা প্রথম যোগদান করেন, তাঁহাদের মধ্যে রামমোহন রায়ের নাম অগ্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে; তিনি সে যুগে কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থার বহু সমালোচনা করেন। বিলাতে গিয়াও তিনি কোম্পানীর নানা আচরণের বিরুদ্ধে বলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝখানে কলিকাতায় বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নামে একটি সভা স্থাপিত হয়; প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, দিগম্বর মিত্র ও প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি ইহার স্থাপয়িতা। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন সে যুগের রাজনৈতিক বক্তা ও সমালোচক।

হরিশ্চন্দ্রের কাগজের নাম ছিল 'হিন্দুপেটরিয়ট'। এই কাগজে তিনি ডালহৌসীর রাষ্ট্রীয় নীতির প্রতিবাদ করেন। এমন সময়ে সিপাহী বিদ্রোহের উপদ্রব উত্তর ভারতকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই বিদ্রোহের সময়ে ও বিদ্রোহান্তে হরিশ্চন্দ্র নির্ভীকভাবে রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে থাকেন।

এই সময়ে বাঙলাদেশে নীলের চাষ হইত। বর্তমানে জার্মাণ-রঙ আবিষ্কৃত

হওয়ায় ঐ ব্যবসা লোপ পাইয়াছে। সাহেব নীলকরগণ বাঙলায় চাষীদের দাদন দিয়া নীল আদায় করার ব্যবস্থা করিয়াছিল। ক্রমশ কুঠীর সাহেবরা ও তাঁহাদের দেশীয় গোমস্তারা বাঙালী চাষীদের উপর অত্যাচার করিতেন বলিয়া জানা যায়। হরিশ তাঁহাদের বিরুদ্ধে সর্বদা লিখিতেন। প্রথম সময়ে দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' নামে একখানি নাটক লেখেন, এই নাটকে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার কাহিনী বিবৃত হয়। লঙ (Long) সাহেব ইংরেজিতে এই বই-এর অনুবাদ করেন। ইহার ফলে লঙের জেল ও জরিমানা হয়; জরিমানার টাকা দেন কালীপ্রসন্ন সিংহ—যিনি মহাভারতের অনুবাদ করেন। এই সব ব্যাপারের পর গবর্মেণ্ট নীলচাষের বিষয় তদন্ত করিতে বাধ্য হন; তদন্তের ফলে চাষীদের অনেক অসুবিধা দূর হইয়াছিল।

ইহার কয়েক বৎসর পরে লর্ড লীটন যখন বড়লাট, তখন তিনি দেশীয় কাগজগুলির সমালোচনা বন্ধ করিবার জন্য এক আইন পাশ করিলেন। জনমত জানিবার একমাত্র উপায় পত্রিকার মধ্য দিয়া; সেই পথ বন্ধ হওয়ায় অনেক ইংরেজ বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার আইনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল 'অমৃতবাজার' নামে একখানি বাঙলা পত্রিকা। শিশিরকুমার ঘোষ ছিলেন ইহার সম্পাদক। মফঃস্বলের নীলকর, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির কার্যাবলীর কথা তিনি প্রকাশ করিতেন। এই আইন পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 'অমৃতবাজার' ইংরেজী খোলসে বাহির হইয়া আসে। লীটনের দেশী ভাষা সম্বন্ধে আইনের প্যাঁচে আর উহা পড়িল না।

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পূর্বে 'ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন' নামে একটি নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ইহার অবলম্বিত নীতি বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন কর্তৃক অবলম্বিত নীতি অপেক্ষা অধিকতর অগ্রসর। এই নূতন সভাটি স্থাপন করিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রী-প্রমুখ যুবকগণ।

সুরেন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্ত বাঙলাদেশের প্রথম বাঙালী ম্যাজিষ্ট্রেট। ইহাদের পূর্বে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) I. C. S. পাশ করিয়া বোম্বাই প্রদেশে কাজ গ্রহণ করেন। বাঙালী ছেলে ইংরেজদের সহিত সমানে সমানে পরীক্ষা দিয়া পাশ করিতে পারে দেখা গেল।

সুরেন্দ্রনাথ শ্রীহট্টে সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট হন; সেখানে কোনো একটি বিচারের ভুলের জন্য তাঁহাকে কাজ ছাড়িতে বাধ্য করা হয়। নূতন অনভিজ্ঞ যুবকের পক্ষে ভুল করা স্বাভাবিক; কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের সেই পাপের ফলে তাঁহার কাজ ছাড়িতে হয়। তিনি চাকুরী ছাড়িয়া রাজনৈতিক কাজে লাগিলেন; প্রথমে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' স্থাপন করিলেন ও পরে Bengali নামে দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক হইলেন। বহু বৎসর Bengali কাগজের নামডাক খুব ছিল।

এই সময়ে সিবিল সার্বিসে প্রবেশের বয়স ২১ হইতে কমাইয়া ১৯ করা হয়। আন্দোলন করিবার বিষয় জুটিল; এই বয়স কমানোর প্রতিবাদ করিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ ভারতের সর্বত্র বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। সে যুগের রাজনৈতিক আন্দোলন বলিতে ইহাই বুঝাইত। গবর্মেণ্টের নিকট আবেদন, নবেদন ছিল তাহার প্রধান অঙ্গ এবং সে আবেদন, নিবেদন ও ক্রন্দন চাকুরী পাইবার জন্য!

ইহার পাশাপাশি চলিতেছিল 'হিন্দু মেলা'র আন্দোলন। সেখানে দেশীয় শিল্প, দেশীয় যাত্রা, স্বদেশী গান, কুস্তি-কসরৎ, কবিতা প্রভৃতির প্রতিযোগিতা হইত। এই দল পূর্বোক্ত রাজনৈতিক দল হইতে পৃথক্ থাকিতেন,—গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবগোপাল মিত্র ছিলেন ইহার উদ্যোক্তা। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গাও ভারতের জয়' নামে জাতীয় সঙ্গীত এই সময়ে রচিত।

লর্ড রীপন বড়লাট হইয়া আসিয়া প্রথমে লীটনের প্রেস্ আইন উঠাইয়া দিলেন। এছাড়া স্বায়ত্ত শাসনের শিক্ষার জন্য স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিধি প্রবর্তন করিলেন। সাধারণ লোকে তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার সময় বাঙলাদেশে একটা বিরাট আন্দোলন হয়। তাহা ইলবার্ট বিল লইয়া। এই বিলের ইতিহাস সংক্ষেপে বলিতেছি।

আমরা যে-সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি—সে-সময়ে দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেটরা দেশীয় সকল অপরাধীর বিচার করিতে পারিতেন; কিন্তু সাহেবের সামান্য অপরাধেরও বিচার করিতে পারিতেন না। রমেশচন্দ্র দত্তের প্ররোচনায় তদানীন্তন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট বিহারীলাল গুপ্ত এবিষয়ে গবর্মেণ্টকে আইন সংশোধনের জন্য প্রস্তাব করিয়া পত্র দেন। রীপন এই বিষয়ের সমীচীনতা

বিবেচনা করিয়া গবর্মেণ্টের আইন সদস্য ইলবার্ট সাহেবকে এক আইনের খশড়া করিতে বলেন। সেই আইনের খশড়ায় ছিল, দেশী ম্যাজিষ্ট্রেটও সাহেব অপরাধীর বিচার করিতে পারিবেন। কিন্তু এই প্রস্তাব ইংরেজদের ও ফিরিঙ্গীদের ভাল লাগিল না; তাহারা সভা করিয়া, কাগজে লিখিয়া, বিলাতে আবেদন করিয়া আন্দোলন সৃষ্টি করিল; এমন কি, এই আইন পাশ হইলে তাহারা বড়লাটকে জোর করিয়া বিলাতে পাঠাইয়া দিবে বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল। নানাভাবে তাহারা তাহাদের বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। ইংরেজ স্বেচ্ছাসেবকগণ রণ-শিক্ষা লইতে আরম্ভ করিল। শেষকালে আইন পাশ হইল না।

বাঙালী বুঝিল মুষ্টিমেয় ইংরেজ সঙ্ঘবদ্ধভাবে বড়লাটের বিধি ও ইচ্ছাকে কি ভাবে রদ করিতে পারে; সুতরাং সঙ্ঘবদ্ধ না হইলে রাজনৈতিক আন্দোলন করা অসম্ভব।

শিক্ষিত বাঙালী সঙ্ঘবদ্ধ হইবার চেষ্টা করিল। ১৮৮৩ সালে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' এক National Conference আহ্বান করিলেন; তিন দিন এই সভা হয়; আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ ইহার উদ্যোগী। ইহাই কংগ্রেসের অগ্রদূত।

ইহারই পাশাপাশি আরও একটি আন্দোলন চলিতেছিল।

কংগ্রেসের আদি উদ্যোক্তারা ছিলেন অধিকাংশই অ-বাঙালী; ১৮৮৫ সালে বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতি হন বাঙালী ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বিচিত্র জাতিকে এক মহাজাতিতে পরিণত করা; এই মহাজাতির নৈতিক, মানসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি বিধান এবং সেই উদ্দেশ্যে বিধিসঙ্গত আন্দোলন-সৃষ্টি এবং ভারত ও ইংল্যণ্ডের মধ্যে সখ্য স্থাপন।

কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন কলিকাতায় হয়; সে সভায় দাদাভাই নৌরজী সভাপতি হন। ইহার পর ১৮৯০, ১৮৯৬, ১৯০১, ১৯০৬ এবং তারপরে কয়েকবার কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক হইতে বাঙলাদেশে জাতীয়তা এক নূতন রূপ গ্রহণ করে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বিশেষত আনন্দমঠ, যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের

ম্যাটসিনী গ্যারিবল্ডী প্রভৃতির জীবনী প্রকাশ, স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ সেবা সম্বন্ধে বক্তৃতা সমূহ, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও গল্প নানা ভাবে বাঙালীর মনকে ধীরে ধীরে উদ্বুদ্ধ করিতেছিল। ১৮৯৮ সালে কর্জন বড়লাট হইয়া আসেন। ১৯০৫ সালে তিনি বঙ্গচ্ছেদ করেন। ইহার প্রস্তাব হয় ১৯০৩ সালের শেষে। সেই হইতে দেশের মধ্যে প্রতিবাদ সুরু হয়। ইহার প্রতিবাদ কল্পে বাঙালী বৃটীশ পণ্য দ্রব্য বর্জন বা 'বয়কট' আন্দোলন করে। এই বয়কট আন্দোলন অল্পকাল মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনে ও স্বদেশী আন্দোলন কিছুকালের মধ্যে দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হইল। এই আন্দোলনকে সফল করিবার জন্য বাঙালী যুবক ও ছাত্রেরা নানা সঙ্ঘ, সম্প্রদায় ও প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। গবর্মেণ্ট ছাত্রদিগকে রাজনৈতিক সভায় যোগদান করিতে নিষেধ করেন; এই সার্কুলারের বিরুদ্ধে ছাত্রেরা দাঁড়াইল। তাহারা অ্যাণ্টি সার্কুলার সোসাইটি স্থাপন করিল। ক্রমে দেশের মধ্যে জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ স্থাপিত হইল; মফঃস্বলে রংপুর প্রভৃতি নানা স্থানে 'জাতীয় বিদ্যালয়' হইল।

১৯০৬ সালে বরিশালে প্রাদেশিক সভা পুলিশ জোর করিয়া ভাঙ্গিয়া দেয়। সেই হইতে বাঙলার মধ্যে রাজনৈতিক পন্থা লইয়া নেতাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। ইংরেজের কাছ হইতে কিছু পাওয়া যাইবে, সে আশা বর্জন করিয়া শারীরিক শক্তির দ্বারা বৃটীশ শক্তিকে আঘাত করিবার দুঃস্বপ্ন যুবকদের মধ্যে জাগিল। শরীরের ব্যায়াম, কুস্তি, লাঠিখেলা প্রভৃতি বিষয়ে বাঙালী ছেলে মন দিল; অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হইল। এই ব্যায়াম সমিতিগুলিদ্বারা দেশ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠে। যুগান্তর নামে এক পত্রিকা এই সময়ে চরম নীতি সম্বন্ধে লিখিতে থাকে। এ সময়ে আরও কতকগুলি বাঙলা কাগজ চরম মত প্রচ্ছন্ন-অপ্রচ্ছন্ন নানা ভাবে প্রকাশ করিত। রজনীকান্ত, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতির স্বদেশী গান এই সময়ে সমগ্র দেশে গীত হইতে লাগিল।

১৯০৭ সালের শেষে সুরাটের কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন রাসবিহারী ঘোষ, কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল। সভার চরমপন্থী ও নরমপন্থীরা ঝগড়া করায় কংগ্রেস তখন ভাঙ্গিয়া যায়। ইহারই কয়েক মাস পরে মজফঃরপুরে এক

হত্যাকাণ্ড হইল ; বিপ্লবীদের দ্বারা ইহাই প্রথম রক্তপাত। অবশ্য যাহারা মরিল, তাহারা সম্পূর্ণ নিরপরাধ—দুই জন ইংরেজ ব্যারিষ্টার ও তাহাদের পত্নী। অত্যাচারীদের একজন আত্মহত্যা করে, অপর জন ধরা পড়ে। ইহার কয়েক দিন পরে কলিকাতার মানিকতলায় এক বোমার কারখানা আবিষ্কার হয়। এই ব্যাপারে লোকে আশ্চর্য হইয়া গেল। বিচারে অপরাধীদের নানারূপ শাস্তি হয় ; ইহাদের নেতা বারীন্দ্র ঘোষ-প্রমুখ যুবকগণের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইয়াছিল। বার বৎসর পর সরকার বাহাদুর তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেন।

য়ুরোপীয় সমরের সময়ে এই বিপ্লবীরা দেশের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছিল ; এমন কি, বিদেশ হইতে অস্ত্র-শস্ত্র আনিয়া খণ্ড প্রলয়ের ব্যর্থ চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদের চেষ্টার ফল হয় নাই।

১৯২১ সাল হইতে রাজনীতিতে নূতন প্রাণ আসিল ; মহাত্মা গান্ধী রাজনীতিতে নামিলেন। মুসলমানদের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য তিনি 'খিলাফৎ' আন্দোলনে যোগদান করেন। গান্ধীজি অসহযোগ-নীতি প্রচার করিলে বাঙালী তাহাতে সাড়া দিল। তুর্কীর সুলতান মুসলমানদের খলিফ বা ধর্মগুরু। তাঁহার সাম্রাজ্য নানা ভাবে বিধ্বস্ত হয়। খলিফার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ভারতে 'খিলাফৎ' আন্দোলন হয়। মহম্মদ আলি ও সৌকত আলি ইহার নেতা ছিলেন।

সুভাষচন্দ্র বসু সিবিল সার্বিসের কাজ ছাড়িলেন, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সরকারী কাজ ছাড়িলেন ; চিত্তরঞ্জন মন-প্রাণ দিয়া এই অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে চিত্তরঞ্জন পূর্ণ অসহযোগ-নীতি হইতে সরিয়া আসিলেন ও কাউন্সিলে প্রবেশ করিলেন ; তাঁহার দলকে বলিত 'স্বরাজ্য দল'। ইহাদের উদ্দেশ্য গবর্মেণ্টকে সভায় বাধা দান ও কার্য অচল করা। ইতিমধ্যে গবর্মেণ্ট তাহা দমন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। বাঙলার প্রায় সমস্ত নেতাই কারাগারে গেলেন। কিছুকালের জন্য আন্দোলনের শান্তি হইল। এমন সময়ে চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হইল।

১৯২৮ সালে কলিকাতায় বিরাট কংগ্রেস হয় ; মতিলাল নেহেরু সভাপতি হন। তখন প্রায় সব নেতাই মুক্ত ছিলেন। ইহার দুই বৎসর পরে মহাত্মাজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু হয়। বাঙলাদেশ ইহাতে যোগদান করে ও বহু

সহস্র লোক জেলে যায়। সরকারী আইন ভঙ্গ করা এই আন্দোলনের মূল-নীতি। লবণ সরকারের একচেটিয়া বাণিজ্য। ঠিক হইল এই আইন ভঙ্গ করা হইবে। যেখানে লোণা জল সেখানেই সত্যাগ্রহী লবণ করিয়া আইন ভাঙিতে লাগিল। তখন বিভিন্ন অর্ডিনান্স বা বিশেষ আইন প্রবর্তিত হইল। নানা অর্ডিনান্সে বহু সহস্র লোক ধরা পড়ে। এখন অনেককেই ছাড়িয়াছে। কিন্তু এখনো অনেক যুবক 'অর্ডিনান্স' বা বিশেষ আইন বলে হিজলী (মেদিনীপুর), বক্সা (জলপাইগুড়ি) ও দেউলী (রাজপুতানা) জেলে আবদ্ধ আছে। কংগ্রেসকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিল ও ইহার অধিবেশন বে-আইনী হইল। ১৯৩২ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন বসিতে দেওয়া হয় নাই।

বর্তমানে আন্দোলন নূতন পথ লইয়াছে। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, শিল্পোন্নতি ও গ্রামসংগঠন প্রভৃতি গঠনমূলক কার্যে লোকে মন দিয়াছে।

কিছুকাল হইতে বাঙলাদেশ ও ভারতের সর্বত্রই প্রায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অসদ্ভাব দেখা দিয়াছে। ইহা জাতীয় জীবনের বিশেষ ক্ষতি করিতেছে। কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকজন চিন্তাশীল কর্মী আছেন, যাঁহারা জাতির যথার্থ হিতের জন্য নিজেদের স্বার্থকে বলি দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। স্যর সামুয়েল হোরের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা জাতীয়তার পরিপন্থী বলিয়া বাঙালী ইহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক।

১৯৩৪ সালে এপ্রিল মাসে গবর্মেণ্টের অবিরুদ্ধতায় কংগ্রেস পুনর্গঠিত হইল ও বোম্বাইতে অক্টোবর মাসে কংগ্রেস হয়। বাঙলাদেশের কোনো একছত্র নেতা নাই। অধিকাংশ কর্মী অন্তরায়িত অথবা মৃত। এতৎসত্ত্বেও বোম্বাই কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে না-গ্রহণ, না-বর্জ্জন নামে নীতি বাঙলা স্বীকার করিতে পারে নাই।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বাঙলার শিক্ষা

খ্রীষ্টান পাদরী ও ইংরেজ সাধারণ ভদ্রলোকদের সহায়তা লইয়া বাঙালী হিন্দুরা কলিকাতায় ইংরেজি শিক্ষা লাভের জন্য প্রথম চেষ্টা করেন; তখন ফারশী ছিল রাজভাষা; সুতরাং ঠিক চাকুরীর লোভে তখনও ইংরেজি শেখার তাগিদ আসে নাই। ১৮৬৭ সালে গোলদীঘির ধারে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়; রামমোহন রায় ও ডেভিড হেয়ার ছিলেন ইহার উদ্যোক্তা। ১৮১৮ সালে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হয়; তাহাদের চেষ্টায় স্কুলের সংখ্যা দ্রুত বাড়িতে থাকে। ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুরের কলেজ স্থাপিত হয়। ইহার পর কলিকাতায় ও মফঃস্বলে ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হইতে আরম্ভ করে। মোট কথা, ১৮৩৩ সালের পূর্বে ইংরেজি শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রচারের চেষ্টা হয় নাই। ১৮৩৩ সালে বৃটীশ রাজ ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু কোম্পানীর উপর প্রত্যক্ষভাবে স্থানীয় শাসনের ভার অর্পিত থাকিল। এই সময়ে স্থির হইল যে, ইংরেজি ভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষাদান করা হইবে; বহুকাল হইতে দুইদল লোকের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল যে, বাঙলার শিক্ষা প্রাচ্যভাষামূলক হইবে, না ইংরেজি-ভাষামূলক হইবে। মেকলের চেষ্টায় স্থির হইল, ইংরেজি ভাষায় সব কাজ চলিবে। এদিকে সরকারী কাজ করিবার জন্যও একদল ইংরেজি-জানা দেশী কর্মচারীর প্রয়োজন; সুতরাং সেই উদ্দেশ্যে ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা হইল। ১৮৩৫ সালে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান করা হয়; ১৮৩৭ সালে কাছারিতে পার্শীর বদলে ইংরেজির চল হইল। ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিংজ ঘোষণা করিলেন যে, গবর্মেণ্ট ইংরেজি স্কুলে যাহারা পড়িয়াছে, তাহারা সরকারী কাজ পাইবে।

অনেকের ধারণা ইংরেজদের আসিবার পূর্বে এদেশে বুঝি লোকশিক্ষা ছিল না; ১৮৩৩ সালে মিঃ এডামস্ দেশীয় শিক্ষা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া

যে রিপোর্ট লেখেন, তাহাতে তিনি বলেন যে, বাঙলাদেশে তখন আনুমানিক একলক্ষ পাঠশালা ছিল। সংস্কৃত শিক্ষায় এক একটি কেন্দ্রে এত পণ্ডিতের বাস ছিল, যে সেখান হইতে যে-কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার কার্য চলিতে পারিত। নূতন ইংরেজি স্রোত এই দেশীয় শিক্ষা প্রথা বা পদ্ধতিকে অগ্রাহ্য করিয়া সম্পূর্ণ নূতন ধরণের বিদ্যালয় স্থাপনে মন দিল; ইহার ফলে যে-শিক্ষা সমাজের অন্তরঙ্গ প্রতিষ্ঠান ছিল, তাহা সমাজের অঙ্ক ত্যাগ করিয়া রাষ্ট্রের অনুগ্রহে চালিত হইল; গ্রাম ছাড়িয়া বিদ্যা শহরে আসিল। আর জ্ঞান ও বিদ্যার মধ্যে ছাড়াছাড়ি হইল।

প্রায় দেড়শত বৎসর হইল ইংরেজি শিক্ষা বাঙলাদেশে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে আসিবার পূর্বে বাঙলাদেশে তিন ধরণের শিক্ষা চল্‌তি ছিল; হিন্দুরা—বিশেষভাবে ব্রাহ্মণরা সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন; সেজন্য বহু টোল চতুষ্পাঠী ছিল, সমাজের এমন ব্যবস্থা ছিল যে, এইসকল প্রতিষ্ঠান সমাজের মধ্য হইতে সহায়তা লাভ করিত। গ্রাম্য পাঠশালায় বাঙলা ও সামান্য হিসাবপত্র শেখানো হইত; এই ধরণের স্কুল প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ছিল এবং নিতান্ত জল-অচলনীয় জাতি ছাড়া বৈদ্য, কায়স্থ, নবশাখ সকলেই লিখিতে পড়িতে পারিত। তৃতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয় ছিল মুসলমানদের; সেখানে পারশী, আরবী শেখানো হইত। মৌলবীর কাছে হিন্দুরা পারশী শিখিত; কারণ, ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত পারশীতে কাছারির কাজ-কর্ম চালত।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙলার দেওয়ানী পাইবার পর প্রায় ৫০।৬০ বৎসর এদেশে ইংরেজি শিক্ষা বা জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচারের কোনো চেষ্টা করে নাই। পারশী ছিল কোর্টের ভাষা; ১৭৮১ সালে ওয়ারেন হেষ্টিংস কলিকাতায় পারশী-আরবী শিক্ষার জন্য এক মাদ্রাসা স্থাপন করেন; ইহার দশ বৎসর পরে কাশীতে হিন্দুদের জন্য কাশী সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। হেষ্টিংস বাঙলা, পার্শী, সংস্কৃত জানিতেন এবং ভারতীয় সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। কোম্পানী দেশের লোকের মনে পাছে কোনোপ্রকার ভয় হয়, সেইজন্য খ্রীষ্টান পাদরীদের এদেশে আসিতেই দিতেন না। শ্রীরামপুর ছিল দিনেমারদের অধীনে। ইংরেজ খ্রীষ্টান পাদরীরা আসিয়া প্রথমে সেখানে আশ্রয় লইয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ওয়েলেস্‌লী ইংরেজ সিবিলিয়ান ছোকরাদের শিক্ষাদানের জন্য 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ' স্থাপন করেন; তাতে দেশীয় পণ্ডিতরা পড়াইতেন। কিন্তু ইহা বেশি দিন চলে নাই। তারপর ১৮১৩ অব্দে কোম্পানী একলাখ টাকা শিক্ষার জন্য মঞ্জুর করেন, কিন্তু সেটাকা আরবী, পারশী, সংস্কৃত বই ছাপাইতে নষ্ট হয়। এই বৎসর হইতে এদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার উঠিয়া যায় এবং পাদরীদের এদেশে আসিয়া ধর্ম ও শিক্ষা বিস্তারের অনুমতি দেওয়া হয়।

১৮১৩ হইতে ১৮৫৩ অব্দ পর্যন্ত বিদ্যাশিক্ষা বিশেষভাবে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল; গবর্মেণ্ট ব্যাপকভাবে শিক্ষাসমস্যাকে দেখেন নাই। ১৮৫৪ সালে তৎকালীন বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের সভাপতি স্যর চার্লস উড্ এদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে একটি বহুবিস্তৃত ডেস্‌প্যাচ্ প্রেরণ করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষার উপর জোর দিবার জন্য গবর্মেণ্টকে বলিলেন। এই সময় হইতে বাঙলাদেশের শিক্ষা পরিচালনার জন্য ডিরেক্টর পদের সৃষ্টি হয়। এছাড়া এই ডেস্‌প্যাচে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রথম পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ হয়। এই সময়ে বেসরকারী স্কুলে অর্থসাহায্য-রীতি প্রবর্তিত হয়।

১৮৫৭ সালে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কতকগুলি কলেজের তত্ত্বাবধানে প্রবেশিকা পরীক্ষা গৃহীত হইত। বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে বুঝাইত পরীক্ষা লইবার অপিস। প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে ১৮৮২ সালে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কারের জন্য যে শিক্ষা কমিশন বসে, তাহাও বেসরকারী স্কুল, কলেজ স্থাপনা সম্বন্ধে উৎসাহ প্রকাশ এবং 'গ্রাণ্ট' প্রথার পোষকতা করে।

আরও বিশ বৎসর পরে ১৯০২ সালে লর্ড কর্জন ইউনিভার্সিটি কমিশন বসান। তাহার ফলে ১৯০৪ সালে ইউনিভার্সিটি এক্ট পাশ হয়। এই এক্টের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, শিক্ষাবিভাগের উপর গবর্মেণ্টের এবং স্কুল ও কলেজের উপর ইউনিভার্সিটির নিয়ন্ত্রণ-শক্তি বৃদ্ধি। নূতন বিধি অনুসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভার শতকরা ৮০ জন সদস্য চ্যান্‌সেলারের মনোনীত ব্যক্তি হইলেন এবং অপর সদস্যের নির্বাচন গবর্মেণ্টের সম্মতি সাপেক্ষ হইল। কোনো স্কুল বা কলেজকে পরীক্ষাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার সম্পূর্ণ অধিকার

গবর্মেণ্টের রহিল ; পরীক্ষা দিবার উপযুক্তভাবে স্কুল সজ্জিত কিনা তাহা দেখেন ইন্সপেক্টর। কলেজ পরিদর্শনের জন্য ইউনিভার্সিটির যে ইন্সপেক্টর আছেন তিনি সরকারী লোক নহেন। ১৯০৮ সাল হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষাদান কার্য গ্রহণ করেন; অর্থাৎ পূর্বে বি. এ. পাশের পর ছাত্রেরা কলেজে এম. এ. পড়িত ; এখন বিশ্ববিদ্যালয় এম. এ.র জন্য কলেজ খুলিল ; এতদিন পরে বিশ্ববিদ্যালয় কেবল পরীক্ষাগ্রহীতা না থাকিয়া শিক্ষাদাতাও হইল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নূতন গঠন কার্য করিয়াছিলেন স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

দশ বৎসর পরে ১৯১৭-১৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বসে। লীড্‌স্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্‌সেলার স্যাড্‌লার সাহেব এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন। ইহার প্রতিবেদন ১৯১৯ সালে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রধান বক্তব্য এই যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অত্যন্ত বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হইয়া পড়িয়াছে ; উপযুক্ত কেন্দ্রে নূতন বিদ্যায়তন স্থাপিত হওয়া উচিত। কমিশনের মতে কলেজ বিভাগের প্রথম দুটি বর্ষ স্কুলের প্রথম চারিটি শ্রেণীর সহিত যুক্ত করিয়া ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপন করিলে ভাল হয়। যাহাই হৌক, এই প্রতিবেদন প্রকাশের পর ১৯২০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯২১ সালে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল ; বর্মা এ পর্যন্ত কলিকাতার অধীন ছিল। ঢাকা আবাসিক ; রেঙ্গুনও আবাসিক বটে, কারণ রেঙ্গুনের বাহিরে আর কলেজ নাই। শিক্ষাবিভাগের আর একটি গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হইল নূতন শাসন সংস্কার কালে। শিক্ষাবিভাগ দেশীয় মন্ত্রীর হাতে আসিল ; কিন্তু য়ুরোপীয় ও য়ুরেশিয়ানদের শিক্ষার ব্যবস্থা গবর্মেণ্টের রক্ষিত বিষয়ের অন্তর্গত থাকিল। শিক্ষামন্ত্রী বাঙলার শিক্ষা বিভাগের প্রধান ব্যক্তি ; তাঁহার সহায় ও সহকারী হইতেছেন ডিরেক্টর অব্‌ পাবলিক ইনষ্ট্রাক্‌শন। ইউনিভার্সিটির সহিত সরকারী শিক্ষাবিভাগের কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নাই ; কিন্তু ইউনিভার্সিটি ও সাধারণ শিক্ষাবিভাগ উভয়ই অর্থের জন্য গবর্মেণ্টের উপর নির্ভর করে। ইউ-নিভার্সিটি সম্রাটের সনদ লইয়া গঠিত ; বড়লাট ইহার চ্যান্‌সেলার ছিলেন, বর্তমানে গবর্ণর ইহার চ্যান্‌সেলার। শিক্ষাবিভাগ দেশীয় মন্ত্রীর হাতে ; ইউনিভার্সিটিকে অর্থের জন্য তাঁহার দ্বারস্থ হইতে হয়। অথচ শিক্ষামন্ত্রীর

ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা নাই। বর্তমানে বাঙলার ব্যবস্থাপক সভা ইউনিভার্সিটি সম্বন্ধে আইন-কানুন করিতে পারেন। স্কুলগুলি ডিরেক্টর ও তাঁহার অপিসের অধীন; পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক ইউনিভার্সিটির নির্দ্দেশমত পড়িতে হয়; আবার প্রবেশিকার পাঠ্য বই ছাড়া অপর ক্লাশের বই শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর কর্তৃক নির্দিষ্ট হয়। শিক্ষাবিষয়ে এই দ্বৈত ব্যবস্থা এবং শিক্ষার আদর্শের মধ্য কোনো ঐক্য না থাকার ফলে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা এক্ষণে শিক্ষাবিভাগের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা করিব।

শিক্ষামন্ত্রী

বাঙলাদেশের শিক্ষা এখন ব্যবস্থাপক সভার অন্তর্গত 'হস্তান্তরিত' বা transfered বিষয়। য়ুরোপীয়দের শিক্ষা গবর্ণরের 'রক্ষিত' বিষয়ান্তর্গত। আবার কতকগুলি টেক্‌নিকেল স্কুল অন্যান্য মন্ত্রীর তত্বাবধানে গিয়াছে, যেমন শিল্প বিদ্যালয়, রেলওয়ে টেক্‌নিকেল স্কুল ইত্যাদি। ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচিত সভ্যদের মধ্য হইতে শিক্ষামন্ত্রী গবর্ণর কর্তৃক মনোনীত হন। তাঁহার শিক্ষাসংক্রান্ত দপ্তরখানার কাজ দেখিবার জন্য একজন সিবিলিয়ান্ সেক্রেটারী ও সহকারী থাকেন। শিক্ষা-ডিরেক্টর তাঁহার অধীন।

ডিরেক্টর অব্ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শন

১৮৫৪ সালে এই পদের সৃষ্টি হয়। এখানে ডিরেক্টর শিক্ষাবিভাগের কর্তা, শিক্ষামন্ত্রীর প্রধান পরামর্শদাতা ও দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ্। ইঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য একজন সহকারী (assistant) ডিরেক্টর, মুসলমানদের শিক্ষার জন্য আর একজন সহকারী ডিরেক্টর, এবং আরও একজন অতিরিক্ত সহকারী ও বর্তমানে একজন ব্যায়াম ডিরেক্টর আছেন।

ডিরেক্টরের অধীন দুটি বিভাগ; একটি ইন্সপেক্সন বা তদারক বিভাগ, অপরটি অধ্যাপনা বিভাগ। অর্থাৎ বাঙলার স্কুলগুলির পরিদর্শনের জন্য প্রত্যেক বিভাগে একজন করিয়া ডিভিশনাল ইন্সপেক্টর আছেন; এবং তাঁহাদের অধীন জেলাসমূহে ইন্সপেক্টর, সব-ইন্সপেক্টর প্রভৃতি আছেন।

অধ্যাপনা বিভাগের কতকগুলি স্কুল ও কলেজ প্রত্যক্ষভাবে ডিরেক্টরের অধীন। গবর্মেণ্টের তত্ত্বাবধানে খাশ কলেজ হইতেছে কলিকাতায় চারিটি,—সর্বসাধারণের জন্য প্রেসিডেন্সী, হিন্দুদের জন্য সংস্কৃত, মুসলমানদের জন্য ইস্‌লামিয়া ও মেয়েদের জন্য বেথুন কলেজ। মফঃস্বলে হুগলী, কৃষ্ণনগর, চট্টগ্রাম, ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট ও রাজসাহী কলেজ গবর্মেণ্টের খাশ। এ ছাড়া প্রায় প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া গবর্মেণ্ট স্কুল আছে। এইসব স্কুল ও কলেজের অধ্যাপক ও শিক্ষক ডিরেক্টর বাহাদুর বা গবর্মেণ্টের অধীন। তাঁহাদের বদলী-বরখাস্ত সবই ডিরেক্টরের বিবেচনার উপর নির্ভর করে।

মেয়েদের শিক্ষার তদ্বির করিবার জন্য একজন ইন্স্‌পেক্‌ট্রেস্‌ ও বিভাগীয় সহকারী ইন্সপেক্‌ট্রেস আছেন; ইঁহারাও D. P. I.এর অধীন। শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য কলিকাতায় ও ঢাকায় দুটি কলেজ আছে; সে দুটি ও গুরুট্রেনিং স্কুলগুলি ডিরেক্টরের তত্ত্বাধীনে। বিদ্যাবিভাগের উপর কর্তৃত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয় ও ডিরেক্টর। নানাবিষয়ে এই দ্বৈতশাসন কার্যের অসুবিধা করে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তক ও প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক বিশ্ব-বিদ্যালয় নির্দেশ করেন; এতদ্‌ভিন্ন স্কুলের মধ্য ও প্রাথমিক ক্লাশগুলির পাঠ্য পুস্তকও ডিরেক্টর-মনোনীত টেক্সট্‌ বুক কমিটি স্থির করেন। এছাড়া কোনো নূতন স্কুল খোলা হইলে উহা যদি গবর্মেণ্টের গ্রাণ্ট বা দান চাহে, তবে তাহাকে ডিরেক্টরের নির্দেশ মত চলিতে হয়; এ বিষয়ে ডিরেক্টরের বহু বিস্তৃত উপদেশ ও নির্দেশ আছে; ঘরবাড়ী, টেবিল, চেয়ার, শিক্ষক, মৌলবী, বেতন, ছুটি প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়ে সাহায্যপ্রার্থী বিদ্যালয়কে মানিয়া চলিতে হয়। তারপর প্রবেশিকা পরীক্ষার সময়ে ইউনিভার্সিটি আসিয়া তদারক করিয়া পরীক্ষার অনুমতি দেন। অন্য প্রদেশে গবর্মেণ্টের তরফ থেকে পরীক্ষা লওয়া হয়, ইহাকে বলে School Learning Certificate; মাসে মাসে প্রস্তাব হয়, ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপন করিয়া কলেজের দুটি ক্লাশ স্কুলের সঙ্গে যুড়িয়া দিয়া একটি বোর্ডের হাতে পরিচালনার ভার অর্পণ করার। মোট কথা ইউনিভার্সিটি ও বেসরকারী কলেজ ছাড়া শিক্ষাবিভাগের প্রায় সর্বত্র ডিরেক্টর বাহাদুরের ক্ষমতা খুব বেশী।

শিক্ষাবিভাগ কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা নিম্নে দেখাইতেছি (১৯৩০-৩১)

বাঙালী শিক্ষামন্ত্রী	সেক্রেটারী (I. C. S.) সহকারী সেক্রেটারী
ডিরেক্টর অব্ পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন্	এসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর, মুসলমান শিক্ষার জন্য এসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর, একজন অতিরিক্ত এসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর, একজন ব্যায়াম ডিরেক্টর।

বিভাগীয় ইন্সপেক্টর অতিরিক্ত ইন্সপেক্টর	...	১৪ জন
মুসলমান শিক্ষার জন্য ইন্সপেক্টর	...	৫ ,,
জেলা ইন্সপেক্টর ...	...	২৮ ,,
মহকুমা ইন্সপেক্টর ...	...	৬১ ,,
সব্ ইন্সপেক্টর ...	...	২৪৩ ,,
সহকারী ,, ...	...	১৪ ,,
ইন্সপেক্ট্রেস্ (মেয়েদের স্কুলের জন্য)	...	২ ,,
সহকারী ইন্সপেক্ট্রেস্	...	১২ ,,
য়ুরোপীদের শিক্ষার জন্য ইন্সপেক্টর	...	১ ,,

বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়; তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন তৎকালীন বঙ্গদেশের (বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম) কলেজ ছাড়া পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কলেজগুলিও ছিল। ১৮৮২ সালে পঞ্জাব ও ১৮৮৭ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বর্মা জয়ের পর সেখানকার কলেজ কলিকাতার অন্তর্গত হয়। তারপর ১৯১২ সালে বিহার-উড়িষ্যা পৃথক্ প্রদেশ হইলেও কয়েক বৎসর কলিকাতার অন্তর্গত ছিল; ১৯১৭ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় পৃথক্ হইয়া যায়। ১৯২০ সালে বর্মায় রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল; বাঙলার হাত হইতে আরও অনেকটা কাজ কমিয়া গেল। তার পর বৎসরে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত

হইল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষাপ্রার্থী নহে, উহা আবাসিক (Rasidential) বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকার কয়েকটি কলেজ ছাড়া বাহিরের কলেজ ইহার অন্তর্ভুক্ত নহে। আসাম পৃথক্ প্রদেশ হওয়া সত্ত্বেও এ পর্যন্ত পৃথক্ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে নাই, সেখানকার কলেজগুলি কলিকাতার অধীন। সুতরাং রাষ্ট্রীয় সীমানার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্তিয়ারের সীমানা এক নহে।

১৯১৬ সালে ভারতবর্ষে কলিকাতা (৫৮ কলেজ), বোম্বাই (১৭), মান্দ্রাজ (৫৩), পঞ্জাব (২৪), এলাহাবাদ (৩৩) এই পাঁচটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ছিল; এখন সেই জায়গায় ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়। ১৮৫৭ হইতে ১৮৮৭র মধ্যে প্রথম পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়; তারপর ১৯১৬ হইতে ১৯২৯ এর মধ্যে ১৩টি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশনের (Sadler Comission) রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে ভারত গবর্মেণ্ট স্থানিক (local), আবাসিক (residential) ও অধ্যাপনাশীল (teaching) বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সাধারণকে উৎসাহিত করেন। ইহার ফলে এই সব নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হইয়াছে। ১৯১২ সালে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ লুপ্ত হইলে, লর্ড হার্ডিংজ ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় করিয়া দিবেন এই প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু নানা কারণ ও বিশেষভাবে যুদ্ধের জন্য আর্থিক সমস্যাহেতু ১৯২০ সালের পূর্বে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব হয় নাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনকাঠামো কলিকাতা হইতে পৃথক্। এখানেও গবর্ণর চান্‌সেলার। তিনি চল্লিশ জন সভ্যকে 'কোর্ট'-এ (ঢাকায় 'সেনেট' বলে না) মনোনীত করেন; এছাড়া কয়েকজন আজীবন সভ্য আছেন। চারিজন সদস্যকে লইয়া একটি অধ্যক্ষ-সভা আছে; সভায় যে-কোনো সিদ্ধান্তকে নাকোচ করিবার ক্ষমতা চান্‌সেলারের আছে। ঢাকায় ভাইস-চান্‌সেলার বেতনভোগী প্রধান অধ্যক্ষ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্বে কেবলমাত্র পরীক্ষাগ্রাহী ছিল। ১৯০৪ সালের এক্টের ফলে সেনেটের সভ্য-সংখ্যার বেশীর ভাগ সরকারী মনোনীত সদস্য হন। সেনেট একটি বৃহৎ সভা; সেখানে সমস্ত কাজ-কর্মের সবিস্তার আলোচনা হইতে পারে না। সেইজন্য 'সিণ্ডিকেট' নামে একটি অধ্যক্ষ-সভায় বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কাজ-কর্ম আলোচিত হয়। প্রতি সপ্তাহে এই সভা বসে। এই

সভার সিদ্ধান্ত সেনেটের মতামতের জন্য উপস্থিত করা হয়। সেনেটের সদস্য-সংখ্যা ১০০; ইহার মধ্যে মাত্র ২০ জন শিক্ষাব্যবসায়ী। অধ্যয়ন, পাঠ্যতালিকা, গ্রন্থনির্ব্বাচন বিষয় 'ফ্যাকালটি'র উপর ন্যস্ত। আর্টস ফ্যাকালটি, সায়েন্স ফ্যাকালটি, (আইন) ল-ফ্যাকালটি, মেডিসিন (চিকিৎসা) ফ্যাকালটি, ইঞ্জিনীয়ারিং ফ্যাকালটি নিজ নিজ পাঠ্য বিষয়ের গ্রন্থ-নির্বাচন ও পরীক্ষকের নিয়োগাদি করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন তিন শ্রেণীর কলেজ আছে,—

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের খাশ কলেজ।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন পরীক্ষার জন্য সংযুক্ত কলেজ। ইহার মধ্যে সরকারী কলেজ ও বেসরকারী কলেজ আছে; কলিকাতার কলেজ ও মফঃস্বলের কলেজগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

(৩) বৃত্তি-শিক্ষার কলেজ; যেমন মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, শিক্ষা কলেজ ইত্যাদি। এগুলি গবর্মেণ্টের কলেজ; কেবলমাত্র পরীক্ষার জন্য ইউনিভার্সিটির অধীন। সেনেটের ফ্যাকালটিগুলি ইহাদের শিক্ষণীয় বিষয় ও পরীক্ষাদি তত্ত্বাবধান করেন; অন্যান্য ব্যবস্থা করেন গবর্মেণ্টের শিক্ষা-বিভাগের কর্তা ডিরেক্টর সাহেব। বৃত্তি-শিক্ষা ও আইন-কলেজ ইউনিভার্সিটির অধীন; বিশেষ অনুমতি পাইয়া কলিকাতার রীপন কলেজ আইন শিক্ষা দিয়া থাকে। গৌহাটী আইন কলেজ সরকারী বিভাগের অন্তর্গত। এখন আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত এই বিভাগগুলির কিঞ্চিৎ বিস্তৃত বিবরণ দিব। প্রথমেই ইউনিভার্সিটির খাশ কলেজগুলির কথা ধরা যাক্।

ইউনিভার্সিটির তিনটি কলেজ আছে,—(১) আর্টস্ কলেজ, (২) সায়েন্স কলেজ ও (৩) ল-কলেজ।

বিশ্ববিদ্যালয় পোষ্ট গ্রাজুয়েট্ অর্থাৎ 'গ্রাজুয়েটের পর' সকল শিক্ষার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন; কেবল প্রেসিডেন্সী কলেজে এম. এ., এম. এস.-সি. ক্লাশ আছে। কিন্তু অনেক পাঠ ইউনিভার্সিটি ও প্রেসিডেন্সীর ছাত্ররা একত্র গ্রহণ করে।

(১) আর্টস্ কলেজে সাহিত্য, মনোবিজ্ঞান, দর্শন, সংস্কৃত, বাঙলা, ভারতীয় ও বিদেশী ভাষা, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বহু বিষয় শেখানো হয়। কলিকাতা বিশ্ব-

বিদ্যালয় এত বিষয় অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিয়াছেন, যে উহা এখন যথার্থ বিশ্ব-বিদ্যার আলয় হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের কোন ইউনিভার্সিটিতে এত বিষয় পঠিত হয় না।

(২) সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্ব হইয়াছে বিজ্ঞান বিভাগে। উচ্চতর বিজ্ঞানের বীক্ষণাগার বাঙলাদেশে প্রেসিডেন্সী কলেজ ছাড়া আর কোথায়ও ছিল না; সেই কলেজের অধ্যাপক ছাড়া আর কাহারও সেখানে পরীক্ষা করিবার অধিকার ছিল না। স্বর্গীয় ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার-প্রতিষ্ঠিত 'সায়েন্স এসোশিয়েসনে' অনেকে কাজ করিতেন। বাঙলায় এই অভাব দূর হইল 'সায়েন্স কলেজ' স্থাপনের দ্বারা। স্যর আশুতোষের প্ররোচনায় দানবীর তারকচন্দ্র পালিত ও রাসবিহারী ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান চর্চার জন্য বহু লক্ষ টাকা দান করেন। তাঁহাদের সেই টাকার দ্বারা বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বহু স্কলারশিপের সৃষ্টি হইয়াছে। স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় এমন কতকগুলি ক্লাশ করেন, যাহা সাধারণত অন্য কলেজে করা ব্যয়সাধ্য; যেমন বি. এ.র জন্য Commerce, নৃতত্ত্ব, পালি ইত্যাদি।

ইউনিভার্সিটি কলেজের কয়েকটি বিষয়ের অধ্যাপকের পদ পাকা; অর্থাৎ সেগুলির জন্য টাকা স্থায়ীভাবে বরাদ্দ আছে; কিন্তু এযাবৎকাল অন্য সকল লেকচারার, রীডার প্রভৃতির কোনো স্থায়িত্ব ছিল না; প্রত্যেকের সঙ্গে কয়েক বৎসরের একটা কন্‌ট্রাক্ট হইত। ১৯৩০ সালে মাত্র অধ্যাপকগণ স্থায়ীপদ লাভ করিয়াছেন।

ইউনিভার্সিটিতে ১৯৩১-৩২ সালে ছাত্র-সংখ্যা ছিল ১,১৪৪। কিন্তু এত ছাত্রের মধ্যে মাত্র ৪৪৮ (এম. এ.) ও ২০৪ (এম.এস-সি) পরীক্ষার জন্য বসে ও যথাক্রমে ২৯৬ (৬৬%) ও ১১৭ (৫৭%) পাশ করে।

গবর্মেণ্ট বাৎসরিক ৩,৬০,০০০ টাকা দেন। এছাড়া পরীক্ষার ফী, রেজিষ্ট্রেশন ফী, পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য প্রকাশিত বই-এর আয়, দানের সুদ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ চলে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকে যত দান করিয়াছে, ভারতের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কেহ এত দেয় নাই। ১৯৩২ সালে কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৮ লক্ষ টাকার উপর ব্যয় হয়; ইহার মধ্যে

গবর্মেণ্টের দান ৩৫% ভাগ, ফী বা মাহিনা ৫০% ভাগ এবং বিবিধ হইতে অবশিষ্ট উঠে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহু পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

বিদেশ হইতে খ্যাতনামা অধ্যাপকদের আনাইয়া তাঁহাদের বক্তৃতার ব্যবস্থা কলিকাতা করে। ইহার জন্য বেসরকারী দানের বিশেষ ফাণ্ড আছে।

(৩) ইউনিভার্সিটির অধীন যে আইন-কলেজ আছে, তাহার কথা আমরা বৃত্তি শিক্ষার স্কুল-কলেজের মধ্যে আলোচনা করিব।

ইউনিভার্সিটির অধীন বাঙলাদেশে ৪৯টি কলেজ আছে ; ইহার মধ্যে চারিটি মাত্র মহিলা-কলেজ। ১৬টি কলেজে মাত্র ইণ্টারমিডিয়েট্ পর্যন্ত পড়ানো হয় ; ইহার কতকগুলি আবার ঢাকা বোর্ডের অধীন। ১২টি কলেজ সরকারী, ২১টি সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত, ১৬টি সরকার-সাহায্য-নিরপেক্ষ। ইউনিভার্সিটির ইন্সপেক্টর মাসে মাসে দেখেন এই সব কলেজ উপযুক্ত অধ্যাপক ও সরঞ্জাম রাখিয়াছে কিনা।

১৯৩১-৩২ সালে সকল প্রকার কলেজে সকল প্রকার আয় হইতে খরচ হয় ৩৫,৩৯,০০০৲ টাকা। ইহার মধ্যে ১২টি সরকারী কলেজে ১৫,৫২,০০০৲, ২১টি সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত কলেজে ১২,৪৮,০০০৲ ও ১৬টি বিনা সাহায্যে চালিত কলেজে ৭,৩৯,০০০৲ টাকা ব্যয় হয়। ছাত্র পিছু ব্যয় সরকারী কলেজে ৪৭১৲, সাহায্য-প্রাপ্ত ১৩৬৲ ও বিনাসহায় কলেজে ৯২৲ করিয়া পড়িয়াছিল। মিশনারী কলেজগুলি ২০০৲ হইতে ২৫০৲ টাকা মাথা পিছু ব্যয় করে।

সরকার কলেজগুলিতে সাহায্য করেন ; ইহার মধ্যে ১৯৩১-৩২ সালে ব্যয় হয় ১৪ লক্ষ টাকা ; ইহার মধ্যে ১২টি সরকারী কলেজে খরচ হয় ১১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। বেসরকারী কলেজ পায় ২,৫৬ হাজার ও অন্যেরা নানাভাবে পায় মাত্র ৮,২৩২৲ টাকা।

সাধারণ শিক্ষার পর বৃত্তি শিক্ষা আলোচ্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ল-কলেজ, মেডিকেল কলেজ ও শিক্ষা কলেজ আছে।

ওকালতী করিতে হইলে আইন পরীক্ষা পাশ করিতে হয়। গ্রাজুয়েট হইবার পর তিন বৎসর আইন কলেজে পড়িতে হয় ; ইউনিভার্সিটি স্বয়ং

ল-কলেজ চালান; এছাড়া রীপন কলেজে ও গৌহাটিতে কটন কলেজে ল-ক্লাশ আছে। ঢাকা বিশ্ববিত্থালয়েও ল-ক্লাশ আছে। তাহা ঐ বিশ্ববিত্থালয়ের অধীন।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ও কারমাইকেল কলেজে I.Sc. পাশ করিয়া ঢুকিতে হয় ও ছয় বৎসর পড়িয়া M. B. উপাধি লাভ করা যায়; ইহা ইউনিভার্সিটি দেয়। অধুনা School of Tropical Medicine and Hygiene খোলা হইয়াছে। ১৯৩২ সালে এই তিনটি কলেজে ১৬১৬ ছাত্র ছিল।

কলেজ ছাড়া ৯টি মেডিকেল স্কুল বাঙলাদেশে আছে। ইহার পরীক্ষা মেডিকেল বোর্ড গ্রহণ করেন; ইউনিভার্সিটির সহিত সম্বন্ধ নাই। কলিকাতা মেডিকেল কলেজ ও কারমাইকেল কলেজ পরীক্ষা বিষয়ে বিশ্ববিত্থালয়ের অধীন। কিন্তু মেডিকেল স্কুলগুলি সার্জন জেনারেলের তত্ত্বাবধানে আছে, বিশ্ববিত্থালয়ের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধে নাই। বাঙলায় ৯টি মেডিকেল স্কুল আছে, ইহার মধ্যে তিনটি কলিকাতায়—ক্যাম্পবেল্, ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল ও ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুল। মফঃস্বলে ৬টি আছে যথা,—ঢাকা মেডিকেল স্কুল, মৈমনসিংহে লীটন মেডিকেল স্কুল, বর্দ্ধমানে রোনাল্ড্‌শে স্কুল, চট্টগ্রাম মেডিকেল স্কুল, জলপাইগুড়ির জ্যাকস্‌ন স্কুল ও বাঁকুড়া সম্মিলনী স্কুল। এই নয়টি বিত্থালয়ে ১৯৩২-৩৩ সালে ছাত্র-সংখ্যা ছিল ২৯৪৭।

পশু চিকিৎসার জন্য একটি কলেজ বেলগাছিয়ায় আছে; ইহা কৃষিবিভাগের অন্তর্গত; বিশ্ববিত্থালয়ের সঙ্গে ইহার কোনো যোগ নাই।

১৯৩৫ সালে কলিকাতার মেডিকেল-কলেজ-শতবার্ষিকী উৎসব হয়। আমরা এই কলেজের ইতিহাস নিম্নে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। তাহার পূর্বে ১৮২২ সাল হইতে মেডিকেল স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল এবং বঙ্গভাষায় সেই সময় শিক্ষা দেওয়া হইত। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে একটি মেডিকেল ক্লাশ প্রতিষ্ঠা হয় এবং শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় সেই সময় ডাক্তারী শিক্ষা দেওয়া হইত। য়ুরোপীয় ধারা অনুসারে য়ুরোপীয় চিকিৎসা ও ঔষধ প্রণালী সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হইত। সেই বৎসরেই মাদ্রাসাতেও এইরূপ একটি মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠা হয় এবং আরবী ও উর্দ্দু ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়। পাশ্চাত্য মেডিকেল শাস্ত্র প্রণালীতে এদেশে শিক্ষা দেওয়া ইহাই প্রথম।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হয়। তিনি একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেন এবং তাঁহাদের রিপোর্ট অনুসারে ২৮শে জানুয়ারী ১৮৩৫ সালে গবর্ণমেণ্ট একটি আদেশ জারি করেন এবং তাহাতে এই সমস্ত বিভিন্ন স্কুল তুলিয়া দিয়া মেডিকেল কলেজ স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। এই নূতন ব্যবস্থা অনুসারে সম্ভবত ১লা জুন ১৮৩৫ সালে মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়।

পূর্বে শব-ব্যবচ্ছেদ শিক্ষা দেওয়া হইত মৃত জন্তুকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া। মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হইবার পর প্রথম এবং সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই—নরদেহ-ব্যবচ্ছেদ। পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী প্রথম শব ব্যবচ্ছেদ করেন। বাঙালীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই কার্যে অগ্রসর হন। ব্যবচ্ছেদের সময় ফোর্ট উইলিয়ম হইতে তোপ্‌ধ্বনি হইয়াছিল।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ৩০টি বেড লইয়া একটি ক্ষুদ্র ক্লিনিক্যাল হাসপাতাল এবং একটি আউটডোর ডিসপেন্সারী খোলা হয়।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজের ৪ জন ছাত্র সর্বপ্রথম উচ্চ শিক্ষা এবং ডিগ্রি লইবার জন্য য়ুরোপে যাত্রা করেন এবং লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে প্রবিষ্ট হন। তাঁহাদের নাম ভোলানাথ বসু, গোপালচন্দ্র শীল, দ্বারকানাথ বসু এবং সূর্যকুমার চক্রবর্তী। দ্বারকানাথ ঠাকুর, মুর্শিদাবাদের নবাব এবং ডাঃ গুদিভ ইঁহাদের অর্থ-সাহায্য এবং অন্য সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহাদের মধ্যে তিনজন শেষ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং ডাক্তার বি. এন. বসু এম. ডি. ডিগ্রি প্রাপ্ত হন।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বাবু মতিলাল শীল মেডিকেল কলেজের পার্শ্বে একখণ্ড ভূমি মেডিকেল কলেজকে দান করেন। সেই ভূমির উপর বর্তমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নির্মিত হয় এবং ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর লর্ড ডালহৌসী উক্ত হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপন করেন।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ৫০ জন ছাত্র লইয়া একটি বাঙলা ক্লাশ স্থাপিত হয় এবং ডাঃ মধুসূদন গুপ্ত প্রথম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং এনাটমির লেকচারার হন।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উদ্বোধন

হয় এবং তাহাতে ৩৫০ জন রোগী রাখিবার ব্যবস্থা হয়। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, য়ুরোপীয় রোগীদের আহারের জন্য মাসিক ৭৲ টাকা এবং ভারতীয়দের জন্য মাত্র ২৲ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এন্ট্রেন্স পাশ করিলেই মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করা যাইত ; ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ফার্ষ্ট আর্টস পাশ করিলে মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করা যাইবে—এই নিয়ম করা হয়।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে সর্বপ্রথম ভারতীয় নারীগণকে নার্সিং-এর কার্য শিখাইবার জন্য মেডিকেল কলেজে লওয়া হয় এবং দশজন শিক্ষার্থিনী হিসাবে যোগদান করেন। সেই সময় একজন মেট্রন এবং ১৩ জন নার্স কলেজে ছিল।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজে প্রথম ছাত্রী লইবার ব্যবস্থা করা হয় এবং ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্তা কাদম্বিনী গাঙ্গুলী প্রথম মহিলা ছাত্রী হিসাবে মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হন। সেই সময় গ্রেট ব্রিটেনের কোনো মেডিকেল কলেজেই কোন ছাত্রী প্রবিষ্ট হয় নাই।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে চুণীলাল শীল ডিস্‌পেন্সসারীর উদ্বোধন হয়।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে Children ওয়ার্ড খোলা হয়।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইডেন হাসপাতাল খোলা হয়।

আইসোলেশন ব্লক এবং হাসপাতালের নির্মাণ কার্য ১৮৯৪ সালে শেষ হয়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এজরা হাসপাতাল এবং ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামাচরণ ল চক্ষু হাসপাতালের উদ্বোধন হয়।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মেডিকেল কলেজ হইতে উত্তীর্ণ গ্রাজুয়েটগণকে এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জেন এবং বাঙলা ক্লাশ হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে হাসপাতাল এসিষ্ট্যাণ্ট আখ্যা দেওয়া হয়।

মাত্র দুইজন শিক্ষক লইয়া প্রথম মেডিকেল কলেজ আরম্ভ হয়। কিন্তু বর্তমানে ১৭ জন অধ্যাপক আছেন! তাহা ছাড়া এসিষ্ট্যাণ্ট প্রফেসার ও লেকচারারও অনেক আছেন।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া প্রিন্স অব্‌ ওয়েলস্‌ হাসপাতাল নির্মিত হয়।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ট্রপিক্যাল স্কুলের ভিত্তি স্থাপন হয় এবং ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহার উদ্বোধন হয়।

রায় বলদেও দাস বিরলার বদান্যতায় যক্ষ্মা হাসপাতাল স্থাপিত হয়।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে নূতন চক্ষু হাসপাতাল নির্মিত হয়।

বর্তমানে হাসপাতাল এবং কলেজ ৮৮ বিঘা জমির উপর স্থাপিত এবং হাসপাতালে এখন ৭৭৬টি বেড্ আছে। *

ইঞ্জিনীয়ারিং শিখাইবার জন্য ইউনিভার্সিটির অধীন মাত্র একটি কলেজ আছে শিবপুরে। এখান হইতে B. E. উপাধি দেওয়া হয়। এছাড়া অন্যান্য সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। এছাড়া ঢাকায় আসানুল্লা ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল ও ত্রিপুরা ময়নামতীতে বেঙ্গল সার্ভে স্কুল আছে; এগুলি গবর্মেণ্ট-চালিত। ইউনিভার্সিটির সহিত কোনো যোগ নাই।

গবর্মেণ্ট আর্ট কলেজ আছে; সেখানে কোনো ডিগ্রি নাই; ইউনিভার্সিটির সহিত ইহার কোনো যোগও নাই। বাঙলার নানা জায়গায় সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত বা বেসরকারী বৃত্তিশিক্ষার বিদ্যালয় আছে। সেগুলির সহিত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বা শিক্ষাবিভাগের কোনো সম্বন্ধ নাই।

শিক্ষাবৃত্তি শিক্ষার জন্য বাঙলাদেশে দুটি কলেজ আছে; ডেভিড্ হেয়ার ট্রেনিং কলেজ কলিকাতায় ও ট্রেনিং কলেজ ঢাকায়। এখানে গ্রাজুয়েটদের B. T. উপাধি দেওয়া হয়, আণ্ডার গ্রাজুয়েটদের L. T ডিগ্রি দেওয়া হয়। এছাড়া সাধারণ স্কুলের নিম্নতন শিক্ষকদের জন্য ৫টি নর্মাল স্কুল আছে।

পাঠশালার পণ্ডিতদের শিক্ষার জন্য ৮৬টি গুরু মুয়ালিম্ ট্রেনিং স্কুল আছে। কলেজ ও পাঠশালার মধ্যে তিন শ্রেণীর বিদ্যালয়কে মধ্য শিক্ষা বলে। সেকেণ্ডারী স্কুলগুলি শিক্ষাবিভাগের অধীন, পরীক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর নির্ভর।

সেকেণ্ডারী স্কুল বলিলে বুঝায়—

(১) হাইস্কুল বা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়; সেখানে প্রবেশিকার জন্য ছাত্র প্রস্তুত হয়। ইহার সংখ্যা ১০৮৯ (১৯৩১-৩২)।

* আনন্দবাজার পত্রিকা ১৫ই মাঘ ১৩৪১।

(২) মধ্য ইংরেজি স্কুল ; এই শ্রেণীর স্কুল হাইস্কুল হইতে অধিক। সংখ্যা ১৮৯৬।

(৩) মধ্য বাঙলা বিদ্যালয়। এই শ্রেণীর স্কুল লোকে পছন্দ করে না ; এবং ক্রমশই হ্রাস পাইতেছে ; সংখ্যা ৬৬টি।

হাইস্কুলগুলি ছাত্রকে কলেজের জন্য প্রস্তুত করিয়া দিবে, ইহাই উদ্দেশ্য ও আদর্শ। ১৯৩০ সালে গবর্মেণ্ট-চালিত সেকেণ্ডারী স্কুলের সংখ্যা ৫০টি ; সাহায্য-প্রাপ্ত স্কুল ৫২২ ; বেসরকারী ৫১৭।

১৯৩০-১৯৩১ সালে ১০৭৬টি হাইস্কুলে ২,৫৬ হাজার ছাত্র ছিল। ১৮৭৫টি মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে ১,৭৭ হাজার ; ৫৪ মধ্য বাঙলা স্কুলে ৩,৯৮৬, এই মোট ৪৩৬৯৮৬ জন ছাত্র পড়িত।

হাইস্কুলগুলি ডিভিশনাল ইন্সপেক্টরগণ পরিদর্শন করেন ; অন্য স্কুল জেলা ইন্সপেক্টররা।

উচ্চ শিক্ষার ন্যায় মধ্য শিক্ষাও অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িতেছে ; বিদ্যালয়ের বেতন ও পরীক্ষার ফী বৃদ্ধি পাইয়াছে।

প্রাথমিক শিক্ষা

ভারতীয় সাহেবদের ছেলে, মেয়েদের জন্য সকল শ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯৩১ সালে ৫৯,৭০৭ ; এইসব পাঠশালায় ২০,৫২ হাজার ছাত্রছাত্রী পাঠ করিত। ইহার ব্যয় ৮১,৬৫ হাজার টাকা। বাঙালী ছেলেদের প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা ৪৩,৭১৮ ; ইহার মধ্যে সরকারী স্কুল ৮৩, জেলাবোর্ডের দ্বারা পরিচালিত ৪২১১, সাহায্য-প্রাপ্ত ৩৪,৭১৯, বেসরকারী ৪,৯০৫। মেয়েদের স্কুলের কথা পরে দিব।

প্রাথমিক বালক বিদ্যালয়ে ৭ লক্ষের উপর হিন্দু ছাত্র, ৯ লাখের উপর মুসলমান ছাত্র পড়ে। শিক্ষার আর কোনো বিভাগে মুসলমানদের প্রাধান্য দেখা যায় না। দেশীয়দের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্যয় ৬৬ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে ৫২·২৭% ভাগ টাকা পাবলিক তহবিল হইতে ও ৪৭·০% অন্যভাবে পাওয়া গিয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষা প্রচার বিষয়ে কলিকাতা কর্পোরেশন খুবই অগ্রসর হইয়াছে।

প্রাথমিক শিক্ষা দুই ভাগে বিভক্ত—আপার প্রাইমারী বা উচ্চ প্রাথমিক ও লোয়ার প্রাইমারী বা নিম্ন প্রাথমিক। এইসব বিদ্যালয়ে সাহায্যের টাকা জেলাবোর্ড দান করেন। গবর্মেণ্ট জেলাবোর্ডকে দেন; জেলাবোর্ড সেই টাকা ও নিজ তহবিল হইতে কিছু টাকা এইসব পাঠশালায় দিয়া থাকেন। প্রায় ৬৭ লক্ষ টাকা এই ভাবে বার্ষিক ব্যয় হয়।

১৯৩১-৩২ সালে—

প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে	...	২২,২৩ হাজার
জেলাবোর্ড	...	৭,২২ ,,
ম্যুন্সিপালটি	...	৬,৮৮ ,,
ফী বা মাহিনা	...	২৪,১৭ ,,
বিবিধ	...	৬,৬২ ,,

মোট ৬৬,৯৫, হাজার টাকা

প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাদি পরিদর্শনের জন্য কয়েক বৎসর পূর্বে বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর ভার দেন। এই প্রস্তাব অনুসারে প্রত্যেক পঞ্চায়েৎ ইউনিয়ানে একটি করিয়া পাঠশালা স্থাপিত হয়। পাঠশালা নির্মাণাদির জন্য গবর্মেণ্ট এককালীন এক হাজার টাকা দিতেন ও শিক্ষকের বেতনের টাকা দিতেন। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড তদারক করিতেন ও মেরামতী খরচের ⅓ অংশ এবং স্বয়ং সরকার বাহাদুর ⅔ অংশ বহন করিতেন: এই ব্যবস্থানুসারে ৪০০০ পাঠশালা খোলা হয়; ১৯২২ সালের পর পঞ্চায়েতী পাঠশালা আর খোলা হয় নাই।

তারপর ঢাকা ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ বিস্ (Bies) প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব করেন। তাঁহার প্রস্তাবানুসারে পাঠশালা স্থাপনের অর্দ্ধেক খরচ গবর্মেণ্ট ও অর্দ্ধেক ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড ও ম্যুন্সিপালটি বহন করিতেন। বিস্ সাহেবের প্রস্তাবানুযায়ী মাত্র ২৫০ পাঠশালা স্থাপিত হয়।

ইহার পর ১৯৩০ সালে শিক্ষা সর্বসাধারণে প্রসার করিবার জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব হয় ও সেই উদ্দেশ্যে নূতন কর স্থাপনেরও প্রস্তাব হয়। কিন্তু আর্থিক দুরবস্থা হেতু সে প্রস্তাব বর্তমানে স্থগিত আছে।

বর্তমানে গবর্মেণ্ট আর একটি প্রস্তাব করিয়াছেন। এই পরিকল্পনানুসারে জেলাবোর্ডগুলি তাহাদের অধীন স্কুলগুলির কর্তৃত্ব ও পরিচালনার ভার 'ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল বোর্ড' নামে একটি নূতন প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন; ইহা সরকারী বোর্ড। গবর্মেণ্ট প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে টাকা ব্যয় করেন, তাহাও এই বোর্ডের হাতে দেওয়া হইবে। সাতটি জেলায় ২৫,০০০ পাঠশালা এই 'জেলা স্কুল বোর্ডে'র তত্ত্বাবধানে চলিতেছে।

স্ত্রী শিক্ষা

বাঙলাদেশে ৩ কোটি ১০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ২ কোটি ৪৫ লক্ষ নারী; এই নারীদের মধ্যে ২,৩৮ লক্ষ নিরক্ষর; মাত্র ৬,৬৪ হাজার লিখিতে পড়িতে জানে এবং তাহার মধ্যে মাত্র ৯১ হাজর ইংরেজি জানে; কিন্তু সাত বছরের নীচে যারা পাঠশালায় আছে, তাদের বাদ দিলে মাত্র ২,২৩ হাজারের প্রাইমারী শিক্ষার মত বিদ্যা আছে বলা যায়। সাত বছরের অধিক বয়স্কা মুসলমান বালিকা ও নারীদের মধ্যে মাত্র ৬১ হাজার ও হিন্দু মেয়েদের মধ্যে মাত্র ১,৩৮ হাজার লিখিতে পড়িতে পারে।

	১৯২১	১৯৩১	দশবৎসরে শতকরা বৃদ্ধি
বৃটীশ বাঙলায় নারীর সংখ্যা	২,২৫,৪৪ হাজার	২,৪০,৭২ হাজার	১
লেখাপড়া জানে শতকরা	১.৮	২ ৮	
বাঙলার নিরক্ষর নারীর সংখ্যানুপাত	৯৮ ২	৯৭.২	

বাঙলা সরকারের বিবরণ

বাঙলা সরকার হইতে বাঙলায় স্ত্রী শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে নিম্নোক্ত মর্মে এক বিবরণ ১৫ই জানুয়ারী ১৯৩৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে—

১৯৩২-৩৩ সনের শেষে বাঙলায় ভারতীয় বালিকাদের সকল প্রকার বা সকল শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা ছিল ১৮,৫৩৮টি। এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫০০,৩০৭টি বালিকা অধ্যয়ন করিয়াছে, বালকদের স্কুলে যে সকল বালিকা অধ্যয়ন করে, তাহাদিকে লইয়া অধ্যয়ন-নিরত বালিকাদের মোট সংখ্যা

ছিল ৬০২,৩৬১টি ; ইহার ২৫৬,০৮৭টি মেয়ে হিন্দু এবং ৩৩৫,১০৫টি মেয়ে মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত।

অর্থ ব্যবস্থা

বালিকাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি চালাইবার খরচ নিম্নোক্তরূপ পড়িয়াছে,—বালিকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য ১৯৩১-৩২ সালে খরচ পড়িয়াছে ২৯,৩৯,৩০০ টাকা; ১৯৩২-৩৩ সালে পড়িয়াছে ২৯,৭৩,২১৪ টাকা। জনসাধারণের নিকট হইতে ১৯৩১-৩২ সালে ১৬,৭৮,১৪৭ টাকা এবং ১৯৩২-৩৩ সালে ১৭,০৭,১০৪ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি চালাইবাব খরচ নিম্নোক্তরূপ পড়িয়াছে,—

কলেজ সমূহের জন্য ১৯৩১-৩২ সালে ১,৪৮,৫৯৬ টাকা; ১৯৩২-৩৩ সালে ১,৪৮,৬৮০ টাকা, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহের জন্য যথাক্রমে ৭,৭৩,৬১১ ও ৭,৮৬,৩৫০ টাকা; মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহের জন্য যথাক্রমে ২,৯৯,৯৭০ ও ২,৯৭,৬৮৮ টাকা; এম. ভি. স্কুলসমূহের জন্য যথাক্রমে ৩৮,৩৪৫ ও ৩৫,৪৬৩ টাকা; ট্রেনিং স্কুলসমূহের জন্য যথাক্রমে ৮৪,০৫২ ও ১,২৮,৬১২ টাকা; প্রাইমারী স্কুলসমূহের জন্য যথাক্রমে ১৪,২৭,০০০ ও ১৪,৬৫,৬০৬ টাকা; স্পেশ্যাল স্কুলসমূহের জন্য যথাক্রমে ১,৬৭,৭২৬ ও ১,১০,৮২০ টাকা অর্থাৎ যথাক্রমে মোট ২৯,৩৯,৩০০ ও ২৯,৭৩,২১৪ টাকা।

বালক ও বালিকাদিগের জন্য খরচের হার

আর্টস্ কলেজসমূহে বালকদের জন্য মাথাপিছু খরচ হয় ১৬৩'৩ টাকা, মেয়েদের জন্য মাথাপিছু খরচ হয় ২৮০ টাকা, হাই স্কুলসমূহে প্রতি বালকের জন্য ৩৮'৪ টাকা, প্রতি মেয়ের জন্য খরচ হয় ৮'৪৬ টাকা। মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়সমূহে খরচ হয় যথাক্রমে ১৭'৬ ও ৩৭'৯ টাকা, প্রাইমারী স্কুলসমূহে খরচ হয় যথাক্রমে ৩ ৮ ও ৩'২ টাকা ও স্পেশ্যাল বিদ্যালয়সমূহে যথাক্রমে ৩২০'৯ টাকা ও ১১২'৫ টাকা।

মেয়েদের কলেজের শিক্ষা

বালিকাদের আর্টস্ কলেজের মধ্যে কলিকাতার বেথুন কলেজ ও ঢাকার

ইডেন ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ সোজাসুজি সরকারের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত। ১৯৩৩ সনে মেয়েদের কলেজসমূহে ছাত্রী-সংখ্যা ৫০৮ জন হইয়াছিল, এতদ্ব্যতীত পুরুষদের আর্টস্ কলেজসমূহে ও ইউনিভার্সিটি ক্লাশসমূহে ৩৪৬ জন বালিকা ঐ বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছেন। কলিকাতার আশুতোষ কলেজ ও বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ মেয়েদের জন্য ক্লাশ খুলিয়াছেন। ১৯৩২ সালের আগষ্ট মাসে সরকার কৃষ্ণনগর কলেজে ছাত্রী গ্রহণ করিবার প্রস্তাব অনুমোদন করেন। বাঙলার কলেজসমূহের শিক্ষাদানের কৃতিত্ব এই যে, দিন দিন অধিকতর বেশী সংখ্যায় মেয়েরা কৃতিত্বের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহে উত্তীর্ণ হইতেছেন।

মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষা

মেয়েদের উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়সমূহের সংখ্যা ১৯২৭ সন হইতে ১৯৩৩ সনে ১৯ হইতে ৩৯এ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে অর্থাৎ এই অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে দ্বিগুণেরও বেশী হইয়াছে, তন্মধ্যে ৫টি সরকারী কর্তৃত্বে, ৩০টি সরকারী সাহায্যে ও বাকীগুলি বে-সরকারী কর্তৃত্বাধীনে সরকারী সাহায্য ব্যতীতই পরিচালিত। ১৯২৬-২৭ সালে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহের ছাত্র-সংখ্যা ছিল ৫,৮০১ জন আর ১৯৩২-৩৩ সনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ১১,৪৫২ জনে। ১৯৩২ সালে ৬০৮ জন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিলেন; তন্মধ্যে ৩৯৪ জন উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ১৯৩৩ সনে ৮১৩ জন মেয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছেন এবং পাশ করিয়াছেন ৫৪৭ জন। মেয়েদের শিক্ষা ব্যাপারে মেয়েদের মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহের স্থান সর্ব্বাগ্রে, কেননা অধিকাংশ বালিকাই মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ের সীমা অতিক্রম করিয়া যান না। ১৯৩২-৩৩ সাল হইতে মেয়েদের জন্য মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৮ হইতে ৫৭তে নামিয়াছে; তথাপি ছাত্রী-সংখ্যা ৮,২০৮ হইতে ৯,৮৩তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সরকার প্রত্যেক জেলায় ও মহকুমায় মেয়েদের মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠার জন্য যত্নবান্ হইয়াছেন। তবে তাহা পর্যাপ্ত নহে।

মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা

বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত হিসাবে দেখা যায়, বালিকাদের

প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সংখ্যা ১৯২৬-২৭ সালে ছিল ১৪,৬০৫টি, ১৯৩২-৩৩এ হইয়াছে ১৮,০৬৭টি ; ছাত্রী-সংখ্যাও যথাক্রমে ৩৪৭,২৭০ হইতে ৫৬৩,৩৫৮ জনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মেয়েদের প্রাইমারী স্কুল ছাড়া অপরাপর স্কুলের ঐ বয়সের মেয়েদের সংখ্যা ঐ সময়ে যথাক্রমে ৪০৬,১৩৭ হইতে ৫৮০,৩০৯তে বাড়িয়া গেলেও বালকদের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির সহিত তুলনা করিলে এই উন্নতি সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হয় না।

গত দুই বৎসরের হিসাবে দেখা গিয়াছে, যেস্থলে ২১৬,৪৫৫টি বালক প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিয়াছে, সেক্ষেত্রে মাত্র ১৭,০৪৯টি বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা পাইয়াছে।

অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাঙলায় বালিকাদের স্কুলের সংখ্যা অনেক বেশী। ১৯২৬-২৭ সনে সমগ্র বৃটিশ ভারতে বালিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল ২৬,৬৮২টি ; তন্মধ্যে এক বাঙলায়ই ছিল ১৪,৬১২টি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়সমূহের মারফৎ সন্তোষজনক কাজ না হইবার অনেকগুলি কারণ আছে। যথা—অধিকাংশ প্রাথমিক বাঙলা বিদ্যালয়ই একজন মাত্র শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত এবং সেই শিক্ষকও অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষ। ১৯৩২ সনে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষয়িত্রীদের সংখ্যা মাত্র ৫১৮৩ জন ছিল। অর্থাৎ তিনটি স্কুল পিছু একজন শিক্ষয়িত্রী মাত্র। তারপর এইসকল বিদ্যালয়ের জন্য বৎসর বৎসর যে অর্থ ব্যয় করা হয়, তাহাও পরিমাণে অত্যল্প—মাসে ৭ টাকার কম।

স্ত্রীশিক্ষার প্রসার

একথা নিঃসন্দেহে ধরিয়া লইতে পারা যায় যে, শিক্ষাবিষয়ক যে-কোনো পরিকল্পনার মধ্যেই নারী-শিক্ষা-প্রশ্ন সর্ব্বাগ্রে গণ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। জাতিকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইলে স্ত্রী-শিক্ষাই তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা নিশ্চিত পন্থা।

১৯২১ সনে বাঙলায় মেয়েদের সংখ্যা ছিল ২,২৫,৪৪,০০০ জন ; তন্মধ্যে লিখন-পঠনক্ষম ছিল শতকরা ১'৮ জন। ১৯৩১ সনে মেয়েদের সংখ্যা ছিল ২,৪০,৭২,০০০ জন এবং তন্মধ্যে লিখন-পঠনক্ষম ছিল শতকরা ২'৮ জন। ১৯২৬-২৭

সনে যে-বৎসর শেষ হইয়াছিল, উহাতে মেয়েদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা শতকরা ১৭.৯টি বাড়িয়াছে, আবার ১৯৩২ সনে যে ৫ বৎসর শেষ হইয়াছে, উহাতে মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা শতকরা ১৯টি বাড়িয়াছে। পরবর্তী ৫ বৎসর কাল মধ্যে শিক্ষা-নিরত মেয়েদের সংখ্যা শতকরা ৩১.৯টি হিসাবে বাড়িয়াছে।

মুসলমান মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার

মুসলমান মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের গতি অতিশয় ধীর, ১০০ জন মুসলমান মেয়ের মধ্যে মাত্র ১টি মেয়ে লিখন-পঠনক্ষম।

বালক ও বালিকাদের শিক্ষা ব্যবস্থার তুলনা

বালক ও বালিকাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করিলে দেখা যায়,—১৯৩২ সালে যে ৫ বৎসর শেষ হইয়াছে, ঐ সময় মধ্যে পুরুষদের শিক্ষার ব্যয় ১৮½ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে, মেয়েদের শিক্ষা ব্যয় বাড়িয়াছে মাত্র ৬½ লক্ষ টাকা। বালিকাদের জন্য যে কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে, বালকদের জন্য হইয়াছে তাহার দ্বিগুণ। ছাত্রী-সংখ্যা যে স্থানে দুইজন বাড়ে, ছাত্র-সংখ্যা সে স্থানে বাড়ে ৫ জন। উচ্চ শিক্ষার দিকে অগ্রসর হইলে এই বৈষম্য আরও তীব্র আকারে দেখা দেয়। প্রাথমিক শিক্ষার গণ্ডীতে গড়ে যে স্থলে ১০ জন পুরুষ ছাত্র, সে স্থলে ৩ জন মেয়ে ছাত্র, তাহার উপরের গণ্ডীতে যে স্থলে ২৪ জন পুরুষ ছাত্র, সে স্থলে ১ জন মেয়ে ছাত্র এবং ততোধিক উচ্চ স্তরে যে স্থলে ৩০ জন পুরুষ ছাত্র, সে স্থানে মাত্র ১টি মেয়ে ছাত্রকে দেখা যায় না। ১৯৩১-৩২ সনে আর্টস্ কলেজসমূহে ছাত্রী-সংখ্যা ছিল ৭১২ জন, আর ছাত্র-সংখ্যা ছিল ২০,৯১২ জন। তারপর ব্যবসায়াত্মক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যথা—ডাক্তারী, শিক্ষকতা ইত্যাদিতে যদিও বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, তথাপি পুরুষের তুলনায় মেয়ে ছাত্র-সংখ্যা নগণ্য। ১৯৩১-৩২ সনের শেষের দিকে মেডিকেল স্কুল ও কলেজসমূহে মেয়ে ছাত্র-সংখ্যা ছিল মাত্র ৪১ জন; আর পুরুষ শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৭৭ জনেরও বেশী।

শিক্ষয়িত্রীর অভাব

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যথেষ্ট পরিমাণ মেয়ে শিক্ষক সরবরাহের উপর

স্ত্রীশিক্ষা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। নীচের দিকে মেয়ে-শিক্ষকদের নিকট হইতেই বিশেষত মেয়েদের স্কুলে ভাল কাজ পাওয়া যায়। কিন্তু মেয়ে-শিক্ষকের সংখ্যা এত কম যে, প্রতি ৪টি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য মাত্র ১ জন করিয়া শিক্ষয়িত্রী পাওয়া যায়। ১৯৩১-৩২ সনে নারী-শিক্ষকের সংখ্যা ছিল মাত্র ৬,৪৬৯ জন। সুখের বিষয়, নারী-শিক্ষার প্রতি সকলেরই দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সরকারের আর্থিক অসঙ্গতি নারী-শিক্ষা উন্নতির গতি প্রতিহত করিতেছে। ছাত্র-বেতন হইতে আয় ১১½ লক্ষ হইতে ১৪¾ লক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আশা করি, নারী-শিক্ষা বিষয়ে বাঙলা ক্রমেই অধিকতর দ্রুত গতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

মুসলমান শিক্ষা

সাধারণ বিদ্যালয়ে ও কলেজে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, অন্ত্যজ, বাঙালী, অ-বাঙালী, আদিম সকলেই পড়িতে পারে ; তবুও তথাকথিত পশ্চাৎপদ বর্ণ ও জাতিদের জন্য গবর্মেণ্ট শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। মুসলমানদের শিক্ষা তদারক ও পরিচালনার জন্য একজন সহকারী মুসলমান ডিরেক্টর আছেন ; এছাড়া নানাভাবে তাহারা যাহাতে শিক্ষিত হয়, সে-বিষয়ে সরকার চেষ্টা করিতেছেন। এই চেষ্টার ফলে দেখা যাইতেছে যে, প্রাইমারী স্কুলে হিন্দু বালক-বালিকার সংখ্যা অপেক্ষা মুসলমানদের সংখ্যা অধিক। ইহা অত্যন্ত আনন্দের কথা—ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কিন্তু উপরে যতই উঠা যায়, ততই মুসলমান ছাত্র-সংখ্যা হিন্দুর অনুপাতে কমে। ইউনিভার্সিটিতে মাত্র শতকরা ১৩·৩%, বৃত্তি-শিক্ষায় ১২·৯%, হাই স্কুলে ১৮·৭%, মধ্য ইংরেজি স্কুলে ২৪·৭। প্রাথমিক পাঠশালায় ৫৪·৫, গড়ে ২৪·৮ হয়। দশ বৎসরে শতকরা গড়ে ৩।৪ জন করিয়া বাড়িয়াছে।

মুসলমানদের শিক্ষার জন্য তিন শ্রেণীর বিদ্যালয় আছে ; তাহাতে বাঙলা, পার্শী, আরবী, উর্দু ও গণিত প্রভৃতি শেখানো হয়।

(১) প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত—(ক) মকতব, (খ) কোরাণ স্কুল, (গ) মুয়ালিম ট্রেনিং স্কুল।

(২) মধ্য শ্রেণী মাদ্রাসা (মধ্য বাঙলা স্কুলের সমান)।

(৩) উচ্চ শ্রেণী বা উচ্চ মাদ্রাসা (উচ্চ ইংরেজী স্কুলের সমান)।

ইস্‌লামিয়া কলেজ; ইহার জন্য গবর্মেণ্ট ৯৩ হাজার টাকা ব্যয় করেন।

বাঙলাদেশে কতকগুলি মাদ্রাসা আধুনিকভাবে করা হইয়াছে; এগুলি ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট ও সেকেণ্ডারী বোর্ডের অধীন। কলিকাতার মাদ্রাসা প্রাচীন ধরণের; হিন্দুদের টোলের ন্যায়। গবর্মেণ্টের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষাদি গৃহীত হয়।

বর্তমানে শিক্ষাবিভাগে মুসলমানদিগকে উন্নত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে; বাঙালাদেশের শিক্ষা-রিপোর্টে দেখানো হইয়াছে মুসলমান ছাত্র ১৪ লক্ষ, বর্ণহিন্দু ৮,৬১ হাজার, অন্ত্যজ হিন্দু ৪,৪০ হাজার ইত্যাদি ১৯৩১-৩২ সালে পড়িতেছিল। ১৪ লক্ষ মুসলমানের মধ্যে ১২,৫৮ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে। সর্বশ্রেণীর শিক্ষকের শতকরা ৪৬·৮ জন এখন মুসলমান, ইন্সপেক্টর অফিসারও শতকরা ৫৪·২%।

১৯৩০-৩১ সালের মকতবশিক্ষা

বালকদের মকতব	১৫,৮৩২	ছাত্র	৫,৮০,৯৮৮
		ছাত্রী	২৩,৩২৯
বালিকাদের মকতব	৯,২০৯	ছাত্রী	২,০৭,৩০২
		ছাত্র	২,৪৬৮

বালকদের মকতবে ব্যয়—১৮,৪৮,১৭৮ টাকা

বালিকাদের মকতবে ব্যয়—৩,৩২,৯৩৪ টাকা

মোট ব্যয়—২১,৮১,১১২ টাকা

	বালকদের মকতব	বালিকাদের মকতব	মোট
	টাকা	টাকা	টাকা
সরকারী ব্যয় ...	৬,০১,৯৬৪	১,২৯,৯৮৮	৭,৩১,৯৫২
জেলাবোর্ডের ব্যয় ...	১,৭৭,৫০৩	৭৫,১৮৭	২,৫২,৬৯০
ম্যুন্সিপ্যালটির ব্যয় ...	৩৯,১৮৬	১৫,৫৬৩	৫৫,৭৪৯
মোট পাবলিক ফাণ্ড হইতে	৮,১৮,৬৫০	২,২০,৭৩৮	১০,৩৯,৩০১

		বালকদের মকতব টাকা	বালিকাদের মকতব টাকা	মোট
ফী আদায়	...	৭,৩৫,৩৩৪	২৬,২৭৬	৭,৬১,৬০৬
অন্যান্য আয়	...	২,৯৪,১৯৫	৮৫,৯২৩	৩,৮০,১১৮
		১৮,৪৮,১৭৮	৩,৩২,৯৩৪	২১,৮১,১১২

এই সঙ্গে তুলনীয়,—সংস্কৃত টোলের সংখ্যা মাত্র ৭৬১ ; ছাত্র-সংখ্যা ১১,৭২৮।

বাঙলার মুসলমানদের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দেখিলে বুঝা যায়, শিক্ষার জন্য এই সমাজে সাড়া পড়িয়াছে। কিন্তু চিন্তাশীল মুসলমানরা একটু চিন্তান্বিতও হইয়াছেন ; তাঁহারা মুসলমানী মকতব, কোরাণ স্কুল প্রভৃতির বৃদ্ধি, আরবী, উর্দু প্রভৃতি অবশ্য পাঠ্য বিষয় করার জন্য ভাবিত হইয়াছেন ; যে-সব উদার শিক্ষার দ্বারা মানুষের মন শৃঙ্খলমুক্ত হয়, তাহা ত' হইতেছে না। বরং প্রাচীন নিগড় মনের উপর চাপাইবার চেষ্টা চলিতেছে। শ্রীযুক্ত মোহম্মদ ওয়াজেদ আলী 'শিক্ষার কথা' নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। *

য়ুরোপীয়ের শিক্ষা

আমরা পূর্বে বলিয়াছি য়ুরোপীয় ও য়ুরেশিয়দের শিক্ষা স্বতন্ত্র। ইহাদের জন্য ৬৮টি স্কুল আছে ; ইহার মধ্যে ৪টি বিশেষ বিষয় শিক্ষাদানের জন্য, অপরগুলি সাধারণ বিদ্যাশিক্ষার নানাশ্রেণীর বিদ্যালয়। এই সব বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৯৩১-৩২ সালে ১১,৫৮৬। বিদ্যালয়গুলির ব্যয় ৩৬ লক্ষ টাকা ; ইহার মধ্যে গবর্মেণ্ট ৯ লক্ষ ও ম্যুন্সিপ্যালটি ৩২ হাজার টাকা দান করেন। সেকেণ্ডারী স্কুলে মাথাপিছু য়ুরোপীয় ছাত্রের খরচ ১৪৫৲ টাকা ; প্রাইমারী স্কুলে মাথাপিছু ৯৫৲ টাকা। বাঙালীদের ছেলেদের স্কুলে ৪০·৭ টাকা, প্রাইমারীতে ৪·১ টাকা খরচ হয়। য়ুরোপীয় ২০টি হাই স্কুলে সরকারী দান ২,৭০ হাজার ও লোকাল গ্রাণ্ট ৯,৬৮২ টাকা ; ছাত্র সংখ্যা ৫৪৭৩। হাই স্কুলের প্রত্যেক য়ুরোপীয় ছাত্রের জন্য বাঙলা গবর্মেণ্ট প্রায় ৮২৲ টাকা ব্যয় করেন। বাঙালী ছেলেদের হাই স্কুলে সরকারী ও লোকাল দান মাথাপিছু ৭·২ টাকা। হাই স্কুলে য়ুরোপীয় মেয়েদের জন্য সরকারী ব্যয় ৫৪৲ টাকার

* বুলবুল ২য় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩৪১, পৃঃ ২৯-৪২।

উপর; বাঙালী মেয়ের হাই স্কুলে মাথাপিছু সরকারী ও লোকাল ব্যয় ৩৮'৪ টাকা।

প্রাইমারী স্কুলে য়ুরোপীয় ছাত্রদের মাথাপিছু ব্যয় ২৭৲ টাকা, দেশী স্কুলে ১'৪ টাকা, লোকাল দান ধরিলে ১'৮ টাকা! প্রাইমারী স্কুলে য়ুরোপীয় ছাত্রীদের জন্য মাথাপিছু সরকারী ও লোকাল ব্যয় হয় প্রায় ৫৪৲ টাকা, আর বাঙালী মেয়েদের প্রাইমারী স্কুলে পড়ে ২'৪ টাকা।

বাঙলাদেশের য়ুরোপীয় শিক্ষাদান ব্যাপার দেশীয় মন্ত্রীর হাতে নহে। ইহা রক্ষিত বিষয়। ডিরেক্টর বাহাদুরের অধীন একজন বিশেষ কর্মচারী য়ুরোপীয়দের শিক্ষার তদারক করেন; তাঁহার উপর শিক্ষামন্ত্রীর কোনো এক্তিয়ার নাই।

নানাবিধ শিক্ষা

শিক্ষাবিভাগ বা ইউনিভার্সিটির অধীন নয় এমন কতকগুলি প্রতিষ্ঠান নানারূপ শিল্প শিক্ষা দিয়া থাকে। ইহার কতকগুলি গবর্মেণ্টের অধীন, কতকগুলি সম্পূর্ণ স্বাধীন। গবর্মেণ্ট-পরিচালিত শ্রীরামপুরের বয়ন বিদ্যালয়, পাবনা, বরিশাল, রঙ্গপুর ও বগুড়ার শিল্প-বিদ্যালয়, সার্বে বিদ্যালয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া অনেক সাহায্য-প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান আছে।

যাদবপুরের কলেজ অব্ টেক্‌নলজি সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ কর্তৃক ইহা পরিচালিত। আমরা পরিশিষ্টে এই সব প্রতিষ্ঠানের নাম দিয়াছি।

এসব ছাড়া অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, যেগুলি অন্তঃপুর-স্ত্রী-শিক্ষা ও শিল্প শিক্ষার কাজ করিতেছে; সরোজনলিনী শিল্পাশ্রম, বিদ্যাসাগর বাণীভবন, নারীশিক্ষাসমিতি দেশের অনেক কাজ করিতেছে।

বেসরকারী বিদ্যায়তনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী উল্লেখযোগ্য। বোলপুরের নিকটে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র ও সুরুলের শ্রীনিকেতনে পল্লী-সংগঠন কর্ম-কেন্দ্র। শান্তিনিকেতনে একটি বিদ্যালয়, নারীভবন, কলেজ, বিদ্যাভবন ও কলাভবন আছে। এখানে বিদ্যালয় ও কলেজে ছেলে ও মেয়ে একত্র পড়ে ও একস্থানে আহারাদি

করে। ছাত্র-ছাত্রীরা কোনো জাতিভেদ মানে না। বিদ্যাভবনে প্রাচীন ভারতীয়, ইস্লামীয়, বৌদ্ধ, জৈন, চৈনিক, তিব্বতীয় মধ্যযুগের সাধনা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা হয়। কলাভবনের অধ্যক্ষ নন্দলাল বসু ; তাঁহার চেষ্টায় ও গুণে এই প্রতিষ্ঠানটি জীবনলাভ করিয়াছে। পল্লীসংগঠনের উপর দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর ; এইজন্য রবীন্দ্রনাথ সুরুলের শ্রীনিকেতনের কার্যে বিশ্বাস করেন। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের আদর্শে অন্যস্থানে এইরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে।

বাঙালাদেশে ৫ হইতে ১৫ বৎসরের অন্ধ বালক-বালিকার সংখ্যা ৩৫২৭, মূক ও বধিরের সংখ্যা ১১০৭৫। কিন্তু বেহালা অন্ধ বিদ্যালয়ে মাত্র ৬৪টি বালক ও ১৪টি বালিকা আছে। কলিকাতার মূক ও বধিরদের স্কুলে প্রায় ২০০ ছাত্র থাকে ; এখানে এইসব ছাত্রদের শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষককে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। কলিকাতার বাহিরে অন্যান্য শহরের বিদ্যালয়ে তাঁহারা কাজ করেন।

ষোল বছরের নীচের অপরাধী ছেলেদের জেলে দেওয়া হয় না ; তাহাদের জন্য আলিপুরে একটি সংশোধনী ও শিক্ষাকেন্দ্র আছে। ইহা বর্তমানে ডিরেক্টর সাহেবের তত্ত্বাবধানে আসিযাছে। বাঁকুড়ায় Borstal School আছে ; সেটি পুলিশ বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেলের অধীন।

বাঙলাদেশের শিক্ষার ব্যয় লোকেই নানাভাবে বহন করে। সকল প্রকার শিক্ষার মোট ব্যয় হয় ৪,৩৯,৩১,০০০ টাকা ; এই টাকার শতকরা ৩৫ ভাগ গবর্মেণ্ট দেন, ৭ ভাগ জেলাবোর্ড ও ম্যুন্সিপালটি হইতে আসে, ৪২ ভাগ ছাত্রবেতন হইতে ও ১৬ ভাগ অন্যান্য উপায়ে পাওয়া যায়। বাঙলাদেশে গড়ে ছাত্রপিছু খরচ হয় ১৬৷৷০ টাকা ; সেইস্থানে য়ুরোপীয়দের মাথাপিছু ব্যয় ১২০৲ [Eigth Quinquennial Review on the Progress of Education in Bengal, 1927-32, p. 93 হইতে হিসাব করিয়া বাহির করা]। এখানে বলা প্রয়োজন, গবর্মেণ্ট যে টাকা দেন, তাহা সাধারণের তহবিল হইতে ; কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা হয় নাই।

বাঙলার জেলাবোর্ড বৎসরে ৩৬ লক্ষ টাকা শিক্ষার জন্য ব্যয় করে ; ইহার

মধ্যে ২১ লক্ষ গবর্মেণ্ট হইতে পাওয়া যায়; প্রাথমিক শিক্ষালয়গুলিতে অর্থ সাহায্যের ভার জেলাবোর্ডগুলির উপর অর্পিত; ম্যুন্সিপালটি, য়ুনিয়নবোর্ডও অর্থ ব্যয় করে।

এছাড়া খ্রীষ্টান মিশনারীরা প্রাইবেট স্কুলগুলিতে ও আশ্রমসমূহে বহু লক্ষ টাকা প্রতি বৎসর ব্যয় করেন।

শিক্ষার ব্যয়

১৯৩১		মোট ব্যয় (হাজার টাকা)	নানাবিভাগ হইতে শতকরা ব্যয় সরকারী	লোকাল ফাণ্ড	ফী	অন্যান্য	সংখ্যা	ছাত্র-সংখ্যা
শিক্ষাবিভাগ নিয়ন্ত্রণ	...	১৬,৪৫	৯৩·১	৬·২	—	·২		
ইউনিভার্সিটি	...	২৮,৯৮	৩৪·৯	—	৫০·২	১৪·৯	পুরুষ	পুরুষ ছাত্র
ঢাকা বোর্ড	...	৫১	৪৬·৬	—	৫৩·৪	—	১২৭৮	৫১,৪২৬
বিবিধ	...	৬২,৭৬					স্ত্রী	স্ত্রী ছাত্র
মোট	...	১,০৮,৭৬	৪৬·৮	৪·৩	২৮·২	২০·৭	৩১৮	১০,৬৭০
পুরুষদের বিদ্যালয়								
আর্টস্ কলেজ	...	৩৫,৩৭	৩৮·১	·১	৫২·২	৯·৬	৪৪	১৭,৮৪৭
বৃত্তিশিক্ষা	...	১৮,৮১	৬২·৪		২৯·৩	৮·৩	১৪	৫,০৮৬
হাইস্কুল	...	১,০৪,৭৫	১৮·২	·৩	৬৭·২	১৪·৩	১০৭৫	২,৫৭,৩১২
মধ্যস্কুল	...	২৯,১৪	৭·৫	১২·২	৫৯·৯	২০·৫	১৮৬৯	১,৬৯,৩০৬
প্রাথমিক	...	৬৬,৭২	৩২·৯	২০·৯	৩৬·২	১০·০	৪২,৭১৬	১৬,৩৪,৪৬৯
বিশেষ বিদ্যালয়	...	৪০,২৩	৪৬·১	৮·১	২৬·৬	১৯·২	৩,১১৮	১,২৬,১১৯
মোট	...	২,৯৫,০৬	২৯·৫	৭·৩	৬৯·৬	১৩·৬	৪৮,৮৩৮	২২.০৮,৯৭৪

নারীদের বিদ্যালয়

	মোট ব্যয় (হাজার টাকা)	সরকারী	লোকাল ফাণ্ড	ফী	অন্যান্য	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্রী-সংখ্যা
আর্টস্ ...	১,৫০	৭৪.৪		২৪.২	১.৪	৪	৩৪২
বৃত্তিশিক্ষা ...	৩০	৯৭.১		২.৯		৩	৪৭
হাই স্কুল ...	১৩,১১	৩৮.২	৪.৫	৪২.৭	১৪.৬	৫৯	১৪,৮১৫
মধ্য স্কুল ...	৩,১৪	৩২.৮	৯.৪	২৩.১	৩৪.৭	৬৪	৭,৯২৮
প্রাথমিক ...	১৪,৯৩	৩১.৭	৩৫.২	১০.৯	২২.২	১৬,৯৯১	৪,১৬,৫২৮
বিশেষ ...	২,৪৯	৪৮.৩	৫.৫	১৩.১	৩৩.১	৪৭	১,৮২৩
...	৩৫,৪৯	৩৭.৭	১৭.৩	২৪.৮	২০.২	১৭,১৬৮	৪,৪১,৪৮৩
মোট	৪,৩৯,৩১	৩৪.১	৭.৫	৪২.৬	১৫.৮	৬৭,৬৩৯	২৭,১২,৫৫৩

বিশ্ববিদ্যালয়ের দান, বৃত্তি ও অধ্যাপক

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ জ্ঞানালোচনার জন্য বহু বেসরকারী দান পাইয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

১। Tagore Law Professorship—১৮৬২ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুর ১০,০০০৲ বার্ষিক আয়ের ব্যবস্থা করিয়া আইন বিষয়ে অধ্যাপক নিয়োগের ব্যবস্থা করেন।

২। মিণ্টো প্রফেসর—অর্থনীতি। ১৯০৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চাশ বৎসরের জুবিলি উপলক্ষে গবর্মেণ্ট কর্তৃক ব্যবস্থা হয়। তৎকালীন বড়লাট লর্ড মিণ্টোর নামে এই পদ প্রতিষ্ঠিত হয়। বেতন বাৎসরিক ১২,০০০৲।

৩। পঞ্চম জর্জ প্রফেসর—মানসিক ও নৈতিক বিজ্ঞান বা দর্শন শাস্ত্র। ১৯১১-১২ সালে সম্রাটের ভারত ভ্রমণ ও অভিষেক স্মরণার্থ গবর্মেণ্ট কর্তৃক প্রবর্তিত। বেতন বাৎসরিক ১২,০০০৲।

৪। হার্ডিংজ প্রফেসর—উচ্চগণিত শাস্ত্র। ১৯১১-১২ সালে সম্রাট্‌ সম্রাজ্ঞীর ভারত ভ্রমণ স্মরণার্থ। লর্ড হার্ডিংজ তৎকালীন বড়লাট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যানসেলার ছিলেন। বেতন ১২,০০০৲।

৫। কারমাইকেল প্রফেসর—প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি। ১৯১২ হালে বাঙলার প্রথম গবর্ণর লর্ড কারমাইকেলের স্মরণার্থ। ম্যাট্রি-কুলেশন সংস্কৃত প্রবেশিকা, I.A. সংস্কৃত ও থিব সাহেবের ব্যাকরণ বিক্রয় করিয়া যে টাকা হয়, তাহা এই তহবিলে যায়। বেতন ১২,০০০৲।

৬। আশুতোষ প্রফেসর—সংস্কৃত। ১৯২৬ সালে স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি রক্ষার্থ তিনটি পদ সৃষ্ট হয়। বেতন মাসে ৬০০৲-১০০০৲।

৭। আশুতোষ প্রফেসর—ইস্‌লাম ইতিহাস। বেতন মাসে ৬০০৲-১০০০৲।

৮। আশুতোষ প্রফেসর—মধ্যযুগ ও বর্তমান ভারত। বেতন মাসে ৬০০৲-১০০০৲।

৯-১০। স্যর তারকনাথ পালিত প্রফেসর—পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন। ১৯১২ সালে তারকনাথ পালিত বিশ্ববিদ্যালয়কে ১৫ লক্ষ টাকার সম্পত্তি দান করেন।

১১-১৬। স্যর রাসবিহারী ঘোষ প্রফেসর—ব্যবহারিক গণিত, পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান, ব্যবহারিক রসায়ন, ব্যবহারিক পদার্থবিদ্যা। ১৯৩১ সালে রাসবিহারী ঘোষ ১০ লক্ষ টাকা দান করেন।

১৭-২১। খয়রার রাণী বাগেশ্বরী ও কুমার গুরুপ্রসাদ সিংহ্ প্রফেসর—১৯২১ সালে স্যর আশুতোষের চেষ্টায় এই ব্যবস্থা হয়। বার্ষিক আয় ৩০,০০০৲ টাকা। অধ্যাপকের পদ—(ক) ভারতীয় সুকুমার শিল্প, (খ) ভাষাতত্ত্ব, (গ) পদার্থবিদ্যা, (ঘ) রসায়ন ও (ঙ) কৃষি।

২২। রামতনু লাহিড়ী প্রফেসর—বাঙলা। বেতন মাসে ৭০০৲—১০০০৲।

২৩। ইউনিভার্সিটি প্রফেসর—ইংরেজি।

২৪। ইউনিভার্সিটি প্রফেসর—তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব।

২৫। ,, ,, উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান।

২৬। ,, ,, আন্তর্জাতিক আইন।

২৭। ,, ,, প্রাণীতত্ত্ব।

২৮। ,, ,, দর্শন।

২৯। ,, ,, গণিত।

৩০। ,, ,, অর্থনীতি

৩১-৩২। ,, ,, বাঙলা।

৩৩-৪০। বিশেষ ইউনিভার্সিটি প্রফেসর—ইংরেজি, দর্শন, পালি, অর্থনীতি ও শারীরতত্ত্ব।

৪১। অবৈতনিক অধ্যাপক, স্বাস্থ্যতত্ত্বের।

ইউনিভার্সিটি লেকচারশীপ্

১। ষ্টিফেনস্-নির্মলেন্দু ঘোষ লেকচারশীপ্—খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা। জি. সি. ঘোষ একলাখ টাকা দান করেন। ১৯২১ সাল হইতে আরম্ভ।

২। কমলা লেকচারশীপ্। স্যর আশুতোষ ৪০,০০০৲ টাকা দান করেন। ১৯২৪ সালে প্রবর্তিত।

৩। অধরচন্দ্র মুখার্জি লেকচারশীপ্। ৯০০০৲ দান করেন। ১৯২০ সালে প্রবর্তিত।

৪। ঘনশ্যামদাস বিড়লা হিন্দীর জন্য ১৫,০০০৲ দান করেন। ১৯১৯ সালে প্রবর্তিত।

৫। মহারাজা শ্রীবীরমিত্রোদয় সিং দেও ধর্মনিধি লেকচারশীপ্ (১৯২০)। ওড়িয়া ভাষা সম্বন্ধে।

৬। ঐ ঐ (১৯২৫) ওড়িয়া সাহিত্য।

৭। আশুতোষ লেকচারশীপ্ (১৯২৬) আইন বিষয়ক।

৮। গিরীশচন্দ্র ঘোষ লেকচারশীপ্ (১৯৩০)—নাট্যকার গিরীশচন্দ্র সম্বন্ধে।

৯। বসন্ত লেকচারশীপ (১৯৩৩) স্বাস্থ্য সম্বন্ধে।

ইউনিভার্সিটি ফেলোশীপ্

(ক) ঘোষ ট্রাভ্লিং ফেলোশীপ্। রাসবিহারী ঘোষের ২,৫০,০০০৲ টাকার সুদ হইতে তিন জন করিয়া ছাত্রকে বিদেশে অধ্যয়নের জন্য বৃত্তি দেওয়া হয়।

(খ) রামতনু লাহিড়ী ফেলোশীপ্—ইহা এক্ষণে প্রফেসরশীপে পরিণত হইয়াছে।

(গ) শ্রীগোপাল বসু মল্লিক ফেলোশীপ (১৮৯৭) বেদান্ত দর্শন অধ্যাপনার জন্য বৃত্তি।

(ঘ) স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় ফেলোশীপ্ (১৯২২ সাল হইতে প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার বেতন ১২,০০০৲ লইতেছেন না; তাহা দ্বারা এই তহবিল গঠিত)।

রিসার্চ ষ্টুডেণ্টশীপ্

১। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ রিসার্চ ষ্টুডেণ্টশীপ্। বোম্বাই-এর ধনী প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ দুই লক্ষ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ১৮৬৬ সালে দান করেন। ছয়টি বিষয়ের জন্য এই বৃত্তি দেওয়া হয়। এম. এ.র পর এই পরীক্ষা দিতে হয়।

২। মৌআট মেডেল (১৮৭৪)—প্রেমচাঁদ বৃত্তিভোগী ছাত্ররা পায়।

৩। কোটেস মেমোরিয়াল প্রাইজ (১৯১১)—ঔষধ সম্বন্ধে গবেষণা।

৪। গ্রিফিথ মেমোরিয়াল প্রাইজ (১৯০২)—বিজ্ঞান বা সাহিত্য।

৫। যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ রিসার্চ প্রাইজ (১৯০৯)—তুলনামূলক ভারতীয় আইন।

৬। বীরেশ্বর মিত্র মেডেল (১৯১৭)।

৭। দ্বারভাঙ্গা মহারাজ স্কলারশীপ্ (১৯০৯)—চিকিৎসা।

৮। জুবিলি রিসার্চ প্রাইজ (১৯০৮)।

৯। মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর ভারতীয় গণিত ও জ্যোতিষ গবেষণা ফাণ্ড (১৯১১)।

১০। মোক্ষদাসুন্দরী ও নলিনীসুন্দরী স্বর্ণপদক (১৯১২)—মহিলা গ্রাজুয়েটদের জন্য।

১১। অনাথনাথ দেব প্রাইজ (১৯১২)—আইন।

১২। স্যর তারকনাথ পালিত রিসার্চ স্কলারশীপ্ (১৯১২)—বিজ্ঞান।

১৩। স্যর রাসবিহারী ঘোষ রিসার্চ স্কলারশীপ্ (১৯১৩)—বিজ্ঞান।

১৪। খয়রা রিসার্চ স্কলারশীপ্।

১৫। ইব্রাহিম সোলেমান সলেহ্জি মেমোরিয়াল ফাণ্ড—মুসলমান আইন।

১৬। আনন্দরাম বড়ুয়া স্বর্ণপদক—সংস্কৃত বিভাগ।

১৭। মৃণালিনী দেবী পদক—প্রাচীন ভারতের ইতিহাস।

১৮। রাণী রামরাক্ষী স্বর্ণপদক—হিন্দু দর্শন।

১৯। খুজস্ত্ অখ্তর বানু সুরবর্দী স্বর্ণপদক (১৯২৮)—হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি ও প্রভাব।

২০। মহেন্দ্রনাথ রায় প্রাইজ ও পদক (১৯৩২)—ভারতীয় সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি ও রাজনীতি।

২১। নগেন্দ্রনন্দিনী দে পদক—গৃহিনীর কর্তব্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ।

২২। স্যর আশুতোষ মুখার্জি পদক (১৯২০)—বিজ্ঞান ও সাহিত্য।

২৩। জগত্তারিণী স্বর্ণপদক (১৯২১)—বাঙলা সাহিত্যের লেখককে পদক দান।

২৪। নাগার্জুন প্রাইজ (১৯২২)—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ১০,০০০৲ টাকা দান করেন—রসায়ন গবেষণা।

২৫। নীলমণি ব্রহ্মচারী পদক—চিকিৎসা।

২৬। ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণপদক—মহিলাদের জন্য।

২৭। বসন্ত পদক—স্বাস্থ্যতত্ত্ব।

প্রবেশিকা	পরীক্ষোত্তীর্ণদের	জন্য	৫৮টি	প্রাইজ	আছে।
ইণ্টারমিডিয়েট	,,	,,	১৭	,,	,,
বি. এ., বি. এস্-সি.	,,	,,	৫০	,,	,,
এম. এ., এম.এস-সি.	,,	,,	২৪	,,	,,
আইন	,,	,,	৫	,,	,,
এম. বি.	,,	,,	১৭	,,	,,
ইঞ্জিনীয়ারিং	,,	,,	৩	,,	,,
সাধারণ	,,	,,	৩	,,	,,

বিদেশে অধ্যয়নের জন্য বৃত্তি

১। ষ্টেট্ স্কলারশীপ্ বা গবর্মেণ্ট বৃত্তি ২টি। ৩০০ পাউণ্ড বৎসরে।

২। গুরুপ্রসাদ ঘোষ স্কলারশীপ্—জাপানে শিক্ষালাভের জন্য বাৎসরিক ১০০০৲ ও য়ুরোপের জন্য ২০০০৲ টাকা বৃত্তি; প্রধানত হিন্দুদের জন্য। (১৯০৮ হইতে)।

৩। স্যর তারকনাথ পালিত স্কলারশীপ্—একলক্ষ টাকা দান। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের বিদেশে অধ্যয়নের জন্য।

৪। রাধিকামোহন স্কলারশীপ্—১৷৹ লাখ টাকা দান। ব্রাহ্মণ ও বিশেষভাবে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কৃতী ছাত্রের জন্য বৃত্তি।

৫। লালচাঁদ মুখার্জি দান। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ ইন্সপেক্টর অধ্যাপক হুরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। বাঙালী প্রটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টান ছাত্রদের বিদেশে অর্থকরী বৈজ্ঞানিক বিষয় শিক্ষার জন্য বৃত্তি।

ইখরায় বাসন্তীবিজয় মাইনিং স্কুল

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ইখরায় মাইনিং (খনি বিদ্যা) শিক্ষার জন্য ১০০

বিঘা জমি, নগদ ১০,০০০৲ ও বাৎসরিক ১৮০০৲ টাকা দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কলেজ, স্কুল ও ছাত্র-সংখ্যা

	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
ইউনিভার্সিটি-সংখ্যা					২
,, ছাত্র-সংখ্যা					১৮৮০
কলেজ-সংখ্যা			৩৪	৩৬	৪৯
,, ছাত্র-সংখ্যা				১৬,৯৪২	১৯,৭৪৪
বৃত্তি কলেজ সংখ্যা				১০	১৭
,, ছাত্র-সংখ্যা				৪,৩৫৩	৫,২০৮
সেকেণ্ডারী স্কুল					
হাইও মধ্য ইংরেজি স্কুল-সংখ্যা				২,৬৭৮	৩,১২৬
,, ছাত্র-সংখ্যা				৩,২৮,১৬৬	৪,৫১,৬৭২
প্রাইমারী স্কুল-সংখ্যা				৪৭,৭৮৩	৬১,১৬২
,, ছাত্র-সংখ্যা				১৪,৩৫,৯০৬	২১,১৬,২৭৮
বিশেষ স্কুল				১,৪২০	৩,০৫০
,, ছাত্র-সংখ্যা				৪৯,৩৫০	২,২৫,২৭৯
বেসরকারী স্কুল				১,৮৪০	১,৬৩০
,, ছাত্র-সংখ্যা				৩৫,৪৩৭	৬৩,১৬৪
মোট বিদ্যালয়-সংখ্যা				৫৩,৭৬৭	৬৯,০৩৫
,, ছাত্র-সংখ্যা				১৮,৯০,২৫৪	২৭,৮৩,২২৫

বাঙলাদেশের শতকরা ১১·১%জন নর-নারী অক্ষর-জ্ঞান-সম্পন্ন; এক্ষণে সমগ্র ভারতের তুলনায় বাঙলাদেশের অবস্থা কিরূপ দেখা যাক্।

একশত জন লোকের মধ্যে

	লেখা পড়া জানা অধিবাসী	নিরক্ষর লোক শতকরা
ভারতবর্ষ	৮ জন	৯২
বর্মা	৩৬ ৮	৬৩·২
কোচিন	৩৩·৭	৬৬·৩
ত্রিবাঙ্কুর	২৮·৯	৭১·১
বড়োদা	২০·৯	৭৯·১
এডেন	১৮ ২	৮১·৮
কুর্গ	১৭·৬	৮২·৪
আন্দামান	১৭·০	৮৩ ০
দিল্লী	১৬·৩	৮৩·৭
আজমীঢ়	১২·৫	৮৭·৫
পশ্চিম দেশীয় রাজ্য	১২·৫	৮৭·৫
মান্দ্রাজ দেশীয় রাজ্য	১২·১	৮৭·৯
বঙ্গদেশ	**১১·১**	**৮৮·৯**
বোম্বাই	১০·৮	৮৯·২
মান্দ্রাজ	১০·৮	৮৯·২
মহীশূর	১০·৬	৮৯·৪
আসাম	৯·৩	৯০·৭
বোম্বাই দেশীয় রাজ্য	৭·১	৯২·৯
মধ্যপ্রদেশ	৬ ৬	৯৩·৪
পাঞ্জাব	৬·৩	৯৩·৭
আসাম দেশীয় রাজ্য	৬·১	৯৩·৯
বাঙলার দেশীয় রাজ্য	৬·১	৯৩·৯
যুক্তপ্রদেশ	৫·৫	৯৪·৫
বেলুচিস্থান	৫·৪	৯৪·৬
বিহার-উড়িষ্যা	৫·৩	৯৪·৭

	একশত জন লোকের মধ্যে লেখা পড়া জানা অধিবাসী	নিরক্ষর লোক শতকরা
মধ্যভারতের রাজ্যসমূহ	৫.২	৯৪.৮
হায়দ্রাবাদ	৫.০	৯৫ ০
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত	৪.৯	৯৫.১
যুক্তপ্রদেশের দেশীয় রাজ্য	৪.৯	৯৫.১
গোয়ালিয়র	৪.৭	৯৫.৩
রাজপুতানা	৪.৩	৯৫.৭
পাঞ্জাবের দেশীয় রাজ্য	৪.২	৯৫.৮
কাশ্মীর	৪.০	৯৬.০
বিহার-উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্য	৩.৯	৯৬ ১
সিকিম	৩.৫	৯৬.৫
মধ্যপ্রদেশের দেশীয় রাজ্য	২.৩	৯৭.৭

বাঙলাদেশে বৈদ্যরা শিক্ষিত হাজার করা ৬৩৫।

শিক্ষার ব্যয়

	১৯৩০-৩১		১৯৩২-৩৩
মান্দ্রাজ	২,৯৭,১১,০০০		২,৪২,০০,০০০
বোম্বাই	২,০৬,৩৩,০০০		১,৭৩,৫৮,০০০
যুক্তপ্রদেশ	১,৯৩,০৫,০০০		১,৮২,৯৩,০০০
পাঞ্জাব	১,৭১,১০,০০০		১,৪৮,৪৮,০০০
বঙ্গদেশ	১,৪১,৭৮,০০০		১,২৬,২৯,০০০
বর্মা	১,০৪,৮০,০০০		৮৪,৫০,০০০
বিহার	৯০,৪১,০০০		৭৬,৫৬,০০০
আসাম	৩৩,৩৯,০০০		৩০,৯৪,০০০
মধ্যপ্রদেশ			৪৬,৭৭,০০০
উ-প-সীমান্ত			১৮,৫৪,০০০
কুর্গ			১,৫৫,০০০
শান ষ্টেটস্			৪,১০,০০০
অন্যান্য প্রদেশ লইয়া			
মোট ভারত	১৩,৬২,৬৮,০০০	মোট	১১,৭০,৪৬,৬৮০

বিংশ পরিচ্ছেদ

বাঙলা সাহিত্য

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য আদিতে সাধারণ লোকেই আলোচনা করিত। যথার্থ সাহিত্য সৃষ্টি হয় বৈষ্ণব ধর্মের আন্দোলনের সঙ্গে।

সাধারণ লোকে নিশ্চয়ই গান গাহিত, কোন দেবস্থানে মিলিত হইয়া পৌরাণিক বা লৌকিক আখ্যান লইয়া নাট্যাকারে অভিনয় করিত। গানের সাহায্যে কথাবার্তাগুলি বলিবার রীতি ছিল আদিম। এইভাবেই মনসার ভাসান, লাউসেন রাজার উপাখ্যান, রাজা গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, কালকেতু ব্যাধের গল্প, বেহুলা-লখিন্দরের কথা ইত্যাদি বিষয় লইয়া তাহারা পালা বাঁধিত, গান গাহিত। কিন্তু সে-যুগের রচনা আমরা পাই নাই; লিখিয়া রাখিবার অভ্যাস তখনো সাধারণের মধ্যে হয় নাই; এইসব বিষয়ের বই যাহা পাই, তা অনেক পরে রচিত।

বাঙলার আদি কবি চণ্ডীদাস, ইনি ইংল্যণ্ডের আদি কবি চসারের সমসাময়িক; চণ্ডীদাসের বাড়ী ছিল বীরভূমের নান্নুরে; তিনি ছিলেন ১৪শ শতাব্দীর লোক। সে-যুগে রাঢ় ছিল সভ্যতার কেন্দ্র। 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' নামে তাঁহার একখানি বই পাওয়া গিয়াছে। ইহার ভাষা সেই যুগের বলিয়া বেশ দুর্বোধ্য। আজকাল চণ্ডীদাসের নামে প্রায় ৮০০ পদাবলী প্রচলিত আছে। কিন্তু ইহার মধ্যে ৬০।৭০টি আসলে তাঁহার রচিত বলিয়া বোধ হয়। অবশিষ্ট অন্য লোকের, চণ্ডীদাসের নামে চালাইয়া দেওয়া। কবিতাগুলির ভাষা যুগে যুগে একটু একটু করিয়া পরিবর্তিত হইয়াছে। যাহারা গান করিত বা পুথি লিখিত, তাহারা প্রায়ই জ্ঞাতসারে পরিবর্তন করিত বা অজ্ঞানকৃত ভুল করিত। এইভাবে ভাষার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। আজ চণ্ডীদাসের যুগের ভাষা অক্ষুণ্ণ থাকিলে লোকে তাকে এমন সহজভাবে ব্যবহার করিতে পারিত না।

চণ্ডীদাসের কিছুকাল পরে কৃত্তিবাস। তাঁহার লিখিত রামায়ণ সুপরিচিত; তিনি খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর প্রথম দিকে নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে বাস

করিতেন। এই সময়ে বাঙলাদেশের রাজা পাঠানরা। তখনো উর্দু ভাষার সৃষ্টি হয় নাই, রাজসরকারে আদালতে পার্সী, সাধারণ লোক-ব্যবহারে বাঙলা চলিত। পণ্ডিতরা না পার্সী, না বাঙলার ধার ধারিতেন; তাঁহারা সংস্কৃত পড়িতেন, সংস্কৃতে লিখিতেন। ম্লেচ্ছ ভাষা বলিয়া পার্সীকে ঘৃণা, গ্রাম্য ভাষা বলিয়া বাঙলাকে অবজ্ঞা করিতেন। মুসলমান রাজাদের কেহ কেহ বাঙলা জানিতেন; সুলতান হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) বাঙলা সাহিত্যের একজন উৎসাহদাতা ছিলেন। ইঁহার পুত্রের শাসনকালে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছুটি খাঁ মহাভারতের অনুবাদ করান। আরও কিছুকাল পরে কাশীরাম দাস তাঁহার মহাভারত লেখেন; তাঁহার পূর্বে বাঙলায় ছোটখাটো অনেকগুলি অনুবাদ হইয়াছিল। কৃত্তিবাসের পর ষষ্ঠীবর, গঙ্গাদাস, ভবানীদাস, দুর্গারাম, জগৎরাম, শিবচন্দ্র, রামমোহন, রঘুনন্দন গোস্বামী ও গত শতাব্দীর শেষ দিকে রাজকৃষ্ণ রায় রামায়ণ বাঙলা গদ্যে লেখেন।

কাশীরামের আগে সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী ও তাঁহার পরে নিত্যানন্দ ঘোষ, ত্রিলোচন চক্রবর্তী, রামেশ্বর নন্দী মহাভারতের উপাখ্যানাংশ ছন্দে বিবৃত করেন। রাজকৃষ্ণ রায় সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ করেন।

মোট কথা, চৈতন্যদেবের পূর্বের এই যুগের বাঙলা সাহিত্য প্রাচীন সংস্কৃত, ইতিহাস, পুরাণের প্রচার, প্রাচীন বাঙলার ধর্ম ও বীরগাথা এবং দেবদেবীর মাহাত্ম্য-কীর্তন ও রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে অবলম্বন করিয়া গভীর ভাবের আধ্যাত্মিক গীতি-কবিতা রচনা—এইগুলি লইয়া ব্যাপৃত ছিল।

চণ্ডীদাসের কিছুকাল পূর্বে মিথিলাদেশের কবি বিদ্যাপতি কতকগুলি পদাবলী রচনা করেন। মিথিলার কবি বিদ্যাপতিকে বাঙলার কবির মধ্যেই ধরা হয়, তাহার কারণ, এককালে মিথিলাকে গৌড়দেশের অন্তর্গত ধরা হইত। মৈথিলী ভাষার সহিত বাঙলা ভাষার প্রভেদ সামান্যই। বাঙালী তাঁহার পদাবলীকে নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়া বিদ্যাপতির অনুকরণে গান ও পদ রচনা করিতে আরম্ভ করে। এই ভাষা না বাঙলা, না মৈথিলী; ইহাকে বলে 'ব্রজবুলী'। অনেক বৈষ্ণব কবি এই কৃত্রিম ভাষায় কবিতা লেখেন। আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' ইহার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

চৈতন্যদেব ১৪৮৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্যদেবের শিষ্য ও ভক্তেরা বাঙলা ভাষায় নিজেদের মত ও ভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। বাঙলায় এক বিরাট্ বৈষ্ণব-সাহিত্যের সৃষ্টি হইল। এই সাহিত্যের একটি বিশেষ অঙ্গ হইতেছে—মহাপুরুষের জীবন-চরিত রচনা। চৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁহার প্রধান পার্ষদ ও সঙ্গীদের বহু জীবনী লিখিত হইয়াছিল। এইসব গ্রন্থের মধ্যে বৃন্দাবন দাসের 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত' ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' বিখ্যাত। এছাড়া দেড় শতের অধিক কবি পদ রচনা করেন। ইঁহাদের মধ্যে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, নরোত্তম দাস বিখ্যাত। পদাবলীর সংখ্যা বহু সহস্র।

বৃন্দাবন বৈষ্ণবদের তীর্থস্থান হওয়ায় হিন্দীর প্রভাব বাঙলায় এই সময়ে আসে। কৃষ্ণদাস বাবাজী হিন্দী 'ভক্তমালের' ও বাঙালী মুসলমান কবি আলাওল হিন্দী কবি মালিক মহম্মদ জৈসীর 'পদমাবৎ' বা পদ্মাবতীর অনুবাদ করেন। গ্রন্থখানি কঠিন; কিন্তু অনুবাদটি খুব সুন্দর।

ইহার পাশাপাশি চলিতেছিল লোক-সাহিত্য। বৌদ্ধধর্মের অধোগতির সময়ে এদেশে ধর্মের পূজা প্রবর্তিত হয়। বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ—এই বৌদ্ধ ত্রিমূর্তির অন্যতম 'ধর্ম'কে লইয়া নূতন ধর্মমত সৃষ্ট হইল। রামাই পণ্ডিত ইহার স্থাপয়িতা; তান্ত্রিকতা ও বৌদ্ধধর্মের ভাব লইয়া এই মত গঠিত। লাউসেন ছিলেন ইহার বীর ও সেবক। তাঁহাকে ঘিরিয়া নানা গান, কবিতা নানাস্থানে রচিত হয়। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে তাঁহার জীবনী ও কীর্তিকলাপ বর্ণিত হইয়াছে। অজয় নদের তীরে গোপ-সর্দার ইছাই ঘোষের গড় ছিল। গৌড়রাজ ধর্মপালের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহী হন। সামন্তরাজ ময়নাগড়ের অধিপতি কর্ণসেনের ছয় পুত্র ইছাই-এর সহিত লড়াই-এ মারা পড়ে। কর্ণসেনের সহিত গৌড়রাজ তাঁহার ভগ্নী রঞ্জাবতীর বিবাহ দেন; রঞ্জাবতীর পুত্র লাউসেন বা লবসেন। এই লাউসেনের বীর কাহিনী বহু কবি বহু কাব্যে লিখিয়া গিয়াছেন। ময়ূরভট্ট, মানিক গাঙ্গুলী, ঘনরাম, শ্যাম পণ্ডিত প্রভৃতি কবি বড় বড় কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। শূন্যপুরাণ ধর্মসাহিত্যের একখানি প্রাচীন বই।

ধর্মঠাকুরের পূজার মাহাত্ম্য বর্ণনায় যেমন একটি কাব্য-সাহিত্য হইয়াছিল, তেমনি চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য ও শক্তি বর্ণনা করিয়া মাধবাচার্য, কবিকঙ্কণ,

মুকুন্দরাম 'চণ্ডীমঙ্গল' রচনা করেন। কবিকঙ্কণের 'চণ্ডীমঙ্গল' বাঙলা-সাহিত্যের একখানি রত্ন। প্রাচীন বাঙলার অনেক কথা এই বই হইতে জানা যায়।

অন্যান্য দেবদেবীর মধ্যে 'মনসা', 'শীতলা' ও 'শিব' সম্বন্ধেও কবিরা কাব্য রচনা করেন; সেগুলিকেও 'মঙ্গল' কাব্য বলে। বংশীদাসের পদ্মপুরাণে, কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দের মনসার ভাসানে বেহুলার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করেন। এইসব মঙ্গলকাব্যে দেবদেবীর মধ্যে অত্যন্ত ঝগড়াঝাটি, ঈর্ষ্যাপরায়ণতা দেখা যায়; সাধারণ লোকে স্থূলবুদ্ধি দিয়া তাহাদের দেবতাকে তাহাদের মতনই গড়িয়াছে।

লেখা হয় নাই এমন সাহিত্যও দেশের মধ্যে যথেষ্ট ছিল; যেমন গাজনের গান চড়ক পূজার সময় গাওয়া হইত। গম্ভীরার গান, মালদহ মুর্শিদাবাদে শিব-পূজার সময় গাওয়া হয়। মৈমনসিংহের গ্রাম্য গান খুব বিখ্যাত। এইগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ করিয়া ছাপাইয়াছেন। এ ছাড়া, ছড়া গানও অসংখ্য মুখে মুখে চলে; কিছু কিছু ছাপা হইয়াছে।

নানাদিক্ দিয়া ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দী প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রসূ। এই সময়ে মুসলমানদের শাসন সুদৃঢ় থাকায় দেশে শান্তি ও সুশৃঙ্খলা ছিল; ফলে, সাহিত্যের আলোচনা ও উন্নতি হইয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে বাঙলার পতনের সূত্রপাত। এই শতাব্দীর মাঝ সময় হইতে ইংরেজ আসিয়া বাঙলার সিংহাসনের পিছনে বসিল। বহুকাল দেশের মধ্যে অশান্তি-অরাজকতা চলে। এই সময়ের তিন চারিজন কবির নাম উল্লেখযোগ্য। রামপ্রসাদ সেন (খ্রীঃ ১৭৭৫), ভারতচন্দ্র (খ্রীঃ ১৭৬০) ও রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল। রামপ্রসাদ কালীর সাধক ছিলেন; তাঁহার গানগুলি ভক্তদের চির আদরের। ভারতচন্দ্র ছিলেন নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি। 'অন্নদামঙ্গল' তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য। জয়নারায়ণ 'কাশী-পরিক্রমা' লেখেন।

এই সময়ে লোকে হাল্কা কবিতা ও ছড়ায় প্রীতিলাভ করিত; ভাবের গাম্ভীর্য অপেক্ষা শব্দের চাতুরীতেই বেশী মুগ্ধ হইত। সভায় কবিতে কবিতে ছড়া কাটিয়া যুদ্ধ হইত। সেই হইতে কবির দলের উৎপত্তি। পুরাণের গল্প ভাঙ্গিয়া অত্যন্ত ঘরোয়া ভাবে একশ্রেণীর কাব্য-সৃষ্টি হইল,—ইহাকে বলে

পাঁচালী। এ ছাড়া তরজা বা খেউড়ের দল ছিল; তাহারা উৎসবাদিতে দুই দলে বিভক্ত হইয়া গান করিত; অনেক সময়ে সেগুলি খুব অশ্লীল হইত। এইসব সাহিত্য সাহিত্য-পদবাচ্য নহে; বিকৃত সমাজের ইতিহাস জানিবার জন্য সেগুলি প্রয়োজন হয় মাত্র।

ইতিমধ্যে বাঙলার শাসন ইংরেজ সুব্যবস্থিত করিতে লাগিল। ইংরেজরা প্রথমে এদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে মন দেয় নাই, বরং কোনো পাদরীকে এদেশে আসিতে দিত না। পর্তুগীজরা খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল। ১৭৪৩ অব্দে লীস্‌বন নগরীতে তাহারা ইংরেজি হরফে প্রথম বাঙলা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ ছাপায়। পর্তুগীজরা খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিতে গিয়া এদেশে অত্যন্ত উপদ্রব করে। ভারতে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের অধঃপতনের একটি কারণ, তাহাদের খ্রীষ্টধর্ম প্রচার। সেইজন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গোড়া হইতে খুব সাবধান হয়, খ্রীষ্টানদের আমল দিত না। কিন্তু শ্রীরামপুর ছিল দিনেমারদের। সেখানে কেরী, মার্শম্যান সাহেব আসিয়া প্রচারের কেন্দ্র খুলিলেন। তাঁহারাই প্রথম বাইবেলের বাঙলা অনুবাদ করিলেন, জ্ঞান-বিতরণের জন্য বই ছাপিতে আরম্ভ করিলেন। ধর্মপ্রচারের জন্য সহজ বাঙলা ভাষা তাঁহারা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ইতিমধ্যে ইংরেজদের রাজত্ব পাকা হইয়াছে। দেশে শাসনের সুব্যবস্থা করিবার জন্য ইংরেজ-পার্লামেণ্ট ব্যস্ত হইলেন।

যুবক ইংরেজ সিবিলিয়ানদের বাঙলা শিখাইবার জন্য কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হইল। ছাত্রদের জন্য পাঠ্য পুস্তক লিখিবার জন্য পণ্ডিত নিযুক্ত হইলেন। এই পণ্ডিতগণ বাঙলা গদ্য রচনা আরম্ভ করিলেন। পণ্ডিতরা সংস্কৃতজ্ঞ, কখনো বাঙলা লেখেন নাই, পড়েন নাই বলিলেও দোষ হইবে না; তাঁহারা যে বাঙলা লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তাহা সংস্কৃতেরই অনুরূপ—অত্যন্ত দুরূহ।

উনবিংশ শতাব্দী এইভাবে আরম্ভ হইল। প্রাচীন ও নবীন মনোভাবের দ্বন্দ্ব দুই পুরুষ ধরিয়া চলিল। ইংরেজি শিক্ষা বনাম দেশীয় শিক্ষা—এই দ্বন্দ্বের অবসান করেন বেণ্টিঙ্ক। তিনি স্থির করিলেন—এ দেশের লোক ইংরেজি শিখিবে। কিন্তু ইহার পূর্বেই দেশের লোক ইংরেজি শিখিবার জন্য লাগিয়া গিয়াছিল। এই সময়ে রামমোহন রায় জন্মান (১৭৭৪-১৮৩৩)। তিনি

পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত প্রাচ্যের শাস্ত্রাদির আলোচনা যুগপৎ চালাইবার জন্য দেশবাসীকে বলিলেন। তাঁহার সহিত হিন্দুসমাজের অপেক্ষাকৃত প্রাচীন-পন্থীদের ও অপরপক্ষে খ্রীষ্টান পাদরীদের বিবাদে ও তর্কে সাময়িক কাগজগুলি পূর্ণ। বাঙলা গদ্য ক্রমশই সচল হইতে লাগিল। এই গদ্যকে চালু করিবার জন্য বিশেষভাবে সহায়তা করেন শ্রীরামপুরের পাদরীরা। বাঙলার গদ্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের হাতে গিয়া পড়ায় উহা সংস্কৃত শব্দের ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া চলিতেছিল, এই তর্ক-বিতর্কে ভাষার সেই কৃত্রিমতা কিয়ৎ পরিমাণে কাটিয়া গেল। দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-প্রমুখ কয়েকজন লেখক তাহাকে আরও ব্যবহারযোগ্য করিলেন।

এই বাঙলা ভাষায় যে বেদ-বেদান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া বৈজ্ঞানিক বিষয়ও আলোচনা হইতে পারে, ইহা প্রথম দেখাইল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। অক্ষয়কুমার ও ঈশ্বরচন্দ্র ইহার সম্পাদকতা করেন।

সিপাহী-বিদ্রোহ যেমন ভারত ইতিহাসের একটা পর্বের শেষ, তেমনি বাঙলা সাহিত্যেরও একটা পর্বের শেষ এইখানে বলিতে পারা যায়। কবি ঈশ্বর গুপ্ত পূর্ব যুগের শেষ কবি, পাঁচালীকার দাশরথি রায়ও বটে।

১৮৬০ সালের পর আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ। এই যুগের সমস্ত লেখক ও কবি ইংরেজি ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান পড়া লোক। পাশ্চাত্য ভাবধারা ইঁহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, রচনার ভঙ্গীর মধ্যে নূতনত্ব আসিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে দুইজন,—কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) এবং ঔপন্যাসিক ও নিবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) শ্রেষ্ঠ। মধুসূদনের কীর্তি—তিনি নিজ প্রতিভাবলে বাঙলা কাব্য-সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করেন; ইহা অবশ্য য়ুরোপীয় সাহিত্যের দেখাদেখি; কিন্তু তিনি বাঙলা ভাষায় গতিবেগ আনিয়া দেখাইলেন যে, এই ভাষাও শক্তিশালী হইতে পারে। তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্য, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী ও ব্রজাঙ্গনা কাব্য বাঙলা ভাষায় অমর হইয়া থাকিবে। বাঙলা নাটকও তিনি রচনা করেন। তবে সে বিষয়ে যশস্বী

হইয়াছিলেন দীনবন্ধু মিত্র। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লিখিত নাটক। এই নাটক এককালে দেশে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিল।

এ যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক বঙ্কিমচন্দ্র; উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচনায় তাঁহার খ্যাতি। বাঙলা সাধুভাষায় গদ্য রচনা বঙ্কিমের হাতে চরম উন্নতিশিখরে আরোহণ করে। বঙ্কিমের পূর্বে প্যারীচাঁদ মিত্র 'আলালের ঘরের দুলাল' নামে একখানি পারিবারিক ঘটনা সংবলিত গল্প লেখেন; বাঙলা ভাষায় 'নভেল' জাতীয় বই বলিতে গেলে এই প্রথম। উহার ভাষা অত্যন্ত সরল ও হাল্‌কা ধরণের ছিল। কিন্তু বাঙলা গদ্যে কতটা শক্তি আছে, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম দেখাইলেন; উহা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের সংস্কৃত ঘ্যাঁসা বাঙলা নহে, আবার অত্যন্ত গ্রাম্যভাষাযুক্ত 'আলালী' ভাষা নহে। বাঙালী জাতি বঙ্কিমের কাছে এই ভাষার জন্য ঋণী। তাঁহার উপন্যাস বাঙালীর কাছে সুপরিচিত। উপন্যাস ছাড়া তাঁহার প্রবন্ধাবলী বিশেষ ভাবে সে-যুগের চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। বর্তমান হিন্দু জাতীয়তাবোধের সূত্রপাত তাঁহার রচনা হইতে। তাঁহার সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) বাঙলার প্রথম উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-পত্রিকা।

মধুসূদন ও বঙ্কিমের যুগে বহু লেখক জন্মগ্রহণ করেন; যেমন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল চক্রবর্তী, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, নবীনচন্দ্র সেন, রমেশচন্দ্র দত্ত, গিরীশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু। বিহারীলাল বাঙলাভাষায় নূতন ধরণের গীতি-কবিতা প্রথম লেখেন; সেই হিসাবে তিনি রবীন্দ্রনাথের গুরু। মাইকেলের 'মেঘনাদবধে'র অনুকরণে হেমচন্দ্র 'বৃত্রসংহার' লেখেন। নবীনচন্দ্র পলাশীর যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্র, অমিতাভ প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক; বঙ্কিমকে অনুসরণ করিয়া তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখেন। গিরীশচন্দ্র ও অমৃতলাল বিখ্যাত নাটক-রচয়িতা ও বিখ্যাত অভিনেতা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক হইতে আধুনিক যুগের তৃতীয় পর্বের আরম্ভ। এই যুগকে আমরা বলিতে পারি রবীন্দ্রনাথের যুগ। রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয় ১৮৬১ সালে। সুতরাং তিনি বঙ্কিম, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের সমসাময়িক এক

হিসাবে। তাঁহার প্রতিভা অতি অল্প বয়সেই এদেশে স্বীকৃত হইয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের কিছু পূর্ব হইতে তাঁহার রচিত গান, প্রবন্ধ যুব-বাঙালীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। নানা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা : ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, হাস্য-কৌতুক, কবিতা, গান, নাট্যকাব্য, বিচিত্র গদ্য রচনায় তিনি বাঙলা সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন ১৯১১ সালে তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইলে কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহাকে বিপুল আনন্দে সংবর্ধনা করে। ১৯১৩ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এই পুরস্কারের মূল্য প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। সুইডেনের নোবেল নামে এক ধনী বিপুল অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে প্রতি বৎসর পাঁচ-জনকে পুরস্কৃত করা হয়। ১৯৩১ সালে বেঙ্কটরমন বিজ্ঞানের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাইলে লোকে শান্তিনিকেতনে গিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করে। ১৯৩১ সালে তাঁহার ৭০ বৎসর পূর্ণ হইলে কলিকাতায় বিরাট্ জয়ন্তী হয়। এই উৎসব ভারতের প্রায় সর্বত্রই হয়। কোনো কবি, লেখক, রাজা বা সম্রাট্ কোনো কালে কোনো দেশে এমন সম্মান পান নাই।

রবীন্দ্র-যুগে বহু লেখক জন্মিয়াছেন ; অক্ষয়কুমার বড়াল, রজনীকান্ত সেন, দেবেন্দ্রনাথ সেন, প্রিয়নাথ সেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কামিনী রায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। এই যুগের লেখকদের মধ্যে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার হইতেছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; তাঁহার গল্পে ও উপন্যাসে সামাজিক ও অন্য অত্যাচারে পিষ্ট ও ক্লিষ্ট বাঙালী যেন নূতন ভাষা পাইয়াছে।

গত দশ বৎসরের মধ্যে বাঙলাদেশে সাহিত্যের নূতন প্রাণ আসিয়াছে। বহু তরুণ লেখক সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

বিশুদ্ধ সাহিত্য, কাব্য, উপন্যাস, প্রবন্ধ ছাড়া বাঙালী জাতির বিচিত্র চিন্তাধারা বাঙলা ভাষার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ধর্মসম্বন্ধীয় প্রবন্ধে দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিবেকানন্দ অমর। দার্শনিক প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, অরবিন্দ ঘোষ ; বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদানন্দ রায় বিখ্যাত।

এছাড়া অসংখ্য লেখক নানা পত্রিকায় লিখিয়াছেন; বাঙলা বই অজস্র বাহির হইতেছে; এ সমস্তই বাঙালীর জাগ্রত মনের আভাস দিতেছে।

বাঙলা সাহিত্যের গ্রন্থাদি, পুথি প্রভৃতি রক্ষার জন্য বাঙালী 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ' স্থাপন করিয়াছে (১৩০১)। এই পরিষৎ হইতে একখানি 'পত্রিকা' বাহির হয়; বহু প্রাচীন গ্রন্থ এই সমিতি ছাপাইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও কয়েকখানি অমূল্য বাঙলা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বহু শত বাঙলা পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন। এছাড়া ব্যক্তিগত সংগ্রহেও বাঙালী মন দিয়াছে।

বাঙলা ভাষায় বহুকাল হইতে সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ সুরু হইয়াছে; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' ২২ বৎসর বেদের অনুবাদ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়; ঐ পত্রিকায় বিদ্যাসাগর মহাশয় মহাভারতের অনুবাদ আরম্ভ করেন। তৎপরে কালীপ্রসন্ন সিংহ উহা গ্রহণ ও শেষ করেন। বেদের প্রথম অনুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন রমেশচন্দ্র দত্ত। তারপর বাঙলা ভাষায় বহু চেষ্টা হইয়াছে; দুর্গাদাস লাহিড়ীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রামায়ণের অনুবাদ করেন হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য; পরে বর্ধমান রাজবাটি হইতে রামায়ণ ও মহাভারতের নূতন অনুবাদ প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গবাসী' কার্যালয় হইতে পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্রসমূহের অনুবাদ বাহির হইয়াছে। গীতা, উপনিষদের বহু তর্জমা প্রকাশিত হইয়াছে; দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ ও সীতানাথ তত্ত্বভূষণের নাম উল্লেখযোগ্য। বিধুশেখর শাস্ত্রী শতপথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সংস্কৃত নাটকগুলি অনুবাদ করেন। বৌদ্ধ পালি গ্রন্থেরও বাঙলায় অনুবাদ হইয়াছে। চারুচন্দ্র বসু, বিধুশেখর শাস্ত্রী, ঈশানচন্দ্র ঘোষ বাঙলাভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

ইংরেজি ভাষা হইতেও অনেক উপন্যাস অনূদিত হইয়াছে; ফরাসী ভাষা হইতে কতকগুলি বই জ্যোতিরিন্দ্র নাথ অনুবাদ করেন।

পারসী ও আরবী হইতে বাঙলায় অনেক বই তর্জমা হইয়াছে। নববিধান সমাজের গিরীশচন্দ্র কোরাণ, হদিস ও বহু সুফি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। এখন মুসলমান লেখকগণ কোরাণাদি অনুবাদ করিতেছেন। অনুবাদ-সাহিত্য

বাঙলায় খুব বড় না হইলেও নগণ্য নহে। সাধারণ লোকে এখন সংস্কৃত ও আরবী ধর্মগ্রন্থসমূহ পাঠ করিতে পারে।

বাঙলা সাহিত্যের প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন 'বসুমতী সাহিত্য-মন্দির'। তাঁহারা বাঙলার প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ লেখকের গ্রন্থাবলী অতি সুলভে দেশ মধ্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থের অনুবাদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদির অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন 'বঙ্গবাসী' কার্যালয়। 'হিতবাদী' সাপ্তাহিকও এবিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন।

বাঙলা পত্রিকা ও সংবাদ-পত্র বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে যথেষ্ট পুষ্ট করিয়াছে; ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা হইতে এই সব পত্রিকার জন্ম। তারপর ধীরে ধীরে সাহিত্য, সাময়িক প্রবন্ধ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা, পাশ্চাত্য-ভাবধারার প্রচার এইসব পত্রিকার মধ্য দিয়া চলিতে থাকে। ইহার সাহায্যে দেশ মধ্যে সাহিত্য-রসবোধ, রাজনীতি-অর্থনীতি সম্বন্ধে চেতনা, বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইতেছে। আধুনিক বাঙলা ভাষার আদি যুগে কেরী সাহেবের সমাচার দর্পণ, পরে কেশবচন্দ্র সেনের সুলভ সমাচার, তৎপর যুগে সঞ্জীবনী, হিতবাদী, বঙ্গবাসী, বসুমতী, আধুনিক যুগে আনন্দবাজার পত্রিকা লোক-শিক্ষার বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। পত্রিকার মধ্যে 'বঙ্গদর্শন', 'ভারতী', 'আর্যদর্শন', 'নবজীবন', 'সাধনা' বাঙালীর চিন্তাজগতে বিশেষ আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল। বর্তমান যুগে 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'বসুমতী', 'সবুজপত্র' বাঙালীর মনের খাদ্য নানাভাবে দিয়াছে। ইহার মধ্যে 'প্রবাসী' নানা বিষয়ে পত্রিকা-চালনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। সাম্প্রদায়িক বহু উৎকৃষ্ট পত্রিকা আছে, তাহাদের উল্লেখ করিলাম না; অতি-আধুনিককালে বহু পত্রিকা নানা বিষয় আলোচনা করিতেছে, তাহাদের সকলের নামোল্লেখ করিতে গেলেও আমাদের প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িবে।

১৯৩১ সালে বাঙলাদেশে তিন হাজার নূতন বই ছাপা হয়; ইহার অধিকাংশই বাঙলা। এই সময়ে বাঙলাদেশে ৭০৪ খানি পত্রিকা ও সাময়িক কাগজ বাহির হয়; বিশ বৎসর পূর্বে ১৭৮ খানি ছিল। এদেশে ১৩৫৪টি ছাপাখানা আছে। বাঙলাদেশেই ছাপাখানার সংখ্যা মান্দ্রাজের পরে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

শাসন ও ব্যবস্থাপক সভা

সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা বড়লাট বাহাদুর,—তিনি রাজপ্রতিনিধি বলিয়া তাঁহাকে ভাইস্‌রয় বলা হয়। তিনি সম্রাট্‌ কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তাঁহার কাজের জন্য বিলাতে ভারত সচিবের নিকট দায়ী; ভারত সচিব বা 'সেক্রেটারী অব্‌ ষ্টেট্‌স্‌ ফর ইণ্ডিয়া' বিলাতের মন্ত্রীসভা বা ক্যাবিনেটের অন্যতম সদস্য বা প্রধান মন্ত্রী অর্থাৎ প্রাইম মিনিষ্টারের মন্ত্রণা-সভার সভ্য। পার্লামেণ্টের নিকট ভারত সচিব ভারত শাসন বিষয়ে প্রত্যক্ষ-ভাবে দায়ী, পার্লামেণ্টে ভারত শাসন সংক্রান্ত সকল প্রকার প্রশ্নের উত্তর তিনিই দেন অথবা দেন তাঁহার সহকারী সেক্রেটারীরা।

বড়লাটকে সাহায্য করিবার জন্য একটি অধ্যক্ষ-সভা আছে; এই সভাকে বলে Governor-General in Council; এই সভার সদস্য-সংখ্যা ছয় জন; এছাড়া জঙ্গীলাট বা রণবিভাগের প্রধান সেনাপতি এই সভার অন্যতম মন্ত্রণাদাতা। বৈদেশিক রাজ্য, দেশীয় করদাতা মিত্ররাজ্য ও সীমান্তবাসীদের সহিত সম্বন্ধ স্বয়ং বড়লাট দেখেন।

বড়লাটকে মন্ত্রণা দিবার জন্য একটি Executive Council আছে। কাউন্সিলারগণ সম্রাট্‌ কর্তৃক নিযুক্ত হন; ইঁহাদের বার্ষিক বেতন ৮৮,০০০৲ করিয়া। শাসন সংক্রান্ত সকল প্রকার কার্য সপার্ষদ বড়লাট বাহাদুর সম্পন্ন করেন। জঙ্গীলাটকে লইয়া সভ্য সাতজন। যথা—(১) আভ্যন্তরীণ (Home), ভারতবর্ষের ভিতরের রাষ্ট্রনীতি, আইনবিচার, জেল-পুলিশ প্রভৃতি বিষয়। (২) বাণিজ্য ও রেলওয়ে। রেলওয়ের জন্য একটি রেলওয়ে বোর্ড আছে। (৩) শ্রমশিল্প ও শ্রমিক বিভাগ; শিল্প, শ্রম, ডাক, টেলিগ্রাফ এই বিভাগের অন্তর্গত। (৪) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগ। প্রদেশে এগুলি হস্তান্তরিত বিষয়; সাধারণ ভাবে পর্যবেক্ষণ ছাড়া বিশেষ কাজ কিছু নাই। (৫) আয়-ব্যয় বিভাগ। আয়-ব্যয় (finance) সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার, কর্মচারীদের বেতন,

বিদায়, পেনশন, মুদ্রা, ব্যাঙ্ক, বজেট্ প্রভৃতি এই বিভাগের কাজ। (৬) ব্যবস্থাপক বা আইন বিভাগ : নিখিল ভারতের জন্য আইন পাশ হয়; তাছাড়া প্রাদেশিক আইন ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরামর্শ দেন। (৭) সৈন্য বিভাগ : ইহার সদস্য কমাণ্ডার ইন্ চীফ বা জঙ্গীলাট। আর বৈদেশিক বা করদরাজ্য : সীমান্তের রাজা ও দেশের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা বড়লাটের নিজ বিষয়।

এই বিশাল সাম্রাজ্যের বিচিত্র কর্ম নির্বাহ করিবার জন্য দিল্লীতে প্রকাণ্ড দপ্তরখানা বা সেক্রেটারিয়েট্ আছে; গ্রীষ্মকালে এই অফিস আংশিকভাবে বড়লাটের গ্রীষ্মকালীন আবাস শিম্‌লা পাহাড়ে স্থানান্তরিত হয়। অধ্যক্ষ-সভা সাধারণত গ্রীষ্মকালে শিম্‌লায় ও অন্যসময়ে দিল্লীতে বসে। ব্যবস্থাপক সভা দিল্লী ও শিমলাতে বসে।

বড়লাটকে পরামর্শদান, আইন প্রণয়নাদি বিষয়ে শলা-পরামর্শ ও সহায়তা করিবার জন্য দুইটি ব্যবস্থাপক সভা আছে : (১) লেজিস্‌লেটিভ্ এসেম্ব্লী, ইহার ১৪৪ জন সদস্যের মধ্যে ১০৪ জন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে নির্বাচিত হন। বাঙলাদেশ হইতে ১৭ জন এসেম্ব্লী-সদস্য আছেন। অপর একটি সভায় অপেক্ষাকৃত ধনী লোকেরা আসিতে পারেন, তাহাকে (২) কাউন্সিল অব্ ষ্টেট্ বলে। ইহাতে সদস্য-সংখ্যা ৬৪, নির্বাচিত সভ্য-সংখ্যা ৩৪; ইহার মধ্যে বাঙলাদেশ হইতে মাত্র ৬ জন নির্বাচিত হন।

বর্তমান বাঙলাদেশ একজন লাট বা গবর্ণরের অধীন; কি ভাবে এই শক্তি ইংরেজদের হস্তে ধীরে ধীরে আসিয়াছে ও বাঙলাদেশ কিভাবে শাসিত হইয়া বর্তমান শাসননীতিতে পৌঁছিয়াছে, তাহা এইখানে আলোচনা করা যাক।

১৭৬৫ সালে ক্লাইব মুঘল বাদসাহের নিকট হইতে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করেন; ইতিপূর্বে তাঁহারা কার্যত বাঙলাদেশ শাসন আরম্ভ করিলেও কাগজে কলমে কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই। এই বৎসর বাঙলার অকর্মণ্য নবাব মীরজাফরের মৃত্যু হয় ও তাঁহার স্থানে নামেমাত্র এক নবাব মুর্শিদাবাদে রাখিয়া তাঁহারা দেওয়ানের কার্য সুরু করিলেন। ক্লাইব চলিয়া গেলে মাঝে আরও দুইজন গবর্ণর হইবার পর ওয়ারেন হেষ্টিংস কোম্পানীর শাসিত রাজ্যের গবর্ণর নিযুক্ত হইলেন (১৭৭২)।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রায় ২৫০ জন ইংরেজ অংশীদার ব্যবসায়ীদের একটা সঙ্ঘ ছিল; ১৬০০ সাল হইতে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত তাহারা ব্যবসা বাণিজ্য করিয়াছিল; পূর্বসাগরে তাহাদেরই একচেটিয়া বাণিজ্য করিবার অধিকার ছিল; কিন্তু ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমাররা ব্যবসাক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিত বলিয়া মাঝে মাঝে তাহাদের সহিত বিবাদ বাধিত। ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমান রাজা ও প্রজা য়ুরোপীয় বণিক্‌দিগকে দেশের মধ্যে অতিথিরূপে ব্যবসায়িরূপে স্থান দিয়াছিল; বহুবিধ সুযোগ-সুবিধা দান করিয়াছিল; তারপর গৃহস্বামীর আত্মীয়দের মধ্যে বিরোধের সুযোগে তাহারা ভারত মহাদেশের এককোণে রাজ্য স্থাপন করিল। ক্রমে সে-যুগের কোম্পানীর চাকরদের বিরুদ্ধে নানা কথা ইংল্যাণ্ডে পৌছিতে লাগিল। পার্লামেণ্ট আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না; কোম্পানীর কাজ পরিদর্শন করিবার জন্য তাহারা ১৭৭৩ সালে সর্বপ্রথম নিয়ম জারি করিল। এই বিধি রেগুলেটিং একট্ নামে পরিচিত। এই বিধি অনুসারে সর্বপ্রথম গবর্ণরের চারিজন সদস্য লইয়া এক পরিষৎ গঠিত হইল। ইহা ব্যতীত স্থির হইল, প্রতি বিশ বৎসর অন্তর কোম্পানীর কাজ-কর্ম তদারক করিয়া নূতন সনন্দ দেওয়া হইবে।

১৭৭৩ সাল হইতে ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত গবর্ণর-জেনারেল ভারত সাম্রাজ্য ও বাঙলাদেশের যুগপৎ শাসনকর্তা ছিলেন। তারপর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ধীরে ধীরে ইংরেজের অধিকারে আসিল; তখন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, বিহার-উড়িষ্যা, বাঙলা, আসাম সমস্তই 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী'র মধ্যে আসিয়া পড়িল; পৃথক্ ছিল কেবল বোম্বাই ও মান্দ্রাজ। ১৮৩৩ সালের সনন্দ গ্রহণকালে স্থির হইল, কোম্পানী আর বণিক্‌বৃত্তি করিবে না, সে ইংল্যাণ্ডেশ্বরীর হইয়া রাজ্য শাসন করিবে। তদনুযায়ী ১৮৩৪ সালে সকৌন্সিল গবর্ণর-জেনারেল নিখিল ভারতের বড়লাট হইলেন; কিন্তু কৌন্সিল বা পরামর্শদাতা ছাড়াই তিনি বাঙলা প্রেসিডেন্সীর গবর্ণররূপে কাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহার গুরু কার্যভার লাঘব করিবার জন্য ১৮৩৬ সালে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের (N. W. Province বর্তমান সংযুক্তপ্রদেশ বা U. P.) জন্য পৃথক্ ছোটলাট নিযুক্ত হইলেন। আরও আঠারো বৎসর বড়লাট সমগ্র ভারত ও বঙ্গদেশের লাটরূপে কাজ করিলেন; তারপর ১৮৫৩ সালে পুনরায় সনন্দ গ্রহণ করিবার

সময় কোম্পানীর সকল কর্মই প্রায় লোপ পাইল; এই সনন্দের সর্তানুসারে ১৮৫৪ সালে বাঙলাকে পৃথক্ ছোটলাটের হাতে দেওয়া হইল। তখন বাঙলা বলিতে বিহার-উড়িষ্যা, বাঙলা ও আসাম বুঝাইত। আরও কুড়ি বছর এইভাবে চলিবার পর ১৮৭৪ সালে আসাম, খাসিপর্বত ও সুরমা উপত্যকাকে পৃথক্ একটি প্রদেশ করিয়া গঠিত করা হইল ও একজন চীফ কমিশনরের উপর ইহার শাসনভার ন্যস্ত করা হয়। এই সময়ে রাজস্বের খাতিরে শ্রীহট্ট-কাছাড়কে আসামের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। ইহার পর বর্তমান বাঙলাদেশ, বিহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা এক ছোটলাটের অধীন হইল এবং এইভাবে ত্রিশ বৎসর চলিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া পূর্বোল্লিখিত আসাম প্রদেশের সহিত রাজসাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ যুক্ত করিয়া 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশ গঠিত হয়। নূতন প্রদেশের একজন ছোটলাট দেওয়া হইল; ইহার রাজধানী হইল ঢাকা, গ্রীষ্মাবাস হইল শিলং। বাঙলাদেশ বলিতে বুঝাইত প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান বিভাগ এবং বিহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা। ১৯০৫ হইতে ১৯১২ সাল পর্যন্ত এইভাবে শাসন চলিল। ১৯১১ সালের শেষে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ বাহাদুরের অভিষেক উপলক্ষ্যে দিল্লীতে যে দরবার হয়, তাহাতে ঘোষিত হয় যে, বঙ্গচ্ছেদ রদ হইল; অর্থাৎ প্রেসিডেন্সী, বর্ধমান, রাজসাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ লইয়া বাঙলাদেশ গঠিত হইল; ইহার জন্য একজন গবর্ণর নিযুক্ত হইলেন। আসাম পূর্বের ন্যায় হইল। আটত্রিশ বৎসর পূর্বে যেখানে একটি প্রদেশে একটি ছোটলাট, একটি আপিষ ছিল, সেখানে তিনজন লাটসাহেব, তিনপ্রস্থ আপিষ হইল; সুতরাং ব্যয় অসম্ভব-রূপে বাড়িল। ১৯৩৬ সালে উড়িষ্যা পৃথক্ হইয়া চারিটি প্রদেশ হইল।

১৯১২ সালে কলিকাতা হইতে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইল। কলিকাতা বাঙলার রাজধানী থাকিল।

ব্যবস্থা বা 'বিধি' প্রণয়ন, বিধানানুসারে কাজ না হইলে তাহার বিচার এবং বিচার বা আইনানুসারে শাস্তি বা দণ্ডদান 'শাসন' বিভাগের কার্য। ব্যবস্থাপক সভা আইনপ্রণয়ন করেন, হাইকোর্ট বিচার করেন, শাসন-বিভাগ শান্তিরক্ষার জন্য দণ্ডদান করেন; ইহাই হইতেছে গবর্মেণ্টের প্রধান *তিনটি বিভাগ* **Legisla'ive, Judicial, Executive.**

ভারতবর্ষের সমস্ত আইন, বিচার, শাসনের উৎস হইতেছে বিলাতের পার্লামেণ্ট বা প্রত্যক্ষভাবে ভারতসচিব। ভারতবর্ষের শাসনের জন্য দায়ী বড়লাট, কিন্তু তিনি তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা পাইয়াছেন বিলাত হইতে। হাইকোর্ট তাঁহার অধিকার পাইয়াছেন সম্রাটের নিকট হইতে। ভারতে যে কোনো আইন পাশ হউক না কেন, তাহা বিশেষ কয়েকটি মূল নীতিকে (যাহা পার্লামেণ্ট কর্তৃক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে) আশ্রয় করিয়াই হইতে পারে। বড়লাট যেমন কতকগুলি ক্ষমতা পাইয়াছেন, প্রাদেশিক শাসনকর্তাও তেমন কতকগুলি দায়িত্ব ও অধিকার লাভ করিয়াছেন; কিন্তু নির্দিষ্ট সুস্পষ্টভাবে লিখিত আইনের বাহিরে যাইবার অধিকার কাহারও নাই। বৃটীশ শাসন-নীতির ইহাই শ্রেষ্ঠ দান।

পার্লামেণ্টের বিধানানুসারে বড়লাট বাহাদুরের হস্তে কতকগুলি শক্তি অর্পিত আছে; অবশিষ্ট কতকগুলি প্রাদেশিক লাটের উপর ন্যস্ত। কিন্তু পার্লামেণ্টের প্রধান মন্ত্রীর সহিত প্রত্যক্ষভাবে কোনো সম্বন্ধ ইঁহাদের নাই। বৃটীশ পার্লামেণ্টের মতামত ভারত-সচিব বড়লাটকে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বোম্বাই ও মান্দ্রাজের লাট সাহেবকে জানান। ভারত রক্ষা, সৈন্যবিভাগ (স্থলসৈন্য, নৌবাহিনী ও আকাশবাহিনী), দেশীয় রাজা ও সীমান্তদেশের রাজাদের সহিত সম্বন্ধ বা বৈদেশিক সম্বন্ধ, রেলওয়ে, ডাক ও তারবিভাগ, মুদ্রাযন্ত্র (mint ও currency), জাতীয় ঋণ ও সুদ, বাণিজ্য, শুল্ক, ব্যাঙ্কিং প্রভৃতি বিষয়গুলি বড়লাটের তত্ত্বাবধানে; প্রাদেশিক শাসনকর্তার এসব বিষয়ে কোনো অধিকার নাই। এগুলি ছাড়া ভূতত্ত্ববিভাগ, উদ্ভিজ্জবিভাগ, পুরাতত্ত্ববিভাগ, সার্ভে, প্রাণীতত্ত্ববিভাগ, আবহবিদ্যা, সেন্সাস বা আদমসুমার, কপিরাইট্, পেটেণ্ট, পেট্রোলিয়ামের ব্যবস্থা, খনি বন্দবস্ত (এবিষয়ে ভারত-সচিবের মত লইতে হয়) প্রভৃতিও বড়লাটকে দেখিতে হয়। এছাড়া প্রাদেশিক দেওয়ানী বা ফৌজদারী কোনো নূতন আইন পাশ হইলে, অর্ডিনান্স জারি করিতে হইলে বড়লাটের মত লইতে হয়। শুল্ক, আয়কর, দেশীয় রাজাদের কর প্রভৃতির আদায় খরচ তাঁহার কর্তব্যের অন্তর্গত। এতৎসত্ত্বেও প্রাদেশিক লাটসাহেবের ক্ষমতা প্রচুর।

১৭৭৩ অব্দের রেগুলেটিং একট্ অনুসারে কোম্পানী-অধিকৃত ভারত-

বর্ষের শাসনের জন্য একজন গবর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার চারিজন পরামর্শদাতা সদস্য নিযুক্ত হন। গবর্ণর-জেনারেলের বার্ষিক বেতন ২৫,০০০ পাউণ্ড ও প্রত্যেক মন্ত্রীর ১০,০০০ পাউণ্ড করিয়া ধার্য হয়। বড়লাটকে এই মন্ত্রীপরিষদের মত লইয়া কাজ করিতে হইত; ফলে হেষ্টিংস ও তাঁহার মন্ত্রীদের মধ্যে নিয়ত যে বিবাদ চলিত, তাহা ইতিহাস-পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। গবর্ণর-জেনারেল তথা বাঙলার শাসনকর্তা ও তাঁহার শাসন-পরিষদের তত্ত্বাবধানে বোম্বাই ও মাদ্রাজকে চলিতে হইত। এই সময়ে আরও স্থির হয় যে, প্রত্যেক কুড়ি বৎসর অন্তর, কোম্পানীকে বাণিজ্য করিবার জন্য অধিকার দিবার সময় নূতন সনন্দ গ্রহণ করিতে হইবে; সেই সময়ে শাসিত কালের একটা হিসাব-নিকাশ পার্লামেণ্ট লইবেন। ১৭৮৪ সালে বোম্বাই ও মাদ্রাজ গবর্ণরকে সাহায্য করিবার জন্য একটি কাউন্সিল দেওয়া হইল। এছাড়া পার্লামেণ্ট একটি বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল কোম্পানীর কাজ তদারক করিবার জন্য গঠিত করিলেন; ১৭৮৬ সালে কর্ণওয়ালিস্ গবর্ণর-জেনারেল হইয়া অসিবার সময় পার্লামেণ্ট ও কোম্পানীর নিকট হইতে পরিষদের মতকে নাকোচ করিবার অধিকার দাবী করেন, ও তাহা পাইলে এদেশে আসেন। ১৭৯৩ সালে বোম্বাই ও মাদ্রাজের গবর্ণররাও মন্ত্রীদের পরামর্শ নাকোচ করিবার অধিকার লাভ করেন। ১৮৩৩ সালে কোম্পানীকে সনন্দ দান করিবার সময় বাণিজ্য অধিকার প্রায় উঠাইয়া লইয়া, শাসন কার্য প্রধান কর্তব্য বলিয়া ঘোষণা করা হইল। এইবার সনন্দ লইবার সময় ঠিক হয় যে, পূর্বের তিনজন সদস্য ছাড়া একজন আইন-সদস্য নিযুক্ত হইবেন। লর্ড মেকলে ভারতের প্রথম আইন-সদস্য; এইখানেই ব্যবস্থাপক সভার সূত্রপাত। ১৮৩৪ সালে সমগ্র ভারতের শাসনভার ন্যস্ত হইল সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেলের উপর; কিন্তু তিনি বাঙলার লাটরূপে মন্ত্রীপরিষদ্ বিনাই শাসন করিতে লাগিলেন; ১৮৩৪ হইতে ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত বাঙলার ছোটলাটের কোনো মন্ত্রীপরিষদ্ ছিল না। বড়লাটের শাসনের আওতায় থাকায় বাঙলার ক্ষতিই হইয়াছিল; কারণ বোম্বাই ও মাদ্রাজ ১৭৮৪ সাল হইতে মন্ত্রীপরিষদ পাইয়াছিল; এবং ছোটলাট নিযুক্ত হইবার ৬৪ বৎসর পর মন্ত্রীপরিষদ

বাঙলাদেশে নিযুক্ত হয়। ১৮৫৩ সাল হইতে কোম্পানী নামে মাত্র থাকিল, রাজ্যশাসনই তাহার প্রধান কাজ হইল। এই বৎসর স্থির হইল পূর্বের চারি জন সদস্য ছাড়া আরও আট জন সরকারী কর্মচারীকে বড়লাটের সভার সদস্য বলিয়া আহ্বান করা হইবে। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা সুরু হইল।

সিপাহী বিদ্রোহের পর বৃটীশ পার্লামেণ্ট স্বয়ং বৃটীশ ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। ১৮৬১ সালে ইণ্ডিয়া কাউন্সিল একট্ পাশ হয়; ইহার দ্বারা বড়লাটের আইন সভার অনেক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইল। পূর্বে বলিয়াছি, ১৮৫৪ সালে বাঙলার জন্য পৃথক্ ছোটলাট নিযুক্ত হন; কিন্তু প্রথম দিকে কোনো ব্যবস্থাপক সভা বা আইন সভা তাঁহাকে সহায়তা করিবার জন্য তিনি পান নাই; বোম্বাই ও মান্দ্রাজের গবর্ণরের অধ্যক্ষ সভার ন্যায় তাঁহার অধ্যক্ষ সভাও ছিল না। যাহাই হৌক ১৮৬২ সাল হইতে আইন প্রণয়নে সহায়তা করিবার জন্য ১২ জন সদস্যকে মনোনীত করা হইল। বাঙলায় ব্যবস্থাপক সভার পত্তন হইল। ১৮৬২ সালে ১লা ফেব্রুয়ারী বাঙলার প্রথম কাউন্সিলের অধিবেশন হয়।

আরও ত্রিশ বৎসর পরে ব্যবস্থাপক সভার অধিকার একটু বাড়ানো হইল; কিন্তু তাহাও অত্যন্ত সাবধানতার সহিত। ১৮৯২ সালে ঠিক হইল সদস্যের সংখ্যা ২০-এর অধিক হইবে না; ইহার মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক হইলেন সরকারী কর্মচারী, ৭ জনকে বাঙলার ছোটলাট নানা প্রতিষ্ঠান হইতে মনোনীত ও অপর তিনজনকে ইচ্ছামত আহ্বান করিবেন; মোট কথা, তখন নির্বাচন প্রথা বলিয়া কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এই সময়ে প্রাদেশিক সভাকে কিছু কিছু প্রশ্নোত্তর করিবার অধিকার দেওয়া হয়। বে-সরকারী সভ্যেরা নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান হইতে মনোনীত হইতেন; তখনো নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হয় নাই।

(১)	কলিকাতা কর্পোরেশন	১ জন
(২)	ম্যুন্সিপালটি	১ ,,
(৩)	জেলা বোর্ড	২ ,,
(৪)	জমিদার সভা	১ ,,
(৫)	বণিক্ সভা	১ ,,
(৬)	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১ ,,

আরও অনেক বৎসর কাটিয়া গেল; ইতিমধ্যে স্বদেশী আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। ১৯০৭ সালে ভারত-সচিব মর্লী ও বড়লাট মিণ্টোর চেষ্টায় কতকগুলি সংস্কার সাধিত হইল। ব্যবস্থাপক সভার সদস্য-সংখ্যা ২০র স্থানে ৫০ করা হইল; এই সময় সাম্প্রদায়িক নির্বাচন বিধি প্রথম প্রবর্তিত হয়; মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হইল; ইতিপূর্বে রাষ্ট্রনীতির মধ্যে ধর্ম-বিশ্বাসের কথা আসে নাই। কিন্তু এখনো প্রত্যক্ষ নির্বাচন-বিধি এদেশে প্রচলিত হয় নাই,—বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে গবর্ণর কর্তৃক মনোনীত সভ্যের বদলে প্রতিষ্ঠান কতৃক নির্বাচিত সদস্য ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত হইবার নীতি প্রবর্তিত হইল। এই ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচিত সভ্যগণ ভাবে আসিতেন;

কলিকাতা কর্পোরেশন	১
বিশ্ববিদ্যালয়	১
ম্যুন্সিপালটি	৬
জেলা বোর্ড	৬
জমিদার	৫
মুসলমান	৪
বঙ্গীয় বণিক্ সভা	২
কলিকাতা ট্রেড এসোসিয়েশন	১
মোট	২৬

বড়লাটের অনুমতি লইয়া ছোটলাট ২২ জন সদস্য মনোনীত করিলেন; ইহার মধ্যে ১৭ জনের বেশি সরকারী সভ্য হইতে পারিত না; ২ জন বে-সরকারী সভ্য মনোনীত করিতেন—একজন ভারতীয় বণিক্ সঙ্ঘ, অপর জন চা-কর সমিতি হইতে। এছাড়া আরও দুই বা ততোধিক বিশেষজ্ঞকে মনোনীত করিতে পারিতেন।

১৯০৯ সালের একটু অনুসারে ছোটলাটকে পরামর্শ দিবার জন্য একটি অধ্যক্ষ সভা (Executive Council) গঠিত হইবার বিধি হইল। এই সভার সদস্য সংখ্যা ৩ বা ৪। এখনো অধ্যক্ষ সভা সেইভাবে চলিতেছে।

১৯১০ সালের নবেম্বর মাসে বাঙলার প্রথম অধ্যক্ষ সভা মিলিত হইল। বাঙলার ব্যবস্থাপক সভা হইবার ৪৮ বৎসর পরে অধ্যক্ষ সভা গঠিত হইল। বাঙলাদেশে একটি বড় রকম বিষয় প্রবর্তিত হইল।

ইহার পর আরও কয়েক বৎসর চলিয়া যায়; ১৯১৪ সালে য়ুরোপীয় মহাসমর আরম্ভ হয়; ভারতবাসী ধন-প্রাণ দিয়া সাম্রাজ্য রক্ষার সহায়তা করিবার জন্য অগ্রসর হইল; কংগ্রেস ও দেশের নেতারা ভাবিলেন ইংরেজ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতেছেন। যুদ্ধান্তে তাঁহারা ভারতবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবেন। ১৯১৭ সালের আগষ্ট মাসে তৎকালীন ভারত-সচিব ঘোষণা করিলেন যে, ভারতকে ক্রমশ দায়িত্বপূর্ণ শাসন সংস্কারের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে। অনেক কমিশন, বৈঠক, সভা, ও সাক্ষ্য গ্রহণের পর ১৯২১ সালে নূতন শাসন প্রণালী প্রবর্তিত হইল। নূতন বিধানানুসারে এখনো শাসন চলিতেছে। সাইমন কমিশন, গোলটেবিল বৈঠক প্রভৃতির ফলে আর একদফা সংস্কার হইতেছে।

১৯২১ সালের সংস্কারে বাঙলার শাসন বিভাগের অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৯০৭ সালে প্রবর্তিত শাসনে ব্যবস্থাপক সভায় ৫০ জন সদস্য নিযুক্ত হন। তারপর ১৯১০ সাল হইতে গবর্ণরের অধ্যক্ষ-সভা বা Executive Council হয়; তাহাতে ৪ জন সদস্য মনোনীত হন। ১৯২১ সালের বিধি অনুসারে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য-সংখ্যা হইয়াছে ১৪৪ জন। সাধারণত তিন বৎসর কাল এই সভা কাজ করে। কিভাবে এই সদস্যগণ নিযুক্ত হন, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি,—

(১) অধ্যক্ষ সভা বা Executive Council-এর সদস্যগণ পদ-গৌরবে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য—৪ জন।

(২) ১১৬ জন নির্বাচিত সদস্য।

(৩) গবর্মেণ্ট কর্তৃক মনোনীত সদস্য সংখ্যা ২৬ জনের বেশী হইবে না; ইহার মধ্যে অধ্যক্ষ-সভার সদস্যগণ, সরকারী কর্মচারী, বে-রকারী সদস্য; এতদ্ব্যতীত ভারতীয় খ্রীষ্টান সমাজ, অন্ত্যজ সমাজ, শ্রমিক সঙ্ঘ হইতে সদস্য মনোনীত করা হয়।

ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণ ইতিপূর্বে বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক

নির্বাচিত হইয়া কৌন্সিলে যাইতেন; তখনকার নির্বাচনে পরোক্ষ প্রথা (Indirect representation) ছিল। এখন সদস্য বা কৌন্সিলারগণ সাধারণ বা বিশেষ নির্বাচন মণ্ডলী (constituency) কর্তৃক ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হন। 'সাধারণ নির্বাচক মণ্ডলী' বলিলে মুসলমান, অ-মুসলমান (হিন্দু বলিয়া কোনো নির্বাচক মণ্ডলী ভারতে নাই), য়ুরোপীয় ও এংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় বুঝায়। 'বিশেষ নির্বাচক মণ্ডলী' বলিলে বুঝায় নানা প্রতিষ্ঠান—যেমন জমিদার সভা, বিশ্ববিদ্যালয়, বণিক্ সম্প্রদায়, শ্রমিক সম্প্রদায়ের নির্বাচকমণ্ডলী বা ভোটারগণ।

এখন দেখা যাক্, কাহারা এই সাধারণ নির্বাচক মণ্ডলীতে ভোট বা মত দিতে পারে। বিধিবদ্ধ নিয়ম হইতেছে,—সম্বহুলতা বা ভোটাধিক্যে সদস্যগণ নির্বাচিত হইবেন। সাধারণ নির্বাচক মণ্ডলীর ভোটারগণ (ক) সম্প্রদায় ও (খ) বাসস্থান দিয়া প্রথমে বিভক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ (১) মুসলমান ও অ-মুসলমান সম্প্রদায় এবং (২) নগর ও গ্রামের বাসস্থান লইয়া বিভক্ত হইয়াছে অর্থাৎ এই চারিপ্রকার মণ্ডলী বা constituency হইতে কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। (১) যাহারা কোনও বাড়ীর মালিক, (২) মুনিসিপালিটি বা ক্যাণ্টনমেণ্টের সীমানার মধ্যে বাস করে, (৩) ১৮৮০ সালে সেস্ একট্ অনুসারে রোড্ সেস্ বা জল সেস্ দেয়, (৪) য়ুনিয়ান বোর্ড বা চৌকিদারীতে নির্দিষ্ট ট্যাক্স দেয়, (৫) আয়কর দেয়, (৬) সামরিক কর্মে নিযুক্ত থাকে, বা (৭) যাহার জমিজমা আছে—তাহারাই প্রাদেশিক কাউন্সিলের ভোট দিতে পারে।

বিশেষ নির্বাচক মণ্ডলীতে ভোট দিবার অধিকার সেই সেই নির্বাচক মণ্ডলীসংক্রান্ত নিয়মের উপর নির্ভর করে।

১৯২১ সালের মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট অনুসারে বাঙলার গবর্ণরের পূর্ববর্ণিত অধ্যক্ষ-সভা বা Executive Council-এর সঙ্গে একটি 'মন্ত্রী পরিষদ্' (Ministers) তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য গঠিত হইয়াছিল।

উক্ত বিধানানুসারে প্রাদেশিক শাসন-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছিল; কতকগুলি বিষয় লাটসাহেবের দ্বারা 'রক্ষিত'—ইহাকে 'রিজার্ভ বিষয় বলা হয়; আর কতকগুলি বিষয় ব্যবস্থাপক সভার

সদস্যদের মধ্য হইতে মনোনীত 'মন্ত্রীপরিষদে'র উপর ন্যস্ত। এই নিয়মানুসারে আয়-ব্যয়, পুলিশ ও শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপার, গবর্ণরের অধ্যক্ষ-সভার তিনজন বা চারিজন সদস্যের উপর ন্যস্ত। এইসব রক্ষিত বা রিজার্ভ বিষয়ের ব্যয়ের জন্য যে টাকা গবর্মেণ্ট চাহেন, তাহা ব্যবস্থাপক সভা বাজেটের সময় পাশ করিতে বাধ্য; না পাশ করিলে গবর্ণরের বিশেষ ক্ষমতা বলে তাহা তিনি (certify) 'পাশ' করিতে পারেন।

হস্তান্তরিত বা ট্রান্সফার্ড বিষয়গুলির ভার দেশীয় মন্ত্রীদের উপর; বাঙলাদেশে প্রায়ই তিনজন করিয়া মন্ত্রী থাকেন; কখনো একজন মুসলমান দুইজন হিন্দু, কখনো দুইজন মুসলমান একজন হিন্দু। এই মন্ত্রীদের উপর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, পূর্তকার্য, স্বায়ত্বশাসন ও ভূমি বন্দবস্ত কার্যের ভার অর্পিত। দেশীয় মন্ত্রীদের হস্তে যেসব বিষয় অর্পিত আছে, তাহার ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যবস্থা অর্থসচিব বাজেটে করিয়া দেন; সে-টাকা মঞ্জুর করা, না-করা সম্পূর্ণরূপে ব্যবস্থাপক সভার উপর নির্ভর করে; তাঁহারা হস্তান্তরিত বিষয়ের জন্য অধিক দাবী করিতে পারেন, কিন্তু অর্থসচিব তাহা দিতে বাধ্য নহেন। প্রয়োজন হইলে মন্ত্রী মহাশয় তাঁহাদের উপর অর্পিত বিষয়ের পরিচালনা ও উন্নতির জন্য পুনরায় নূতন কর ধার্য বা ঋণগ্রহণ করিতে পারেন। মোট কথা, ভারত সরকারের দাবী (প্রত্যক্ষ দাবী ১৯২৬ হইতে উঠিয়া গিয়াছে), লাটসাহেবের রক্ষিত বিষয়গুলির চাহিদা পুরণ করিয়া যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকে, তাহাই দেশীয় মন্ত্রিগণ 'হস্তান্তরিত' বিষয়ের জন্য ব্যয় করিতে পান। এই শাসন পদ্ধতিকে Dyarchy বা দ্বৈরাজ্য বলা হয়।

সদস্য কাহারা হইতে পারে, সে সম্বন্ধে পূর্বেই বলিয়াছি: কাউন্সিলের সদস্য হইবার উপযুক্ত ব্যক্তিরা নির্বাচনপ্রার্থী (candidate) হইয়া গবর্মেণ্টকে জানাইয়া দেন ও আড়াই শতটাকা গচ্ছিত রাখেন; এক একটি এলাকার জন্য দুই তিনজন লোক দাঁড়ান; অনেক সময়ে বিভিন্ন দলের লোক নির্বাচনপ্রার্থী হন। ইতিমধ্যে গ্রামে-গ্রামে, সহরে সহরে 'ক্যানভাস্' চলে; নির্দিষ্ট দিনে 'পোলিং ষ্টেশনে' কোনো সরকারী কর্মচারীর সমক্ষে বন্ধ-করা বাক্সের মধ্যে ভোটের কাগজ নিক্ষেপ করিয়া ভোটার ভোট দেন; বিভিন্ন

'পোলিং ষ্টেশন' বা ভোট-সংগ্রহের স্থান হইতে বাক্সগুলি সদরে আসে ও বিশিষ্ট সরকারী-কর্মচারীর সমক্ষে সেগুলির গণনা হয়। অধিকাংশের মত-প্রাপ্ত ব্যক্তি নির্বাচিত হন। নির্দিষ্ট নিম্নতম সংখ্যা না পাইলে গচ্ছিত টাকা বাজেয়াপ্ত হয়। অনেক সময়ে কোনো নির্বাচনপ্রার্থী অসাধু উপায়ে বা বে-আইনীভাবে ভোট সংগ্রহ করিয়া অধিকাংশ ভোট সংগ্রহ করিয়াছে—এরূপ অভিযোগ প্রতিপক্ষ আদালতে করিয়া থাকেন, তাহা প্রমাণিত হইলে গবর্মেণ্ট সে-নির্বাচন নাকোচ করিয়া দেন। মুসলমানদের জন্য পৃথক্ নির্বাচন হয়; অ-মুসলমানদের জন্য পৃথক্। সাধারণ নির্বাচন ছাড়া বিশেষ বিশেষ নির্বাচক মণ্ডলী আছে; যেমন কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েটরা দুইজন সদস্য নির্বাচন করেন; য়ুরোপীয় এসোসিয়েশন, বণিক্ সঙ্ঘ প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ সদস্য নির্বাচন করিয়া কাউন্সিলে পাঠাইয়া থাকেন।

এখন এই কাউন্সিলের কি কর্তব্য দেখা যাক্। আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে, আইন বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য ১৮৩৪ সালে মেকলে সাহেবকে প্রথম আইন-সদস্যরূপে এদেশে আনা হয়। তারপর কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন পৃথক্ হইয়া গেলে বাঙলার ছোটলাটকে আইন প্রণয়ন বিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য ১৮৬২ সালে সর্বপ্রথম ১২ জন সদস্যকে মনোনীত করিয়া দেওয়া হয়। বর্তমানে সেই সভার নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা ১১৬।

আইন-প্রণয়ন, বাজেট সম্বন্ধে আলোচনা ও গবর্মেণ্টের কার্যকলাপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার অধিকার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য বা কাউন্সিলারদের আছে। প্রথমে আইন সম্বন্ধেই কথাটা পাড়া যাক্। দেশের মধ্যে হঠাৎ একদিন কতকগুলি আইন তৈরী হয় নাই; বহুকাল হইতে লোকাচার, হিন্দুশাস্ত্র মত বিধি-ব্যবস্থা, হিন্দু ও মুসলমান শাসন যুগের নিয়ম-কানুন, মুসলমান ধর্ম ও সমাজের বিধি-বিধান, স্থানভেদে একই বিষয়ের বিভিন্ন নিয়ম ও আচার চলিয়া আসিতেছে। ইহার অনেকগুলিকে ইংরেজ এদেশের রাজা হইয়া মানিয়া লইয়াছিল। তাছাড়া কতকগুলি লিপিবদ্ধ আইন কোম্পানীর আমলে দেশ মধ্যে প্রচলিত হয়,—যেমন (১) পার্লামেণ্ট-কৃত আইন; ইহা অমোঘ, ইহা বদলাইবার অধিকার কাহারও নাই। ভারতের

সকল প্রতিষ্ঠানের অধিকারের উৎস হইতেছে পার্লামেণ্ট। (২) গবর্ণর-জেনারেলের আইন; ১৮৩৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি যে-সব আইন জারি করিয়াছেন তাহাকে 'রেগুলেশন' বলে; (৩) ১৮৩৪ সালের পর সপারিষদ্ গবর্ণর-জেনারেল ও ১৮৬১ সালের আইনানুসারে গবর্ণর-জেনারেল-বা ভাইসরয় আইন পাশ করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন। (৪) সামরিকভাবে 'অর্ডিনান্স' আছে। (৫) বঙ্গীয় কাউন্সিলের আইন।

প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত আইনের পরিবর্তন ও নূতন আইনের প্রবর্তন মাঝে মাঝে দেশমধ্যে প্রয়োজন হয়। তখন সরকার পক্ষ হইতে বা বে-সরকারী পক্ষ হইতে সদস্যেরা বিল্ বা আইনের খশ্ড়া প্রস্তুত করিতে পারেন। বিলের খশ্ড়া প্রস্তুত করিয়া গবর্মেণ্টের অনুমতি লইয়া দেশের মতামতের জন্য উহা 'কলিকাতা গেজেট' ও অন্যান্য সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হয়। তারপর ইহা লইয়া দেশময় কাগজে পত্রে সভা-সমিতিতে আলোচনা চলে; এই আলোচনা দ্বারা গবর্মেণ্ট দেশের লোকের মনোভাব জানিতে পারেন। আইন-খশড়াটির মধ্যে সমস্ত ধারাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিবার জন্য অধিকাংশ সময়ে বিলটিকে একটি সিলেক্ট কমিটি বা কাউন্সিলারদের মধ্য হইতে জন কয়েক বিশেষজ্ঞের নিকট প্রেরণ করা হয়। ইহার পর আলোচনার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় বিলটিকে উপস্থিত করা হয়; অধিকাংশের মতে উহা গৃহীত বা বর্জিত হয়।

বে-সরকারী বিল সম্বহুলতা বা ভোটের দ্বারা জয়যুক্ত হইলেই তাহা আইন হয় না; বিলাতে হাউস্ অব্ কমন্স তিনবার যদি কোনো বিল্ পাশ করে, তবে তাহাকে লর্ডদের বা রাজার মতের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না, সে আপনা হইতে আইন হইয়া যায়; কিন্তু এদেশে বিল্ পাশ হইলে তাহা গবর্ণর ও গবর্ণর-জেনারেলের মতের জন্য অপেক্ষা করে। ব্যবস্থাপক সভায় বিল পাশ হইয়াছে বলিয়া লাটসাহেব উহাতে মত দিতে বাধ্য নহেন; সাম্রাজ্যের কল্যাণের দিকে চাহিয়া তিনি তাহা নাকোচ (veto) করিতে পারেন। আবার সরকারী বিল যদি সদস্যদের সংখ্যাধিক্য বশত ভোটে পরাজিত হয়, তবে তাহা আইন হইবে না, এমন নীতিও অনুসৃত হয় না; পরিত্যক্ত বিল যদি দেশের শান্তি ও কল্যাণের

জন্য হয় বলিয়া গবর্ণর মনে করেন, তবে তিনি উহাকে 'সার্টিফাই' করিতে পারেন। এসব ক্ষেত্রে বড়লাটের সহিত পরামর্শ করাই রেওয়াজ।

আইন প্রণয়ন হইয়া গেলে তাহা কোন তারিখ হইতে বলবৎ হইবে তাহা ঘোষিত হয়।

আইন প্রণয়ন ছাড়া বজেট পাশ করা ব্যবস্থাপক সভার একটা বড় রকম কর্তব্য। দেশের নানাবিধ শুল্ক, কর, খাজনা হইতে যে রাজস্ব প্রতি বৎসর আদায় হয়, তাহা কিভাবে ব্যয়িত হইবে, তাহার জন্য বৎসরের গোড়ায় একটা বাজেট বা ভাবী আয়-ব্যয়ের একটা খশড়া অধ্যক্ষ-সভার অন্যতম সদস্য অর্থসচিব কাউন্সিলে উত্থাপন করেন। আয় হইতে ব্যয় যদি বেশি হয়, তখন গবর্মেণ্টকে সেই ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য নানা উপায় ভাবিতে হয়; যদি ব্যয় সঙ্কোচ করা সম্ভব না হয়, তবে নূতন কর ধার্য করাই ঠিক হয়; যদি কোনো বৎসর টাকা বিশেষভাবে উদ্বৃত্ত থাকে, নূতন কর হ্রাস বা উঠাইয়া দেওয়া হয়; কখনো কখনো ব্যয় সঙ্কোচের জন্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন কাটা হয়, নানা বিভাগে সরকারের দেয় টাকার পরিমাণ কম্‌তি হয়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি বাঙলাদেশের সমস্ত আয় বাঙলা গবর্মেণ্ট পান না; ভূমিরাজস্ব, ষ্ট্যাম্প, রেজিষ্ট্রেশন, বনভূমি হইতে যে আয় হয়, তাহাই বাঙলা গবর্মেণ্ট পাইয়া থাকে; বাঙলার আয়কর, শুল্ক, লবণ-কর ভারত গবর্মেণ্টকে দিতে হয়। বাঙলার রাজস্ব হইতে প্রথমে 'রিজার্ভ' বিষয়গুলির জন্য টাকা রাখিতে হয়; সেগুলির জন্য যে-দাবী অর্থসচিব সরকার পক্ষ হইতে করেন, তাহা পূরণ করিতেই হয়; সে-সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভা আলোচনা করিতে পারেন মাত্র। কিন্তু ভোটের দ্বারা গবর্মেণ্টকে পরাভূত করিয়া সরকারী চাহিদার বরাদ্দ বন্ধ করিতে পারেন না। অবশিষ্ট টাকা হস্তান্তরিত বিষয়ের জন্য রাখা হয়; তাহা পর্যাপ্ত না হইলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিভাগে ব্যয় সঙ্কোচ আরম্ভ হয়। এইসব বিষয়ের জন্য ব্যবস্থাপক সভার টাকা মঞ্জুর, না-মঞ্জুরের অধিকার আছে; এমন কি, মন্ত্রীদের বেতন (প্রত্যেকের বেতন বার্ষিক ৬৪ হাজার) পর্যন্ত অগ্রাহ্য করিতে পারে। চিত্তরঞ্জন দাশ ও স্বরাজ্যদল বাঙলা ব্যবস্থাপক সভায় তুইবার এইভাবে মন্ত্রীদের বেতন বন্ধ করেন। মন্ত্রী না থাকিলে লাটসাহেব

অধ্যক্ষ-সভার সভ্যদের মধ্যে মন্ত্রীদের কাজ ভাগ করিয়া দেন। বর্তমানে আইন করিয়া এইরূপ দলাদলির দ্বারা মন্ত্রীদের বেতন নাকোচ করিবার অধিকার লোপ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং উহা সাধারণ শাসন-সংক্রান্ত খরচার অন্তর্গত করা হইয়াছে।

বাঙলাদেশে ৫ কোটি ১০ লক্ষ লোকের মধ্যে ১৩ লক্ষ লোক কাউন্সিলে ভোট দিবার অধিকারী; অর্থাৎ জন-সংখ্যার শতকরা ৩ জন মাত্র। ভোটারের তালিকা প্রস্তুত হয়, তাহাদের অর্থ ও বিদ্যা বিচার করিয়া। যাহার ম্যুন্সিপালটিতে বাৎসরিক ১৷৷০, গ্রামে রোড সেস্ অন্ততঃ ১৲ বা য়ুনিয়ন বোর্ড ট্যাক্স ২৲ বৎসরে দেয়, তাহারাই ভোটার। যাহারা আয়কর দেয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েট তাহারা ভোট দিতে পারে। এসম্বন্ধে অনেক বিস্তৃত নিয়ম-নিষেধ আছে।

১৯২১ সালের শাসন সংস্কার অনুসারে বাঙলাদেশের বর্তমান

কাউন্সিলে গবর্মেণ্ট মনোনীত সরকারী কর্মচারী সদস্য	১২
,, ,, ,, বেসরকারী সদস্য	১০
অধ্যক্ষ-সভার সদস্য	৪
অমুসলমান—শহরবাসী	১১
,, গ্রামবাসী	৩৫
মুসলমান—শহরবাসী	৬
,, গ্রামবাসী	৩৩
হরিজন	১
অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্	২
দেশীয় খ্রীষ্টান	১
শ্রমিক সভ্য	২
য়ুরোপীয় এসোসিয়েশন	৫
জমিদার সভার সভ্য	৫
কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২
বণিক্ সভা—বৃটীশ বণিক্ সভা	১১
,, দেশীয় বণিক্ সভা	৪

১৯২১ সালের নূতন শাসন প্রবর্তিত হইবার সময়ে কথা হয় দশ বৎসর পর শাসন-প্রণালীর মধ্য কি কি পরিবর্তন হইতে পারে, তাহা মীমাংসা করিবার জন্য বিলাত হইতে এক কমিশন আসিবে। সেই ব্যবস্থানুসারে ১৯২৯ সালে এক তদন্ত কমিটি আসে; ইহার সভাপতি ছিলেন স্যর জন সাইমন; সেইজন্য এই বৈঠককে 'সাইমন্ কমিশন' বলে। এই কমিশন ভারতবর্ষ ঘুরিয়া প্রাদেশিক শাসন বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করেন ও এক বিস্তৃত প্রতিবেদন প্রকাশ করেন।

সাইমন কমিশন রিপোর্ট প্রকাশের ফলে ও দেশের মধ্যে রাজনৈতিক দাবী লইয়া অশান্তি সৃষ্টি হওয়ায় বৃটীশ গবর্মেণ্ট স্থির করিলেন যে, সর্বদলের প্রতিনিধি লইয়া লণ্ডনে এক রাউণ্ড টেবল্ কনফারেন্স বসিবে। এই বৈঠকের উদ্দেশ্য ভারতের জন্য একটি রাষ্ট্র-কাঠামো বা কন্‌ষ্টিটিউশন প্রস্তুত করা। প্রথম বৈঠকে গান্ধীজিকে আহ্বান করা হয় নাই। দ্বিতীয় সভায় তিনি উপস্থিত হন। বহুকাল হইতে রাজনীতির মধ্যে ধর্মের আমদানী হইয়াছিল; নূতন রাষ্ট্র-কাঠামো বা কন্‌ষ্টিটিউশনে নানা ধর্মের লোকের কি পরিমাণ অধিকার হইবে, তাহা লইয়া বহুকাল হইতে আলোচনা চলিতেছিল; সে-বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো মীমাংসা হয় নাই। বিলাতের গোল টেবিল সভার পূর্বে কয়দিন ধরিয়া নানা সম্প্রদায়ের নেতাদের মধ্যে অনেক আলাপ-আলোচনা হয়, কিন্তু কাহারো সহিত কাহারো মিল হইল না। মুসলমানরা সঙ্ঘবদ্ধ, তাহারা মিঃ জিন্না ও মহামান্য আগাখাঁর দাবীকে মানিয়া লইয়াছিল; কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে একমত হয় নাই; গান্ধীজি বহু চেষ্টায় কিছু করিতে পারিলেন না। অবশেষে প্রধান মন্ত্রীর উপর বিচারের ভার অর্পণ করা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকিল না; তিনি যে ব্যবস্থা করিলেন তদনুসারে রাষ্ট্র-কাঠামোর ভিত্তি ধর্মের উপর দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হইল এবং জাতীয়তামূলক রাষ্ট্র-কাঠামো গঠনের আশা সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইল। প্রধান মন্ত্রীর বিচারে কেবল হিন্দু-মুসলমানে ভেদ ছাড়া হিন্দুদের মধ্যে বর্ণ-হিন্দু ও অন্ত্যজ হিন্দু এই দুই নূতন ভাগ করা হইল। হিন্দু সমাজের মধ্যে এই ভেদের প্রতিবাদকল্পে মহাত্মাজী পুণা জেলে অনশন করেন। সেই সময়ে তাঁহার সহিত

অন্ত্যজ শ্রেণীর নেতা ডাঃ আমবেদকরের একটা আপোষ হয়; এই আপোষ 'পুণা প্যাকট্' নামে পরিচিত। বর্ণ-হিন্দু ও অন্ত্যজ হিন্দুর মধ্যে আপোষকে ভারত গবর্মেণ্ট ও ভারতসচিব স্বীকার করিয়া লন এবং তাহারই উপর নির্ভর করিয়া ভারত সচিব 'হোয়াইট পেপার' বা সরকারী ইস্তাহারে ভারত শাসনের রাষ্ট্রকাঠামো বা কন্‌ষ্টিটিউশনের খশড়া প্রস্তুত করেন।

স্যর স্যামুয়েল হোরের শ্বেত-পত্রী বা যে-দলিলে তিনি ভারতের ভাবী শাসনের খশড়া প্রস্তুত করেন, সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য পার্লামেণ্ট লর্ড ও কমন্স সভাদ্বয় হইতে কয়েকজন সদস্য নির্বাচন করিয়া এক কমিটি গঠন করেন। সেই কমিটির প্রতিবেদন 'জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটি রিপোর্ট' নামে পরিচিত। ১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত গবর্মেণ্ট এই রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া নূতন শাসনপ্রণালীর বিল প্রস্তুত করিয়াছেন।

সাইমন কমিশন, তিনটি গোল টেবিল বৈঠক, ভারত-সচিবের হোয়াইট্ পেপার, জয়েণ্ট পার্লমেণ্টারী কমিটির রিপোর্ট প্রভৃতির ফলে ভারতের সম্মুখে একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিল খাড়া হইল।

এই বিলের প্রধান কথা হইতেছে, ভারতবর্ষে ফেডারেল শাসনতন্ত্র গঠন: ইহার অর্থ এই, প্রাদেশিক শাসন-কেন্দ্রগুলিকে অধিক দায়িত্ব দান করা, কেন্দ্রীয় শাসনের উপর অতিরিক্ত নির্ভর না করিয়া কার্য করিবার অধিকার দান। দ্বিতীয়ত প্রাদেশিক শাসনে পার্লামেণ্টারী শাসনবিধির প্রবর্তন। এই দুইটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রাদেশিক গবর্ণরের উপর প্রভূত ক্ষমতা সমর্পণ করা হইয়াছে; বর্তমানে বড়লাট যে-সব শক্তি ধারণ করেন, তাহার অনেকগুলিই প্রাদেশিক লাটকে দেওয়া হইয়াছে। গবর্ণর নূতন বিধি অনুসারে রাজার প্রতিনিধি; সুতরাং সেই পদ-গৌরবে তাঁহার সম্মানাদি বাড়িবে। পার্লামেণ্টারী শাসন পদ্ধতির অর্থ—দুইটি ব্যবস্থাপক সভা গঠন অর্থাৎ বিলাতে যেমন হাউস অব্ লর্ডস্ ও হাউস্ অব্ কমন্স্ আছে, প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় সেই রকম দুটি হাউস্ থাকিবে। এই সভায় সরকারী কর্মচারী সদস্য থাকিবে না।

নূতন ব্যবস্থানুসারে বাঙলা প্রদেশে ভোটারের সংখ্যা বহুগুণ বাড়িবে; বর্তমান ব্যবস্থানুসারে শতকরা ৩ জন ভোট দেয়, আগামী বিধি অনুসারে

শতকরা পনের জন এই অধিকার পাইবে। নূতন নিয়মানুসারে যে ব্যক্তি ছয় আনা য়ুনিয়ন বোর্ড ট্যাক্স বা আট আনা ম্যুন্সিপাল কর দেয়, সেই ভোটার হইবে। এ ছাড়া পূর্বের ন্যায় নিয়ম বাহাল আছে। (J.P.C., pp. 360-61) এই দুইটি সভার একটি সভা লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিল ও অপরটি লেজিস্‌লেটিভ্ এসেমব্লী নামে পরিচিত হইবে।

কাউন্সিল বা উচ্চ ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য-সংখ্যা ৬৩ হইতে ৬৫ জন। কোন কোন প্রতিষ্ঠান হইতে এই সভ্যগণ নির্বাচিত বা মনোনীত হইবেন, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল,—

গবর্ণর কর্তৃক মনোনীত সদস্য ৬ হইতে ৮ জন *

সাধারণ নির্বাচিত (মুসলমান ও য়ুরোপীয় ছাড়া সকলেই সভ্য হইতে পারিবে)	১০ জন
মুসলমান নির্বাচিত	১৭ ,,
য়ুরোপীয় ,, ...	৩ ,,
এসেমব্লী ,, ...	২৭ ,,

মোট ৬৩ বা ৬৫ জন লইয়া কাউন্সিল গঠিত।

এসেমব্লীর সদস্য-সংখ্যা ২৫০; মণ্ট-ফোর্ড শাসনবিধি অনুসারে আছে ১৪৪ জন। এই ২৫০ জন সদস্যের মধ্যে ১১৯ জন মুসলমান; হিন্দু বলিয়া কোনো নির্বাচক মণ্ডলী নাই; হিন্দুরা সাধারণের মধ্যে গণ্য। এই সাধারণ বলিতে বুঝায় হিন্দু ও অন্ত্যজ। ইহাদের আসনের সংখ্যা ৮৩। পুণা প্যাকট্ মতে বাঙলার এসেমব্লীতে ৫৩ জন বর্ণহিন্দু ও ৩০ জন অন্ত্যজ হিন্দু নির্বাচনীয়। দেশীয় খ্রীষ্টান ২, এংলোইণ্ডিয়ান্ ৪, য়ুরোপীয় ১১, ব্যবসায়ী ১৯, জমিদার ৫, বিশ্ববিদ্যালয় ২, শ্রমিক ৮। পুণা প্যাকট্ যখন হয়, তখন কোনো বাঙালী রাজনৈতিক নেতা সেখানে উপস্থিত ছিলেন না; অনেকে মহাত্মাজির অনশন-মৃত্যু পণে বিহ্বল হইয়া প্যাকেটের গভীর অর্থ ও বিশেষভাবে বাঙলার উপর তাহার প্রভাবের কথা চিন্তা করিবার অবসর পান নাই।

---

* ইঁহারা সরকারী কর্মে লিপ্ত থাকিতে পারিবেন না।

বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, দুই এক দশক পূর্বে যেসব বর্ণ আপনাদিগকে বর্ণহিন্দু, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল, তাহাদের কেহ কেহ এখন ভারত-সচিবের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে 'নিম্ন' শ্রেণী বলিয়া পুনরায় ঘোষণা করিতেছে। বিলাতে যখন জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটির অধিবেশন হইতেছিল, তখন বাঙলার হিন্দুরা পুণা প্যাক্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁহারা বলেন, অন্যান্য প্রদেশে নিম্ন ও উচ্চ বর্ণের মধ্যে যে প্রভেদ দৃষ্ট হয়, বাঙলায় তাহা অজ্ঞাত।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা মুসলমানদের পক্ষে বিশেষ সুবিধার ও বর্ণ-হিন্দুর পক্ষে অবিচারের হইয়াছে বলিয়া হিন্দুদের বিশ্বাস। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা জাতীয়তার পরিপন্থী; তৎসত্ত্বেও একটি বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়কে ব্যবস্থাপক সভায় জন-সংখ্যার অনুপাতে অধিক সংখ্যায় সদস্য নির্বাচনের অধিকার দিয়া দেশের মধ্যে অকারণে ক্ষুব্ধতা ও সাম্প্রদায়িক বিরোধিতার সৃষ্টি করা হইয়াছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

বাঙলার ব্যবস্থাপক সভায় ২৫০টি আসন; ইহার মধ্যে ২টি ভারতীয় খ্রীষ্টান, ৪টি এংলো-ইণ্ডিয়ান্, ১১টি য়ুরোপীয়, ১৯টি বাণিজ্য শিল্পাদি (ইহার মধ্যে ১৪টি য়ুরোপীয়), ৫টি জমিদার, ২টি বিশ্ববিদ্যালয়, ৮টি শ্রমিকের জন্য নির্দিষ্ট। এই ৫১টি আসনের ৩১টি হিন্দু অথবা মুসলমানের কাহারো প্রাপ্য হয় না; য়ুরোপীয়েরা পায় ১১ + ১৪ অর্থাৎ ২৫; অর্থাৎ ২৫০টি আসনের দশম ভাগ য়ুরোপীয়দের। সকল শ্রেণীর খ্রীষ্টান—য়ুরোপীয়, ইঙ্গ-ভারতীয় ও দেশীয়দের জন-সংখ্যানুপাত শতকরা ০'৩৬; অথচ ইহাদের জন্য (২৫ + ৪ + ২) ৩১টি আসন রিজার্ভ আছে। জন-সংখ্যার অনুপাতে ইহাদের জন্য একটি মাত্র আসন হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহাদের সম্পদ্, শিক্ষা, রাজনৈতিক শক্তি প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে ৩১টি আসন দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ প্রাপ্যমাত্রার শতকরা ৩১০ বেশি।

জন-সংখ্যার অনুপাতে ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদের সদস্য-সংখ্যা হওয়া উচিত ছিল ১২১ ও হিন্দুর ৯৮। আর একভাবে এ অনুপাত করা যাইত, তাহা 'জোয়ান' (adult) ধরিয়া। সে হিসাব ধরিলে মুসলমানের

সদস্য-সংখ্যা হওয়া উচিত ছিল ১১৩, হিন্দুর ১০৬; কারণ মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু জোয়ানের সংখ্যানুপাত অধিক, তাহা সেন্সাস আলোচনায় বুঝা যায়। এই হিসাব আমরা করিলাম ২৪৯ জনের উপর, কারণ হিসাবমত খ্রীষ্টানদের প্রাপ্য আসন ১টি মাত্র। জন-সংখ্যার হিসাবে মুসলমানদের প্রাপ্য আসন ২৩টি বেশি হওয়া উচিত, জোয়ান-জনসংখ্যার অনুপাতে মাত্র ৭টি হয়। সে ক্ষেত্রে তাহারা পাইয়াছে ৩৯টি বেশি।

মোট ২৫০ সিটের ৫১টি বিশেষ সদস্যদের জন্য নির্ধারিত, তাহা পূর্বেই দেখানো হইয়াছে। সুতরাং ১৯৯টি আসন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বাঁটোয়ারার জন্য থাকে। জন-সংখ্যার অনুপাতে মুসলমানের প্রাপ্য হয় ১১০ ও হিন্দুর হয় ৮৯। জোয়ান জন-সংখ্যার অনুপাত ধরিয়া হিসাব করিলে মুসলমানের প্রাপ্য হয় ১০২, হিন্দুর ৯৭। প্রথম ক্ষেত্রে মুসলমান সদস্যের সংখ্যা ২১টি বেশি ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ৫টি বেশি হইবে; কিন্তু তাহা না হইয়া মুসলমানদিগকে ৩৯টি বেশি আসন দেওয়া হইয়াছে। মোট কথা, মুসলমানদের জন-সংখ্যা ৫০·৮% ভাগ হওয়া সত্ত্বেও তাহারা পাইয়াছে ৫৫·১% সদস্যদের আসন, আর হিন্দু ও অন্যান্যের জন-সংখ্যা ৪৪·৮% হওয়া সত্ত্বেও তাহারা ৩৭% আসন পাইয়াছে, অর্থাৎ মুসলমান পাইয়াছে তাহার প্রাপ্য গণ্ডার কিছু বেশি, আর হিন্দু পাইয়াছে প্রাপ্য গণ্ডার ৭·৮ ভাগ কম। এইসব কারণে বাঙলাদেশ জাতীয়তাবাদী জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটির প্রতিবেদনের বিরোধী। বাঙলাদেশে জন-সংখ্যার ধর্মানুযায়ী বিশিষ্টতা 'জন-সংখ্যা' পরিচ্ছেদে দিয়াছি।

প্রাদেশিক শাসনকেন্দ্রে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার কথা ছাড়িয়া দিয়া দেখা যাক্ ফেডারেল এসেমব্লীতে বাঙলার স্থান কি। সেখানে মোট সদস্য-সংখ্যা ২৫০; ইহার মধ্যে ৩৭ জন বাঙলার প্রতিনিধি। এই ৩৭ জনের মধ্যে মুসলমান ১৭ জন, সাধারণ ১০ জন। (ইহার মধ্যে অন্ত্যজ শ্রেণীর জন্য রিজার্ভ ৩; অর্থাৎ বর্ণহিন্দু ৭ জন মাত্র।) ভারতীয় খ্রীষ্টান, এংলোইণ্ডিয়ান্, য়ুরোপীয়ান, নারী, জমিদারদের মধ্য হইতে একজন করিয়া; বাণিজ্য-শিল্পাদি ৩ জন, শ্রমিক সভ্য ২ জন। আমরা পর পৃষ্ঠয়া ফেডারেল এসেমব্লীর গঠনটি দেখাইতেছি।

ফেডারেল এসেমব্লীর গঠন

প্রদেশ ও জন-সংখ্যা (কোটি)	মোট সদস্য	সাধারণ ;	সাধারণের মধ্য হইতে অনুন্নত	শিখ	মুসলমান	ভারতীয় খ্রীষ্টান	এংলো ইণ্ডিয়ান	য়ুরোপীয়	নারী	ব্যবসা শিল্প	জমিদার	শ্রমিক
মান্দ্রাজ (৪·৫৬)	৩৭	১৯	৪	০	৮	২	১	১	২	২	১	১
বোম্বাই (১·৮০)	৩০	১৩	২	০	৬	১	১	১	২	৩	১	২
বঙ্গদেশ (৫·০১)	৩৭	১০	৩	০	১৭	১	১	১	১	৩	১	২
যুক্তপ্রদেশ (৪·৮৪)	৩৭	১৯	৩	০	১২	১	১	১	১		১	১
পাঞ্জাব (২·৩৬)	৩০	৬	১	৬	১৪	১		১	১		১	০
বিহার (৩·২৪)	৩০	১৬	২		৯	১		১	১		১	১
মধ্যপ্রদেশ বেরার (১·৫৫)	১৫	৯	২		৩	০		০	১		১	১
আসাম (·৮৬)	১০	৪	১		৩	১		১				১
উ-প-সীমান্ত প্রদেশ (·২৪)	৫	১	০		৪			০				
সিন্ধু (·৩৯)	৫	১	০		৩			১				
উড়িষ্যা (·৬৭)	৫	৪	১		১							
দিল্লী (·০৬)	২	১	০		১							

প্রদেশ ও জন-সংখ্যা (কোটি)	মোট সদস্য	সাধারণ	সাধারণের মধ্য হইতে অন্ত্যজ	শিখ	মুসলমান	ভারতীয় খ্রীষ্টান	এংলো ইণ্ডিয়ান	য়ুরোপীয়	নারী	ব্যবসা-শিল্প	জমিদার	শ্রমিক
আজমীঢ় ('০৬)	১*	১*	০		০							
কুর্গ ('০২)	১*	১*	০		০							
বেলুচিস্থান ('০৫)	১*	০	০		১							
নন্-প্রভেন্সিয়াল	৮	০	০							৩†		১
	২৫০	১০৫	১৯	৬	৮২	৮	৪	৮	৯	১১	৭	১০

* অসাম্প্রদায়িক আসন

† এসোসিয়েটেড চেম্বার অব্ কমার্স, ফেডারেটেড চেম্বার্স অব্ কমার্স ও নর্থ ইণ্ডিয়ান্ কমার্শিয়াল বডি (উত্তর ভারতের ব্যবসায়ীদের সঙ্ঘ) হইতে নির্বাচিত। J. P. C, I. p. 346.

ভারতবর্ষের প্রদেশসমূহের ব্যবস্থাপক সভা (এসেমব্লী)

	সাধারণ (নারী)	সাধারণের মধ্য হইতে অনুন্নত	পশ্চাৎপদ অঞ্চল হইতে	শিখ	মুসলমান (নারী)	ভারতীয় খ্রীষ্টান	এংলো ইণ্ডিয়ান	য়ুরোপীয়	ব্যবসায়-শিল্প	জমিদার	বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রমিক	মোট
মাদ্রাজ	১৫২ (৬)	৩০	১		২৯ (১)	৯ (১)	২	৩	৬	৬	১	৬	২১৫
বোম্বাই	১১৯ (৫)	১৫	১		৩০ (১)	৩	২	৩	৭	২	১	৭	১৭৫
বঙ্গদেশ	৮০ (২)	৩০			১১৯ (২)	২	৪(১)	১১	১৯*	৫	২	৮	২৫০
যুক্তপ্রদেশ	১৪৪ (৪)	২০			৬৬ (২)	২	১	২	৩	৬	১	৩	২২৮
পাঞ্জাব	৪৩ (১)	৮		৩২ (১)	৮৬ (২)	২	১	১	১	৫	১	৩	১৭৫
বিহার	৮৯ (৩)	১৫	৭		৪০ (১)	১	১	২	৪	৪	১	৩	১৫২
মধ্যপ্রদেশ	৮৭ (৩)	২০	১		১৪	০	১	১	২	৩	১	২	১১২
আসাম	৪৮ (১)	৭	৯		৩৪	১	০	১	১	০		৪	১০৮
উ-প-সীমান্ত প্রদেশ	৯	০			৩৬	০	০	০	০	২			৫০
সিন্ধু	১৯ (১)	০			৩৪ (১)	০	০	২	২	২		১	৬০
উড়িষ্যা	৪৯ (২)	৭	২		৪	১	০	০	১	২		১	৬০

* য়ুরোপীয়—১৪ ভারতীয়—৫

সরকারী চাকুরী

একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ইংরেজ শাসনে আমাদের শাসনবিধির আদর্শ পূর্বাপেক্ষা অনেক ব্যাপক হইয়াছে। এখন আমরা শাসনের যে সুব্যবস্থা পাইয়া থাকি, তাহা বহুকাল এদেশে অপরিজ্ঞাত ছিল। এই বিশাল দেশের শাসনবিধিকে মুষ্টিমেয় ইংরেজ রাজপুরুষের করতলগত করিয়া রাখিবার জন্য শাসনের বিধি-ব্যবস্থা, দপ্তর-সরঞ্জাম খুবই সুনিপুণভাবে চালাইবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। এইজন্য গবর্মেণ্ট নানা বিভাগ, অগণিত কর্মচারী, নানাবিধ ফর্ম, রিপোর্ট-এর ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং সর্বাপেক্ষা অধিক দৃষ্টি দিয়াছেন সময়ানুবর্তিতা অর্থাৎ যথাসময়ে কাজ করা ও discipline অর্থাৎ কোনো পক্ষের ত্রুটি হইলে তাহার দণ্ড বিধানের প্রতি।

এই বিরাট কর্মযন্ত্র চালাইবার জন্য সরকারী বিভাগে তিন শ্রেণীর কর্মচারী আছেন। প্রথম ইণ্ডিয়ান্ সিবিল সার্বিস, দ্বিতীয় প্রভিন্সিয়েল সার্বিস, তৃতীয় সাব্অর্ডিনেট্ বা নিম্নতন সার্বিস। প্রথম বা সিবিল সার্বিসের লোকেরা বিলাতে ভারতসচিব কর্তৃক নিযুক্ত হন; তাঁহাদের কর্মক্ষেত্র ভারতের সকল প্রদেশেই হইতে পারে। অপর দুইটি সার্বিস বা চাকুরী কেবলমাত্র প্রদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ; ইঁহারা স্থানীয় গবর্মেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত হন।

সিবিল সার্বিসের উৎপত্তি কোম্পানীর যুগে; কোম্পানীর কেরাণী, ফ্যাক্টরী-ওয়ালা আসিত চাকুরী করিতে। তখন যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল না—ছিল কেবল ভদ্রভাবে ব্যবসা করা; সুতরাং কোম্পানীর চাকরদের বলিত 'সিবিল সার্বেণ্ট'। পর্তুগীজ-ফরাসী প্রভৃতিদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য গবর্মেণ্ট নৌবাহিনী থাকিত। ক্লাইব ছিলেন কোম্পানীর চাকর; আর ওয়াটসন্ ছিলেন দ্বিতীয় জর্জের নৌসেনার অধ্যক্ষ। বাঙলার শাসন-মসনদে বসিবার পর শাসনের জন্য কোম্পানীর লোকের প্রয়োজন হইল। সে-যুগের সিবিল সার্বেণ্ট বা সরকারী ভৃত্যরা মাহিনা পাইতেন নামে মাত্র; উপরিই ছিল তাঁহাদের প্রধান আয়—সকলেরই নিজস্ব ব্যবসা থাকিত। কর্ণওয়ালিস্ আসিয়া এইসব ব্যক্তিগত ব্যবসা বন্ধ করিয়া সিবিল সার্বেণ্টদের ভদ্রোচিত বেতন ও সম্মান দিলেন। কর্ণওয়ালিস্ সে-যুগের বাঙালীর চরিত্র দেখিয়া তাঁহাদের

উপর মোটেই খুসী ছিলেন না; সেইজন্য কোন উচ্চকাজে তিনি দেশীয়দের নিয়োগ করিতেন না। ১৭৯৩ সালে কোম্পানীর সনদ গ্রহণ করিবার সময় এই সিবিল সার্বিস সম্বন্ধে কিছু কিছু আইন প্রণীত হয়। ভারতে যাহারা আসিত, তাহারা কতকগুলি চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া আসিত বলিয়া এই চাকুরীকে বলিত 'কভেনেণ্টেড্ সিবিল সার্বিস'।

১৮০০ সালে লর্ড ওয়েলেস্লির চেষ্টায় এদেশে যুবক ইংরেজ সিবিলিয়ান্দের জন্য কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮০৫ সালে এই কলেজ ডিরেক্টররা উঠাইয়া দেন ও সেই বৎসরে ইংল্যণ্ডে Haileybury নামক স্থানে ভারতীয় সিবিল সার্বিসের ছাত্রদের শিক্ষার জন্য এক কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৫৩ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চলে। শেষোক্ত বৎসরে পার্লামেণ্টের এক অ্যাক্ট্ অনুসারে এই সার্বিসে প্রবেশ-অধিকার উপযুক্ত যে-কোনো ছাত্রকে দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করেন; ডিরেক্টরদের সুপারিশে মনোনীত হইবার প্রথা বন্ধ হইল। ১৮৫৮ সালে হেইলিবেরির কলেজ উঠাইয়া দেওয়া হয় ও ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়ন করিয়া পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইল। এই কম্পিটিটিভ পরীক্ষা যে-কোনো বৃটীশ প্রজা দিতে পারিত; বাঙলাদেশের সর্বপ্রথম I. C. S. হইতেছেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর; তিনি ১৮৬৪ সালে সিবিল সার্বিস পাশ করিয়া বোম্বাইতে কাজ গ্রহণ করেন। বাঙলাদেশ হইতে দ্বিতীয় দলে যান রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল দত্ত ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৭৯ সালে এই দেশেই এক শ্রেণীর সিবিল সার্বেণ্টের নিয়োগের ব্যবস্থা হয়; তাহাকে 'ষ্ট্যাটুটারী সিবিল সার্বিস' বলা হইত। ১৮৮৬-৭ সালে রাজাজ্ঞায় পাবলিক সার্বিস কমিশন বা সরকারী চাকুরী সম্বন্ধে তদন্ত বৈঠক বসে; তাহাতেই সমস্ত সিবিল সার্বিসকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন ভারতীয় সিবিল সার্বিস, প্রভিন্সিয়েল বা প্রাদেশিক, সাব্অর্ডিনেট বা নিম্নতন চাকুরী।

ইহার পর ১৯১২ সালে পুনরায় পাব্লিক সার্বিস কমিশন বসে। কিন্তু যুদ্ধ বাধায় এই কমিশনের সুপারিশগুলি যথোপযুক্তভাবে কার্যে পরিণত করা যায় নাই। তারপর যুদ্ধান্তে নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব হয়। নূতন

সংস্কারের সময় স্থির হয় যে, ভারতীয় সিবিল সার্বিসে ভারতীয়দের সংখ্যা শতকরা ৩৩ জন হইবে এবং বাৎসরিক ১২ জন হারে বাড়িবে। বর্তমানে বাঙলাদেশের অনেকগুলি জেলায় দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও জজ্ আছেন। সিবিল সার্বিসের অসন্তোষ, লী কমিশন (Lee) প্রভৃতির কথা আমরা 'ভারত পরিচয়ে' বর্ণনা করিয়াছি। (পৃঃ ৬০০-৬০১)।

১৯১৯ সাল হইতে ভারতবর্ষেও সিবিল সার্বিস পরীক্ষা গৃহীত হইতেছে। সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রদিগকে শিক্ষার জন্য বিলাতে পাঠানো হয়।

বাঙলাদেশের সরকারী শাসন বিভাগের জন্য যাঁহারা মনোনীত হন, তাঁহাদিগকে 'বেঙ্গল সিবিল সার্বিস' বলা হয়, পূর্বে নাম ছিল 'প্রভিন্সিয়েল'। মুন্সেফ, সাব্জজ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ প্রভৃতি কর্মচারীরা এই বিভাগের অন্তর্গত।

সাব্ডেপুটি, সাবরেজিষ্ট্রার প্রভৃতিরা সাব্অর্ডিনেট্ গ্রেডের কর্মচারী। এই গ্রেডে অবশিষ্ট সকল সরকারী কর্মচারীই পড়েন। পুলিশ বিভাগেও এই তিন শ্রেণীর কর্মচারী আছে। I. P. C. বলিতে বুঝায় ইণ্ডিয়ান পুলিশ সার্বিস। তবে পুলিশ প্রাদেশিক শাসনের অন্তর্গত।

গবর্মেণ্টের শাসন পরিচালনা ছাড়াও নানা বিভাগে সরকারী চাকর আছেন; তাঁহাদের সম্মান ও বেতন যথেষ্ট। সেখানেও ইণ্ডিয়ান, প্রভিন্সিয়েল ও সাব্অর্ডিনেট্ শ্রেণী আছে। শিক্ষা-বিভাগে বিলাত হইতে নিযুক্ত কর্মচারীকে ইণ্ডিয়ান্ এডুকেশন্যাল সার্বিসের লোক বলিত। মণ্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কারে শিক্ষা 'অর্পিত' বিষয়ের অন্তর্গত হওয়ায় নূতন আই. ই. এস্. আর নিয়োগ করা হয় না। গবর্মেণ্ট স্কুল-কলেজের শিক্ষক, অধ্যাপক ও কর্মচারী সকলেই সরকারী চাকর। কো-অপারেটিভ বিভাগের রেজিষ্ট্রার, সহকারীরা, অডিটার ও ইন্সপেক্টারগণ সরকারী কর্মচারী।

ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড বা ম্যুনিসিপ্যালটির কর্মচারীরা নিজ জেলা বোর্ডের চাকর। জেলা বোর্ডের কর্তাদের ইচ্ছার উপর অনেক সময় চাকুরী নির্ভর করে; এক জেলা হইতে অন্য জেলায় ট্র্যান্সফার বা বদলি হয় না। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের চাকুরী নিখিল বঙ্গের কাজ হওয়া উচিত।

পোষ্ট, টেলিগ্রাফ, আয়কর, শুল্ক, সৈন্যবিভাগের কাজ নিখিল ভারতীয় অর্থাৎ এগুলি বাঙলা গবর্মেণ্টের অধীন নহে। তবে কাজের সুবিধার জন্য

বঙ্গদেশের কর্মিগণকে বঙ্গদেশেই রাখা হয়। সরকারী রেলের কাজ সরকারী বলিয়া ধরা যাইতে পারে; তবে তাহা পৃথক্ রেলওয়ে বোর্ডের হাতে। এক একটি রেলওয়ের যে-কোনো স্থানে চাকুরী করিতে হইতে পারে বলিয়া ইহাকে প্রাদেশিক বলা যায় না; তাছাড়া রেলওয়ে খাশ ভারত গবর্মেণ্টের অধীন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বাঙলার শাসন ও বিচার বিভাগ

১৭৬৫ সালের ১২ই আগষ্ট তারিখে লর্ড ক্লাইব মুঘল বাদশাহ্ শাহ্ আলমের নিকট হইতে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন; বাঙলার নবাব বাৎসরিক পেনশন্ পাইয়া প্রায় সমস্ত ক্ষমতাই কোম্পানীকে দান করিলেন। দেওয়ানী পাইবার পূর্বে কোম্পানী মীরকাশেমের নিকট বাঙলার নবাবী বিক্রয় করিয়া তাহার বিনিময়ে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারী লাভ করিয়াছিল। দেওয়ানী পাইয়াই ক্লাইব রাজস্ব আদায় বা রাজ্যশাসন বিষয়ে কোনো আমূল পরিবর্তন আনয়ন করিলেন না; তিনি বাঙলা ও বিহারে দুইজন নায়েব-নাজিম নিযুক্ত করিলেন; যা কিছু কাজ তাঁহারাই করিতেন—কোম্পানী প্রত্যক্ষভাবে কিছুতে হস্তক্ষেপ করিলেন না। শাসনের দুইভাগ 'দেওয়ানী' অর্থাৎ রাজস্ব ও বিচার এবং 'নিজামত' অর্থাৎ শাসনবিভাগ ও ফৌজদারী বিচার। প্রকৃতপক্ষে কোম্পানীরই তত্ত্বাবধানে সব পরিচালিত হইত। দেওয়ানী পাইয়া রাজস্ব আদায় করিতে গিয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কোম্পানীকে নানা লোকের সংস্পর্শে আসিতে ও নানা সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল।

ক্লাইবের এই দ্বৈতশাসন হেষ্টিংস আসিয়া অবসান করিয়া দিলেন; তিনি বাঙলার ও বিহারের নায়েব নাজিমদিগকে বরখাস্ত করিয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য ইংরেজ কর্মচারী বা কলেক্টর নিযুক্ত করিলেন (১৭৭২)। কলিকাতায় একটি রেভেনিউ বোর্ড স্থাপন করিয়া রাজকোষ মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিলেন। রেগুলেটিং এক্ট অনুসারে ১৭৭২ সালে কলিকাতা, বর্ধমান, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর ও পাটনায় ছয়টি প্রাদেশিক কাউন্সিল (Provincial Council) স্থাপিত হয়; ইহারাই রাজস্ব বিষয়ে তত্ত্বাবধান করিতেন। অনেক ছোট খাটো পরিবর্তনের পর ১৭৮০ সালে উক্ত ছয়টি শহরে দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হয়। প্রধান কর্মচারীকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

বলিত। প্রাদেশিক কাউন্সিলের সহিত ইহার কোনো যোগ ছিল না; অর্থাৎ রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানী বিচার পৃথক্ হইল। ইতিপূর্বে কলিকাতায় দেওয়ানী বিচারের জন্য দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য নিজামত আদালত হেষ্টিংস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

রেগুলেটিং এক্ট অনুসারে সুপ্রীম কোর্ট নামে একটি শ্রেষ্ঠ বিচারালয় কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হইল। এই বিচারালয় ইংল্যণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জের হুকুমনামা লইয়া স্থাপিত হয়; ইহার প্রধান বিচারপতি ও অন্য তিনজন জজ রাজার দ্বারা মনোনীত হইয়া এদেশে প্রেরিত হন। যাঁহারা পাঁচ বৎসর ইংল্যণ্ড বা আয়ারল্যাণ্ডে ব্যারেষ্টারী করিয়াছেন, তাঁহারাই মনোনীত হইতে পারিতেন। কোম্পানীর দুর্বিনীত কর্মচারী ও কলিকাতার বাসিন্দার জন্যই এই আদালত বিশেষভাবে স্থাপিত হয়; সেইজন্য এখানকার আইন-কানুন ইংল্যণ্ডের আইনানুযায়ী চলিত। নন্দকুমারের ফাঁসি ইংরেজি আইনানুযায়ী হয়; তখন জালিয়াতির জন্য ফাঁসির ব্যবস্থা ছিল ইংল্যণ্ডে। স্যর ইলিজা ইম্পে সুপ্রীম কোর্টের প্রথম বিচারপতি। কোম্পানী একটি পৃথক্ প্রতিষ্ঠান। সেটি প্রাইবেট ব্যবসায়। কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট ইংল্যণ্ডের রাজার হুকুমনামায় সৃষ্ট হইল।

রেগুলেটিং এক্টে সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা সুস্পষ্ট নির্ধারিত না থাকায় শীঘ্রই গবর্মেণ্টের সহিত এই বিচারালয়ের বিরোধ উপস্থিত হইল। বিচারপতিরা ইংল্যণ্ডের রাজার দ্বারা মনোনীত হইয়া আসিতেন বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন তাঁহাদের ক্ষমতা অসীম, তাই তাঁহারা সর্বশ্রেণীর লোকের উপর ক্ষমতা পরিচালনা করিতে চাহিলেন, এমনকি তাঁহারা কোম্পানীর চাকর গবর্ণর জেনারেল ও তাঁহার কাউন্সিল পর্যন্ত তাঁহাদের বিচারাধীন মনে করিতেন। হেষ্টিংস কি ভাবে এইসব বিরোধ অতিক্রম করিয়া কার্য চালাইতেন, তাহা ইতিহাস-পাঠকমাত্রই অবগত আছেন। ১৭৮৬ অব্দের বিশেষ আইন বলে কর্ণওয়ালিস্ তাঁহার কাউন্সিলকে অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন ঠিক হয় এবং সুপ্রীম কোর্টের এক্তিয়ার বড়লাটের কার্যকালে প্রযোজ্য হইবে না স্থির হয়।

শাসন ও বিচার বিষয়ে যথার্থ সংস্কার সুরু হয় লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ে; তিনি যে কেবল বাঙলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দবস্ত করিয়া সেই অশান্তির যুগে

গবর্মেণ্টের জন্য একটা স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করিয়া সুবুদ্ধির পরিচয় দিলেন তাহা নহে, শাসন ও বিচারবিভাগে অনেক পরিবর্তন সাধন করেন। ইতিপূর্বে (১৭৮১) 'প্রভিন্সিয়েল কাউন্সিল' উঠাইয়া দিয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য হেষ্টিংস সমস্ত দায়িত্ব কলেক্টরদের উপর অর্পণ করেন। আঠার জন দেওয়ানী জজের উপর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হয়; কিন্তু তখনো ফৌজদারী মামলার বিচারের ভার মুসলমান কর্মচারীদের উপর দেওয়া হইত।

১৭৮৬ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ য়ুরোপীয় কলেক্টরের হাতে দেওয়ানী জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের সমস্ত ক্ষমতা দিয়া দিলেন। কিন্তু এখনো ফৌজদারী বিচারের ভার মুসলমান কর্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকিল। ১৭৮০ সালে গবর্ণর জেনারেল ঘোষণা করিলেন যে, নিরপেক্ষ ও দ্রুত বিচারের জন্য তাঁহারাই ফৌজদারী বিচারের ভার গ্রহণ করিবেন। ১৭৮৩ সাল হইতে চারিটি ভ্রাম্যমাণ কাছারি প্রতিষ্ঠিত হইল। এছাড়া তিনি এক জনের উপর সকল ক্ষমতা অর্পণের অপকারিতা বুঝিয়া দেওয়ানী জজের হাতে মাত্র ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা রাখিলেন; কিন্তু কলেক্টরের পদ অর্থাৎ রাজস্ব সংগ্রহের কার্য পৃথক্ করিলেন। য়ুরোপে বহুকাল এইভাবে জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট্ একই ব্যক্তি হইতেন, কিন্তু কলেক্টর ছিলেন পৃথক্; বর্তমানে জজ পৃথক্, কলেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট্ একই ব্যক্তি।

জেলা জজদের বিচারের আপীলের শুনানী পূর্বে হইত কলিকাতার বড়লাটের কাছে; লর্ড কর্ণওয়ালিস্ কলিকাতার উপকণ্ঠে, মুর্শিদাবাদে, ঢাকায় ও পাটনায় —এই চারিটি স্থানে চারিটি আপীল আদালত স্থাপন করেন; এই প্রাদেশিক বিচারালয়ে প্রধান বিচারক হইতেন সাহেব; তাঁহাকে সাহায্যের জন্য হিন্দু ও মুসলমান আইনজ্ঞ ব্যক্তি থাকিতেন। ইঁহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার বিভিন্ন জেলায় ফৌজদারী মামলার বিচারও করিতেন। পাঁচ হাজার টাকার উর্দ্ধের দাবীর আপীল কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে অথবা সপার্ষদ বড়লাটের কাছে হইত। এখন জেলার মহকুমা ও চৌকীতে দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার হয়, তখন সে সুবিধা ছিল না। সামান্য সামান্য দাবীর মামলা, আপীল সালিশান বা মুন্সেফদের হাতে দেওয়া হইত; সুতরাং পঞ্চাশ টাকার বেশি দাবীর মোকদ্দমা মুন্সেফ করিতে পারিতেন না।

এই সময়ে পুলিশবিভাগ জেলা কোর্টের জজের অধীনতায় পরিচালিত হইত।

জেলার জজের উপরই ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পিত ছিল; পুলিশের কাজের সুবিধার জন্য প্রত্যেক জেলা কতকগুলি থানা বা পুলিশকেন্দ্রে বিভক্ত হইল; থানার প্রধান পুলিশ কর্মচারীকে দারোগা বলিত। ইহাদের বেতন খুবই অল্প ছিল; এবং অপহৃত দ্রব্য উদ্ধারের জন্য কিছু কমিশন পাইত; অপরাধী ধরিয়া দিতে পারিলে পুরস্কৃত হইত। ইহাই পুলিশবিভাগের সূত্রপাত; দারোগার উপর তখন আর কোনো বড় পুলিশ সাহেব ছিলেন না।

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের সময় অনেক সংস্কার সাধিত হয়; ১৮২৯ অব্দে তিনি প্রাদেশিক কোর্টগুলিকে উঠাইয়া দিয়া রাজস্ব-কমিশনারের পদ সৃষ্টি করিলেন। পুলিশবিভাগ রাজস্ব-কমিশানরের অধীন হইল; কমিশনার সাহেব চারি বা পাঁচটি করিয়া জেলার কাজ তদারক করিতেন। এই কমিশনারগণ সেসন-জজ বা দায়রা জজরূপে জেলায় জেলায় পরিভ্রমণ করিতেন। প্রাদেশিক রেভেনিউ বোর্ড উঠাইয়া দিয়া, ইহার সমস্ত ক্ষমতা কমিশনারের উপর দেওয়া হইল; বিভাগের আয়-ব্যয় ও ফৌজদারী বিচারের সম্পূর্ণ ভার পড়িল কমিশনারদের উপর। বিভাগ ও কমিশনারের সৃষ্টি এই সময়ে।

কমিশনারদের উপর সেসন্ বিচারের ভার অতিরিক্ত বোধ হওয়ায় ১৮৩৫ সালে বেণ্টিঙ্ক উহা বদল করিয়া দেওয়ানী জজদের হাতেই ফৌজদারী বিচারের ভার প্রত্যর্পণ করিলেন। ১৮৩১ সাল পর্যন্ত কর্ণওয়ালিস্-প্রবর্তিত নিয়মে জজদের উপর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা চলিয়াছিল। এই সালে কলেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট্ একই ব্যক্তি হইলেন।

দুই বৎসর পরে অতিরিক্ত জজের পদ সৃষ্ট হয়। বেণ্টিঙ্ক দেশীয় শিক্ষিত লোককে শ্রদ্ধা করিতেন ও নানা কাজে বাঙালীকে নিযুক্ত করিলেন। পূর্বে বলিয়াছি, কর্ণওয়ালিসের সময় দেশীয় বিচারকদের (আমীন ও মুন্সেফ) বেতন ও মর্যাদা অত্যন্ত নগণ্য ছিল। য়ুরোপীয় জজদের অত্যন্ত ছোট ছোট দাবীর মোকদ্দমার বিচার হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্য এই পদ দুটির সৃষ্টি। ক্রমে আমীন ও মুন্সেফদের পদমর্যাদা বাড়িতে থাকে। বেণ্টিঙ্ক প্রধান সদর আমীনের (কালে সব্‌জজ নামে পরিচিত) পদ তৈরী করেন ও যে-কোনো মোকদ্দমার বিচারের অধিকার দেন; তবে ইংরেজ জজের কাছে আপীলের ব্যবস্থা রাখিয়া দিলেন। ১৮৪৩ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ সৃষ্টি হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি ১৮৩১ সালে কলেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট্ একই ব্যক্তি হন; কয়েকটি জেলা ছাড়া ১৮৩৭ সালে পুনরায় এই দুইপদ পৃথক্ করা হইল। কলেক্টরদের বেতন ধার্য হয় বার্ষিক ১৮,০০০৲ হইতে ২৩,০০০৲ টাকা আর ম্যাজিষ্ট্রেট্দের ১২,০০০৲ হইতে ১৮,০০০৲ টাকা। ইহার পর ১৮৫৪ সালে বাঙলাদেশের জন্য পৃথক্ ছোটলাট নিযুক্ত হইলেন এবং ১৮৫৯ সালে পুনরায় কলেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ একহাতেই দেওয়া হইল। ১৮৬০ সালে বাঙলাদেশে (বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম লইয়া) ৩টি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্-কলেক্টরের বেতন বার্ষিক ২৮,০০০৲ টাকা, ২২টি জেলায় ২৩,০০০৲, ৭টি জেলায় ১৮,০০০৲, ৪টি জেলায় ১২,০০০৲ টাকা ছিল। ইহার পর এই সব বেতন ও গ্রেডের (Grade) অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। বর্তমানে বেতন মাসিক ১১৫০৲ হইতে ২,৫০০৲; ইহা বিলাত হইতে যাঁহারা আসেন তাঁহাদের ভাতা সমেত; দেশীয় সিভিলিয়ান এই ভাতা পান না।

বাঙলাদেশে ২৭টি জেলা, কলিকাতা ধরিলে ২৮টি। ইহার মধ্যে একমাত্র চট্টগ্রাম পার্বত্য মহলে নন্-রেগুলেশন শাসনবিধি প্রচলিত। ১৮২২ সালের ১০ নং রেগুলেশন অনুসারে স্থিরীকৃত হয় যে, কতকগুলি জেলা বা ভূখণ্ড যথেষ্ট সভ্য নহে; তাহাদের শাসন ও সংরক্ষণ প্রণালী বাঙলাদেশের সাধারণ জেলার মতো হইতে পারে না; এই উদ্দেশ্যে রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিঙ জেলা ও চট্টগ্রামের পার্বত্য মহলকে নন-রেগুলেশন প্রদেশ বলা হইত; ডেপুটি কমিশনারের উপর এইসব জেলা শাসনের বিস্তৃত অধিকার অর্পিত হইয়াছিল। বর্তমান পার্বত্য মহল ছাড়া আর সব জেলাই যথাবিধি আইনানুসারে শাসিত হইতেছে। বাঙলার উপকণ্ঠে সাঁওতাল পরগণা ডেপুটি কমিশনরের অধীন।

দেশ শাসনের কেন্দ্র হইতেছে জেলা; কয়েকটি জেলা লইয়া বিভাগ হয়; বিভাগের কর্তা কমিশনর সাধারণত রাজস্ব বিষয়ক ব্যাপার ও স্বায়ত্ব শাসন সংক্রান্ত কার্য দেখেন। দেশের প্রত্যক্ষ শাসন, শৃঙ্খলা, রাজস্ব-আদায় জন্য দায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট-কলেক্টর সাহেব; তাঁহার ক্ষমতা অনেক। তিনি জেলার ফৌজদার; পুলিশ তাঁহার অধীন; জেল তাঁহার তত্ত্বাবধানে; সাধারণ ফৌজদারী মামলা তিনি বা অন্যান্য ম্যাজিষ্ট্রেট্গণ করেন।

কোথায়ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিলে প্রয়োজন হইলে গুলি চালাইবার অধিকার

তাঁহার আছে ; কোথায়ও ঝড় বন্যা ভূমিকম্পে দুর্ভিক্ষ হইলে তাঁহাকে ব্যবস্থা করিতে হয়। তাঁহার অনুমতি ব্যতীত পূর্তবিভাগ কোনো পথঘাট নির্মাণ করিতে পারে না। জেলা বোর্ডের কাজ মোটামুটিভাবে তাঁহাকে দেখিতে হয়। আবহাওয়ার রিপোর্ট, ফসলের দর, দেশের অবস্থা সমস্ত তাঁহাকে গবর্মেণ্টকে জানাইতে হয়। এইরূপ গবর্মেণ্টের যাবতীয় কার্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে দেখিতে হয়।

শাসনের সুবিধার জন্য প্রায় প্রত্যেক জেলাকে পুনরায় দুই তিন চারি পাঁচটি করিয়া মহকুমায় ভাগ করা হইয়াছে। মহকুমা বা সাব্‌ডিভিশনের ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে সাব্‌ডিভিশনল ম্যাজিষ্ট্রেট্ বা মহকুমা হাকিম বলে। ইহাদের কার্যে সহায়তা করিবার জন্য এক বা একাধিক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ থাকেন ; সদরে ডেপুটিদের কেহ ট্রেজারী বা খাজনাখানার ভার লন, কেহ বিচার করেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের যে-সব ক্ষমতা আছে, অল্প-বিস্তর প্রায় অনেকগুলিই মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেটের আছে ; রাজস্ব আদায় তাঁহার কাছারীতেই হয়। জেলা বোর্ডের কাজের জন্য ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনীয়ার, মহকুমায় ওভারশিয়ার আছেন। জেলার পুলিশ সংক্রান্ত সকল কাজের ভার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের উপর ; মহকুমায় ইন্সপেক্টর বা বড় দারোগা ; জেলার হাসপাতালে সিভিল সার্জেন, মহকুমায় এসিস্‌টেণ্ট সার্জেন ; জেলায় জজ, মহকুমায় মুন্সেফ ; জেলায় জেলা-রেজিষ্ট্রার, মহকুমায় সব-রেজিষ্ট্রার। এইভাবে বলা যাইতে পারে মহকুমাগুলি জেলার একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ।

বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেট্ তিন শ্রেণীর ; প্রথম শ্রেণীর হাকিমরা অপরাধীকে এক অপরাধের জন্য দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড ও একহাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর হাকিম ছয়মাস কারাদণ্ড ও দুইশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড ও তৃতীয় শ্রেণীর হাকিম একমাস কারাদণ্ড ও ৫০৲ জরিমানা করিতে পারেন ; একাধিক অপরাধের জন্য অপরাধীকে দ্বিগুণের অধিক শাস্তি কেহই দিতে পারেন না। সাধারণত মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট্, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও সাব্‌ডেপুটিরা বিচার করেন।

এ ছাড়া কোনো কোনো মুন্সিপালটিতে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট্, যুনিয়ন বোর্ডের কোর্টের প্রেসিডেণ্টদের হাকিমি ক্ষমতা দেওয়া আছে ; কুড়ি

টাকা জরিমানা ও এক সপ্তাহ জেল দিবার ক্ষমতা তাঁহাদের আছে; অবশ্য আপীল করিবার অধিকার দেওয়া আছে।

গুরুতর অপরাধে ম্যাজিষ্ট্রেট্ মোকদ্দমার সমস্ত ব্যাপার অনুসন্ধান করিয়া যদি বুঝেন যে, অপরাধীর বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ আছে ও সে বিষয়ে রীতিমত বিচার হওয়া প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি ঐ মামলা 'সেশনসে' দেন বা অপরাধীকে দায়রা সোপর্দ করেন, অর্থাৎ জেলার জজ তখন তাহার বিচার করেন; কলিকাতার মধ্যে হইলে হাইকোর্টে তাহার বিচার হয়। এইসব মোকদ্দমায় অনেক সময়েই 'জুরি' আহূত হয়। 'জুরী' প্রথা বৃটীশ শাসননীতির একটি শ্রেষ্ঠ অবদান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

জুরি প্রথা ১৮৬১ সালে প্রবর্তিত হয়। জেলার কয়েকজন বিশিষ্ট লোককে বিচারকালে জুরিরূপে ডাকা হয়; তাঁহারা বিচার কালে উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনেন, তাঁহাদের সহজ বুদ্ধিতে আসামী অপরাধী কি নিরপরাধ তাহা জজকে জানাইয়া দেন। জজ অধিকাংশের মত গ্রহণ করিতে বাধ্য। যদি তিনি জুরির সহিত একমত হইতে না পারেন, তাহা হইলে শাস্তি দিবার পূর্বে সমস্ত কাগজপত্র হাইকোর্টে পাঠাইয়া দিতে হয়। হাইকোর্টের বিচারই চরম।

সাত বৎসরের অল্পবয়স্ক বালকের বিচার হয় না; ষোল বছরের কম হইলে তাহাকে সংশোধনী কারাগারে পাঠানো হয়; আলিপুরে এইশ্রেণীর একটি কারাগার আছে।

দেওয়ানী আইনে ও ভূমি-সংক্রান্ত আইনে জেলাভেদে পার্থক্য আছে; বাঙলার ভূমি সংক্রান্ত আইন ও মান্দ্রাজের আইন এক নহে। কিন্তু ফৌজদারী আইন সর্বত্র সমান। ১৮৬০ সালে উহা প্রথম প্রবর্তিত হয় এবং এক রাজনীতিক অপরাধের দণ্ড-ব্যবস্থা ছাড়া সাধারণ অপরাধের ধারার মধ্যে সামান্যই পরিবর্তন হইয়াছে। চুরি, জুয়াচুরি, ডাকাতি, মারপিট নরহত্যা, নরহত্যার চেষ্টা, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, বেআইনীভাবে আটক রাখা, গৃহে প্রবেশ, নারীহরণ, নারীনিগ্রহ প্রভৃতি ব্যাপার ফৌজদারী বিচারের অন্তর্গত। এ ছাড়া নানা বিষয়ের জন্য বিশেষ বিশেষ আইন আছে; যেমন রেল কোম্পানীর আইন, বিনা টিকিটে ভ্রমণ করিলে, চেন ধরিয়া

টানিলে ইত্যাদি বহুপ্রকার বিষয়ে অপরাধ দণ্ডার্হ; তেমনি ম্যুন্সিপাল আইন, আবকারী আইন, লবণ আইন আছে, তাহাও ভাঙিলে অপরাধী ফৌজদারী সোপর্দ হইতে পারে।

অপরাধীকে সাধারণত পুলিশে ধরে ও চালান দেয়; মারপিট, খুন ডাকাতি হইলে লোকে পুলিশে খবর দেয়; পুলিশ বমাল চোর ধরিতে পারে ভাল, নইলে সন্দেহে বা পারিপার্শ্বিক প্রমাণ পাইয়া অপরাধীকে ধরিয়া চালান দেয়। পুলিশ থানা হইতে অপরাধীকে লইয়া মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করে। আদালতে পুলিশ বিভাগের উকিল বা কোর্ট ইন্স্পেক্টর হাকিমের কাছে মোকদ্দমা বুঝাইয়া দেন। নরহত্যাদি অপরাধে দণ্ডিত দরিদ্র লোকের যদি পক্ষ সমর্থের টাকা না থাকে, তবে গবর্মেন্টের খরচে উকিল নিযুক্ত হন; তিনি সম্পূর্ণভাবে অপরাধীকে রক্ষার জন্যই চেষ্টা করেন। ফৌজদারী বিচার সম্বন্ধে সরকার বাহাদুরের নীতি হইতেছে—বরং অপরাধী মুক্তি পাক্, কিন্তু নির্দোষ ব্যক্তি যেন শাস্তি না পায়। এইজন্য দণ্ডের বিরুদ্ধে আপীলের ব্যবস্থা ইংরেজ বিচার-বিভাগের একটি বড় জিনিষ। অতি দরিদ্র অপরাধী কারাগারে বাস কালেও উচ্চতন আদালতে আপীল করিবার সমস্ত সুযোগ পাইয়া থাকে; মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিও প্রাণভিক্ষার আবেদন করিতে পারে।

সেশন জজেরা আইন-নির্দিষ্ট যে-কোন দণ্ড দিতে পারেন; অর্থাৎ ফাঁসি, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, দীর্ঘকাল মেয়াদ প্রভৃতি দিবার ক্ষমতা আছে; কিন্তু এই সব গুরুতর অভিযোগের মোকদ্দমায় অপরাধীর চরম শাস্তি হইবার পূর্বে কাগজপত্র হাইকোর্ট একবার পরীক্ষা করেন। 'অতিরিক্ত সেশন জজদের অনুরূপ ক্ষমতা আছে; কিন্তু সাব্জজদিগের ক্ষমতা ইহা অপেক্ষা কম; ইঁহারা সাত বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড দিতে পারেন।

ফৌজদারী বিচারের জন্য বাঙলাদেশে ২১ জন সেশন জজ, ১৪ জন অতিরিক্ত সেশন জজ ১৯৩১ সালে ছিলেন। ঐ বৎসর বেতনভোগী সকল শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের সংখ্যা ছিল ৪৭২; অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন ৫৫৬; পর বৎসরে যথাক্রমে ১৬ ও ১৩৫ জন কমিয়াছিল। ১৯২১ সালে ৩৫২ ও ৭৩৩ জন ছিলেন। ১৯৩১ সালে ৩৭১,১১৪টি অপরাধ বাঙলাদেশে সংঘটিত

হইয়াছিল। ১৯২১ সালে ৩১৬,৭০২টি অপরাধ হয়। এত অপরাধ পুলিশের খাতায় ওঠে; সমস্তগুলি মোকদ্দমার জন্য হাকিমের সাম্নে আসে নাই। মাত্র ১,৬০,৮৬১ মামলা ম্যাজিষ্ট্রেট্‌রা মীমাংসা করেন; ইহার মধ্যে মাত্র ৫৬টি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ করেন। পূর্বেই বলিয়াছি জেলা হাকিমের এত কাজ যে, তিনি মোকদ্দমা করিবার অবসর পান না। অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট্‌রা ১৬,৬১৪টি, বেঞ্চকোর্টে ১১,২২৮, স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট্ ৯৭টি ও অন্যান্য ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও ডেপুটি ১,৩২,৮২০টি মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন।

১৯৩১-৩২ সালে ২২৬১ দায়রা মামলার বিচার হয়। ইহাতে ৮০৮৩ জন লোক জড়িত ছিল। বিচারে মৃত্যু ২৪; দ্বীপান্তর ১৩২; কয়েদ্ ৩০৬৭; জরিমানা ৯৩; বেত্রদণ্ড ৫।

বাঙলাদেশের ফৌজদারী মামলার হিসাব

		১৯২১	১৯৩১
অপরাধীর সংখ্যা	...	৩,৩৫,৮৬২	৪,৪৪,৭৪৬
বিচারসাপেক্ষ ব্যক্তি	...	২,৯৩,৫২৯	৪,৯৮,১৯০
মুক্তিপ্রাপ্ত	...	১,০২,৯৪৪	২,০৬,০২৭
শাস্তিপ্রাপ্ত	...	১,৭২,০৬৪	২,৫৪,২০৭
মুলতুবী	...	৩,৪৬৭	৫,৩১০
মৃত, পলায়িত, স্থানান্তরিত	...	২১৪	২০৬
বর্ষশেষে বিচারসাপেক্ষ	...	১৪,৮৪০	৩০,৭০১
ফাঁসি	...	৫	১২*
মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত	...	৭	...
দ্বীপান্তরিত	...	১৩০	৯৬
কয়েদে	...	২৮,৩৭৮	২৯,৯৯৫
জরিমানাগ্রস্ত	...	১৩২,২৪৮	১৯২,২৪২
বেত্রাঘাত প্রাপ্ত	...	৫০৫	৫৫৯
জামিনাবদ্ধ	...	৬,৬৮৭	৫,৬৭৪

* মাদ্রাজে ফাঁসি—১৩০, পাঞ্জাবে—২০৯, বোম্বাইতে—৫১।

দশটাকা জরিমানাগ্রস্ত	...	১১৩,৫৩১	১৫৮,৮৪৯
মোট জরিমানার টাকা	...	১৭,৭০,৪০৮	১১,১৮,৪৫৪৲
দশটাকার উপর জরিমানা	...	১৮,৭১৮	৩৩,৩৯৩
জরিমানা আদায়	...	৯,৩৮,৩৭৮	১১,৫৪,৯১৮
ক্ষতিপূরণ প্রদত্ত	...	১,০৩,৮২৭	১,৩১,৯৫৮
পনের দিনের অল্প কয়েদ	...	৫,৭০১	২,৭৮৫
পনের দিন হইতে ছয়মাস কয়েদ		১৫,৩৩৫	১৯,০৭৭
ছয়মাস হইতে দুই বৎসর কয়েদ		৬,২৫২	৬,৮২২
দুই বৎসরের উপর কয়েদ	...	১,০৪০	১,৩১৩

১৮৬১ সালে কলিকাতা হাইকোর্ট স্থাপনের হুকুমনামা মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া প্রদান করেন; পূর্বের সদর দেওয়ানী আদালত ও সুপ্রীম্ কোর্ট উঠিয়া গিয়া এই নূতন বিচারালয় স্থাপিত হইল। প্রদেশের যাবতীয় বিচার বিভাগের অধ্যক্ষতার ভার হাইকোর্ট পাইলেন; ইহার বিচারপতি ও বিচারকগণ স্বয়ং সম্রাজ্ঞী কর্তৃক মনোনীত হন; তাঁহারা বিচার বিষয়ে ভারত গবর্মেণ্টের অধীন নহেন, কারণ প্রজা ও গবর্মেণ্টের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার বিচার হাইকোর্ট করিয়া থাকেন; সেইজন্য স্থানীয় গবর্মেণ্টের কোনো এক্তিয়ার হাইকোর্টের উপর নাই। শুধু হাইকোর্ট নয়, নিম্নতন কোনো বিচারালয়ে যেখানে জজ বা মুন্সেফরা বসেন, তাহার উপর স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটদের ক্ষমতা নাই; এই নিরপেক্ষ বিচার করিবার ব্যবস্থা ইংরেজ শাসনের শ্রেষ্ঠ অবদান।

মহারাণী ভিক্‌টোরিয়ার হুকুমনামা অনুসারে কলিকাতার হাইকোর্ট প্রধান বিচারপতি ও ১৩ জন বিচারক লইয়া গঠিত হয়। হাইকোর্টের দুটি বিভাগ আছে, (১) Original মামলা ও (২) আপীলের মামলা। পূর্বে সদর আদালতগুলি ছিল আপীলের জন্য, সুপ্রীম্ কোর্ট ছিল স্থানীয় মূল মামলার জন্য; হাইকোর্ট সেই দুই ধারাই বহন করিতেছেন। কলিকাতার ভিতরের বড় বড় সকল দেওয়ানী মামলা এবং সমস্ত সেশন মামলা হাইকোর্টের অরিজিন্যাল সাইডে হইয়া থাকে। কলিকাতায় ছোটখাটো মামলার জন্য যে

স্মল কজ্ কোর্ট (Small cause court) আছে, তাহা বিশেষ আইনের দ্বারা গঠিত ; বিচার বিষয়ে হাইকোর্টের অধীন।

হাইকোর্ট সমগ্রদেশের বিচার বিভাগের জন্য দায়ী। জেলা জজের নিকট হইতে আপীল আসিলে তাহার শুনানি, জেলা জজ জুরিদের সহিত একমত না হইলে মামলার সমস্ত কাগজপত্র পরীক্ষা, এক কোর্ট হইতে অন্য কোর্টে বিচার পরিবর্তনের আবেদন শোনা, মুন্সেফ ও জজদের কার্য ও বিচার-ধারার প্রতি দৃষ্টিরক্ষা, তাঁহাদের বদলী, ছুটি প্রভৃতি অসংখ্য কাজ করিতে হয়। বিচার বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেটরা হাইকোর্টের অধীন এবং বে-আইনী বিচার করিলে হাইকোর্টের কাছে বা জেলা জজের কাছে জবাবদিহি কারতে হয়। বে-আইনী হুকুম রদ করিবার ক্ষমতা বিচার বিভাগের আছে। হাইকোর্টের নির্দেশ না পাইলে কোনো অপরাধীর ফাঁসি হইতে পারে না। হাইকোর্টের অধীনে ফৌজদারী বিচার বিভাগের কথা পূর্বে বলিয়াছি।

দেওয়ানী বিভাগে টাকাকড়ির দেনাপাওনা, জমিজমা বিষয়, উত্তরাধিকার ও পার্টিশন, চুক্তিভঙ্গ প্রভৃতি অর্থঘটিত বিষয় লইয়া বিবাদের বিচার হয়। মুন্সেফের আদালত সর্বনিম্ন বিচারালয় ; প্রত্যেক মহকুমা বা সাব্‌ডিভিশনে মুন্সেফী আদালত আছে ; এছাড়া কয়েকটি বড় বড় শহরে কেবলমাত্র মুন্সেফী কাছারি আছে, তাহাকে চৌকী বলে ; এ সব শহরে ফৌজদারী বিচার হয় না। মুন্সেফরা সাধারণত হাজার টাকা পর্যন্ত দাবীর মোকদ্দমা করিয়া থাকেন ; কোনো কোনো প্রবীণ মুন্সেফকে দুই হাজার টাকার দাবীর মামলার অধিকার দেওয়া আছে।

মুন্সেফদের উপরে প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই সাব্‌জজ আছেন। কাজের গুরুত্ব বুঝিয়া কোনো কোনো জেলায় দুই হইতে চারিজন পর্যন্ত সাব্‌জজ থাকেন ; উঁহারা যে-কোনো দাবীর মামলা করিতে পারেন। মুন্সেফদের বিচারের বিরুদ্ধে আপীল বা পুনর্বিচারের অধিকার ইঁহাদের আছে। পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত দাবীর যে-সকল মোকদ্দমার বিচার ইঁহারা করেন, তাহার বিরুদ্ধে আপীল জেলার জজসাহেবের নিকট হয়। ইহা অপেক্ষা উচ্চ দাবীর মোকদ্দমার আপীল সরাসরি হাইকোর্টে করিতে হয়।

হাইকোর্টই সাধারণত সকল মোকদ্দমার শেষ বিচারক। তবে বিলাতে

প্রিভিকৌন্সিলে আপীল চলে ; কিন্তু দশহাজার টাকার দাবী না হইলে বিলাতে আপীল গ্রাহ্য হয় না। প্রিভিকৌন্সিলে আপীল অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য বলিয়া অধিকাংশ মামলার নিষ্পত্তি হাইকোর্টেই হইয়া যায়।

জেলার প্রধান বিচারক জজসাহেব ; সাধারণত সিবিল সার্বিসের লোকই জজ হন। আপীল শোনা ও সেশনস বা দায়রার মোকদ্দমার বিচার তাঁহার প্রধান কর্তব্য ; এছাড়া মহকুমার দেওয়ানী আদালতের যতকিছু নালিশ শোনা ও তাহার মীমাংসা করিতে হয়। দায়রার বিচারে জুরি ডাকা হয়। অপরাধীকে ফাঁসির হুকুম একমাত্র জজসাহেব দিতে পারেন ; কিন্তু হাইকোর্ট একবার কাগজপত্র দেখেন।

মুন্সেফ ছাড়া ইউনিয়নবোর্ডের অন্তর্গত বেঞ্চকোর্টও আজকাল ছোট ছোট দেওয়ানী মামলা নিষ্পত্তি করে ; ইহাতে মুন্সেফদের কাজ কমিয়াছে বটে ; কিন্তু লোকদের মধ্যে অল্পেই মামলা করিবার প্রবৃত্তি অত্যন্ত তীব্র হইয়াছে।

বর্তমানে কলিকাতা হাইকোর্টে ১৫ জন জজ ; ইহা ছাড়া ২১ জন জেলা-জজ, ১৪ জন অতিরিক্ত জজ, ৪৪ জন সাব্‌জজ ও ২৩৫ জন মুন্সেফ আছেন।

প্রেসিডেন্সী বিভাগের ছোট ছোট বিচারের জন্য একজন প্রধান জজ, ছয় জন সাধারণ জজ নিযুক্ত আছেন।

১৭৭৩ সাল হইতে ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত গবর্ণর জেনারেল যে-সকল আইন জারি করিয়াছেন, তাহাকে রেগুলেশন বলে ; ১৮৩৩ সালে সনদ গ্রহণের সময়ে ঠিক হয়, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আর বণিক্‌সঙ্ঘ থাকিবে না। ইহারা ইংল্যণ্ডের হইয়া ভারতবর্ষ শাসন করিবে। এই সময়ে অনেক সংস্কার সাধিত হয় ; তাহার অন্যতম হইতেছে—আইন-গ্রন্থ-প্রণয়ন ; এইজন্য এক কমিশন বসে ; লর্ড মেকলের চেষ্টায় প্রথম Penal Code-এর খশড়া হয় ; তারপর বাইশ বৎসর পরে নানারূপ ছোটখাটো পরিবর্তনের মধ্য দিয়া উহা আইনবদ্ধ হয়। সুপ্রীম্‌ কোর্টের শেষ বিচারপতি স্যর বার্ণেস পীকক্‌ সাহেব উহাকে যথার্থভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর খাড়া করেন। সিপাহী বিদ্রোহের পর যখন আর একবার ভারতের শাসনপদ্ধতির মধ্যে পরিবর্তন ঘটে, সেই সময়ে (১৮৬০) পেনাল্‌ কোড্‌ ও ১৮৬১ সালে ভারতীয় ফৌজদারী কার্যবিধি অর্থাৎ কি ভাবে

ফৌজদারী মামলা হইবে, সে বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা সমেত আইন-গ্রন্থ প্রথম মুদ্রিত হইল। দেওয়ানী কার্যবিধিও সেই সময়ে লিপিবদ্ধ ও মুদ্রিত হয়; এই দুই গ্রন্থের মধ্যে ভারতের ফৌজদারী ও দেওয়ানী শাসন ও বিচার সম্বন্ধে যাবতীয় কথা এত পরিষ্কার করিয়া লেখা যে, সে সম্বন্ধে কাহারও কোন ভুল হইতে পারে না। ১৮৯৮ সালে ফৌজদারী কার্যবিধি ও ১৯০৮ সালে দেওয়ানী কার্যবিধির একবার মাত্র সংস্কার হয়।

১৮৭২ সাল পর্যন্ত য়ুরোপীয় বৃটীশ প্রজা বা সাহেবদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা একমাত্র হাইকোর্টে হইতে পারিত। এই সময়ে স্থির হয় যে, সেশনস্ জজ বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট্রা বিচার করিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহাদের ইংরেজ হওয়া চাই। ইহার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ উঠে বাঙলাদেশ হইতে। সিবিলিয়ান ম্যাজিষ্ট্রেট্ রমেশচন্দ্র দত্তের প্রচেষ্টায় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্ বিহারীলাল গুপ্ত এ বিষয়ে গবর্মেণ্টকে ভারতীয় ম্যাজিষ্ট্রেট্দের অক্ষমতার প্রতিবাদ করিয়া পত্র দেন। সেইসূত্রে লর্ড রীপনের সময় এই ভেদ উঠাইয়া দিবার জন্য এক আইনের খশড়া হয়। এই খশড়ার ফলে দেশময় ইংরেজ ও য়ুরোপীয়দের যে তীব্র প্রতিবাদ জাগিয়াছিল, সে বিষয়ে আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। ইলবার্ট বিল যেভাবে রচিত হয়, সেভাবে পাশ হইল না। স্থির হইল যে-কোনো য়ুরোপীয় অপরাধী যে-কোনো সামান্য অপরাধের জন্যও দেশী বা বিদেশী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে বিচারের সময় জুরি দাবী করিতে পারিবে, এই জুরির অর্ধেক ইংরেজ বা আমেরিকান হওয়া চাই-ই। বিচারের এই বৈষম্য সম্পূর্ণরূপে এখনো দূর হয় নাই; তবে বর্ণগত বৈষম্য এখন বিচারালয়ে অনেক পরিমাণে কমিয়াছে, বিশেষভাবে ১৯২৩ সালের এক আইন এই ভেদনীতি অনেক পরিমাণে হ্রাস করিয়াছে। দেওয়ানী আদালতে বর্ণবৈষম্য আইনের মধ্যে নাই।

আইন ব্যবসায়ী অনেক রকমের; যথা ব্যারিষ্টার, হাইকোর্টে এড্‌ভোকেট, উকিল, এটর্নী বা সলিসিটার, প্লীডার ও মোক্তার। ইহার মধ্যে ব্যারিষ্টার ও এড্‌ভোকেটরা হাইকোর্টের Original মোকদ্দমায় নামিতে পারেন। পাঠকদের স্মরণ আছে, হাইকোর্ট হইতেছে পূর্বযুগের সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালতের এবং সুপ্রীম কোর্টের উত্তরাধিকারী। হাইকোর্টের পূর্বে যে সুপ্রীম

কোর্ট ছিল, তাহা ইংল্যণ্ডের রাজার বিচারালয় ছিল—প্রধানত কোম্পানীর কর্মচারী ও ইংরেজ বাসিন্দাদের বিচারের জন্য গঠিত হয়, আপীল শোনা ইহার কাজ ছিল না। ইংল্যণ্ডের আইন সেখানে চল্‌তি ছিল; সেই সূত্রে সেখানে Original মামলা হইত ও ইংল্যণ্ডের ব্যারিষ্টাররাই কেবল মামলা চালাইতে পারিতেন। তারপর হাইকোর্ট বাঙলাদেশের প্রধান বিচারসভা হইল, আইন ও শাসনে অনেক পরিবর্তন সংঘটিত হইল; কিন্তু ব্যারিষ্টারদের সেই একচেটিয়া আধিপত্য হাইকোর্টের Original মামলায় স্থায়ী হইল। মাত্র কয়েক বৎসর হইল, হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট বা দেশীয় উকিল (Vakil)রা Original মামলায় নামিতে পারিয়াছেন। অবশ্য হাইকোর্টের উকিলদের এড্‌ভোকেট হওয়া সম্বন্ধে অনেক নিয়ম-নিষেধ আছে।

Vakilরা কেবল হাইকোর্টের আপীল মামলায় নামিতে পারেন। হাইকোর্টের আপীলের দিকটা সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালত হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া; সেযুগে উকিলরাই আপীলের মামলা চালাইতেন; সেই ঐতিহাসিকতার ধারায় তাঁহারা আপীল মোকদ্দমায় ওকালতী করেন। হাইকোর্টের উকিল ও ব্যারিষ্টাররা জেলা কোর্টে বা মুন্সেফের কোর্টে, সেশনসে উপস্থিত হইতে পারেন। ব্যারিষ্টারদের কাছে কোনো মামলা প্রত্যক্ষভাবে কেহ দিতে পারে না; এটর্নীদের কাছে মোকদ্দমার সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া দিতে হয়। এটর্নীই ব্যারিষ্টারকে মোকদ্দমার বিষয় সমঝাইয়া দেন। প্লীডাররা হাইকোর্টের নিয়মাধীনভাবে জজ ও মুন্সেফের কোর্টে মোকদ্দমা চালনা করিতে পারেন। মোক্তাররা কেবলমাত্র মহকুমার ফৌজদারী কোর্টে উপস্থিত হইতে পারেন।

বাঙলার হাইকোর্টের একজন বিশিষ্ট ব্যারিষ্টারকে গবর্মেণ্ট এডভোকেট-জেনারল পদ দেন। বড়লাটের অধ্যক্ষ-সভায় একজন আইন-সদস্য থাকেন; ভারতগবর্মেণ্টের যাবতীয় আইনের খশড়া, আইন সম্বন্ধে মীমাংসার জন্য তিনি দায়ী। কাউন্সিলের বাহিরে কলিকাতার এড্‌ভোকেট জেনারেলই গবর্মেণ্টের প্রধান পরামর্শদাতা; তিনি বাঙলায় ব্যবস্থাপক সভার মনোনীত সদস্য। ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল নামে অপর একজন ব্যারিষ্টার তাঁহাকে সহায়তা করেন। এছাড়া গবর্মেণ্ট সলিসিটার আছেন।

কলিকাতার জন্য শেরিফ নামে আর একজন কর্মচারী গবর্মেণ্ট নিযুক্ত করেন। ইনি হাইকোর্টের অধীন।

কলিকাতা হইতে হাইকোর্টের বিচার সমূহের বর্ণনা Indian Law Report নামে প্রকাশিত হয়। হাইকোর্টের বিচারক ও বিচারপতিদের 'রায়' আইনের মতই কার্যকরী; তাঁহাদের রায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ হয় এবং অনেক জটিল সমস্যার সমাধান ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। সেইজন্য হাইকোর্টের বিচারকদের রায় শুধু এদেশে নয় ইংল্যণ্ডেও আইনজীবীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করেন। গবর্মেণ্ট দ্বারা প্রকাশিত Law Report ছাড়া Calcutta Weekly Notes নামে পত্রিকা বাহির হয়।

বাঙলার দেওয়ানী মামলা

বিহার-উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশে ১৯০১ সালে

স্থাবর সম্পত্তি ও টাকার মামলা	২,৮৪,০১৭
বাকি খাজনা	২,৮৬,২০১
টাইটল্ মামলা	৭৬,২৭১
মোট	৬,৪৬,৪৮৯
১৮৯১-১৯০০ গড়ে মামলা	৬,০৮,১৫৮
১৮৮১-১৮৯০ গড়ে মামলা	৪,৭১,৯৩৩

	১৯২১	১৯৩১
টাকা, স্থাবরসম্পত্তি দাবী করিয়া মামলার সংখ্যা	২,৬৫,৩১৩	৩,২৮,০৯১
বাকি খাজনার মামলা	৩,২৪,৫৪৬	৩,০২,৮৩৪
খাজনা বৃদ্ধি বা মাপ সংক্রান্ত মামলা	১০,৩৬৩	৪৫,৪১৪
উচ্ছেদ বা দখলি মামলা	১,৭১৯	৬২৫
খাজনা সংক্রান্ত অন্যান্য মামলা	৩,৩৭২	১,৮৬৪
মোট	৩,৪০,০০০	৩,৫০,৭৩৭

	১৯২১	১৯৩১
টাইটল্ ও অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তিবিষয়ক মামলা	২৬,৮৬৭	২০,৪৪৭
বিশেষ ধারার মামলা ...	২,৩৭৯	৮৮১
বন্ধকী মামলা ...	২৯,০২৩	১৯,৮২৪
বিবধ ...	৮,৯৮২	৯,৩৮১
মোট	৬৭,২৫১	৫০,৫৩৩
সর্বসমেত	৬,৭২,৫৬৪	৭,২৯,৩৬১
১০৲ কম দাবীর মামলা	৯১,৪৩৮	১,১২,৪৯২
১০৲-৫০৲ দাবীর মামলা	২,৭৮,০৩২	৩,০৩,০৪০
৫০৲-১০০৲ দাবীর মামলা	১,২৬,৪২৬	১,৩৯,৮৭৬
১০০৲-৫০০৲ দাবীর মামলা	১,৪৬,১৬১	১,৪৬,৬৮০
৫০০৲-১০০০৲ দাবীর মামলা	১৬,১২৮	১৪,৬৭২
১০০০৲-৫০০০৲ দাবীর মামলা	১০,৩৯১	৯,৭৯৯
৫০০০৲ টাকার উপর দাবী	২,৬৩৮	২,০৩৪
অন্যান্য	১,৩৫০	৭০৮
মোট	৬,৭২,৫৬৪	৭,২৯,৩৬১
মোট টাকার দাবী	১৬,২১,৫৭,০০০	১৪,২৪,৯৯,০০০
মোট ভারত	৬৮কোটি ৫০লক্ষ	৬৯কোটি ৬১লক্ষ

দেওয়ানী ও রাজস্ব বিষয়ক মোকদ্দমা

	১৯২১	১৯৩১
আদালতে পেশ মামলা	৯,৩৫,৬৩২	৯,৬৭,২৮৭
বিনা বিচারে নিষ্পত্তি	১,২০,৫১৬	১,০০,৩৪০
একতরফা মামলা	৫,২৬,০৫২	৫,৫৪,৯৬০
বাদীর পক্ষে জিত	৭৩,০৪০	৯,৮৯,৭৩
প্রতিবাদীর পক্ষে জিত	১৩,৭৫৫	১,৭০,৬৩

	১৯২১	১৯২২
সালিশি	৮৮৪	৬৪৪
বৎসরান্তে অসমাপ্ত বিচার	২,০১,৩৮৫	১,৯৩,১৯৬

বিবিধ বিষয়ক মোকদ্দমা

	১৯২১	১৯৫১
আদালতে পেশ মামলা	১,৩১,২৩৪	১,৪৫,৭৭০
বিনা বিচারে নিষ্পত্তি	৩০,২০৩	৫৫,৯০২
একতরফা	৪৭,৪৯০	৪৭,৮৭২
বাদীর পক্ষে জিত	১০,১৫৮	১৬,৬৩২
প্রতিবাদীর পক্ষে জিত	৯,৬০৬	১০,৬০৮
সালিশি	৪৪	২১
বৎসরান্তে অসমাপ্ত বিচার	২৪,৩৮৭	২৪,৫৫৬

দেওয়ানী আপীলডিক্রিজারীর বিরুদ্ধে আপীল

	১৯২১	১৯৩১
আদালতে আপীল	৪৮,৩২২	৪৪,৫৬৮
আপীল ডিসমিস্	৩,২১৫	৩,৮৩৪
ডিক্রি বাহাল	১১,২০৩	১০,৯০৮
কম্‌তি ডিক্রিদান	৩,২৪৬	৩,২৪৩
ডিক্রিরদ	৩,২৮৭	৩,২০৪
পুনর্বিচারের জন্য ফেরত	১,২৮৭	১,০৩৫
বৎসরান্তে অসমাপ্ত	২৬,০৮৪	২২,৩৪০

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

পুলিশ বিভাগ

বাঙলাদেশে মুসলমানীযুগে চৌকিদার ও দারোগা ছিল। দেওয়ানী আইনের পর বহুকাল পুলিশের কাজের প্রতি কোম্পানী মনোযোগ দেন নাই; চৌকিদাররা চাকরান্ ভোগ করিত, ঘাটোয়াররা চাকরান্ পাইয়া 'ঘাট' পাহারা দিত; জমিদারদের পাইক, লাঠিয়াল দস্যুদের দমন করিতে চেষ্টা করিত; তাছাড়া সাধারণ বাঙালী বলিষ্ঠ ছিল, তাহাদের ঘরে অস্ত্র-শস্ত্র থাকিত, দস্যু-তস্করের হাত হইতে কিছু পরিমাণে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ ছিল।

কোম্পানীর শাসন যতই দৃঢ় হইতে লাগিল, ততই শাসনকে কেন্দ্রগত করিবার দিকে ঝোঁক বাড়িতে লাগিল। কর্ণওয়ালিস্ ১৭৯৩ সালে বাঙলার জেলা জজদিগকে জেলার মধ্যে প্রতি ৪০০ বর্গ মাইলে একটি করিয়া থানা স্থাপন করিবার আদেশ করেন। তাহার পর পুলিশের ভার কিভাবে একহাত হইতে অপর হাতে যায়, তাহার ইতিহাস আমরা অন্যত্র বলিয়াছি।

সিপাহী বিদ্রোহের পর বৃটীশরাজ বুঝিলেন আভ্যন্তরীণ শাসনের জন্য আরও দৃঢ় ও ব্যাপক ব্যবস্থা প্রয়োজন। পুলিশ বিভাগকে ১৮৬১ সালে সর্বপ্রথম সুনিয়ন্ত্রিত করা হয়।

বাঙলাদেশের সমগ্র পুলিশবাহিনীর কর্তা ইন্সপেক্টর-জেনারেল; তিনি পুলিশবাহিনীর সাজসজ্জা, শাসন, শিক্ষা, ট্রান্সফার প্রভৃতি কাজের জন্য দায়ী।* পুলিশের যথার্থ Unit হইতেছে জেলা। জেলার পুলিশের কর্তা ডিষ্ট্রিক্ট্ সুপারিটেণ্ডণ্ট্ বা সুপার (D. S. P.); তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীন; দেশের শান্তি ও শাসনের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশানুসারে তিনি নিজ কর্তব্য করেন। পুলিশের শাসন নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনি I. G.র নিকট দায়ী।

---

* পুলিশ বিভাগকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়; যেমন মিলীটারীপুলিশ, সাধারণপুলিশ, রেলওয়েপুলিশ, জলপুলিশ, গোয়েন্দাপুলিশ ও চৌকিদার। কলিকাতা পুলিশ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

সদরে D. S. P. থাকেন ; সেখানে রিজার্ভ পুলিশ, পুলিশ লাইন, অস্ত্র-শস্ত্র, রসদ-পত্র থাকে। সদরের পুলিশ ট্রেজারী রক্ষা, কয়েদী স্থানান্তরিত করা, টাকশাল হইতে টাকা আনিবার সময় রক্ষী প্রভৃতির কাজ করে। মোট কথা, সদরের পুলিশ অনেকটা পরিমাণে ছোট একটি সৈন্যবাহিনীর কাজ করে ; দাঙ্গা-হাঙ্গামায় গুলি ছোড়ার প্রয়োজন হইলে ইহারা করে। শান্তিস্থাপনের প্রথম চেষ্টা ইহাদের দ্বারা হয়। প্রায় সদরে ২০০ পুলিশ থাকে।

পুলিশের কাজের সুবিধার জন্য জেলাগুলিকে কতকগুলি থানায় বিভক্ত করা হয় ঃ এই থানার কর্তাকে বলে সাব্-ইন্সপেক্টর ; কতকগুলি থানার উপর একজন ইন্সপেক্টর থাকেন। থানাগুলির তদারক, বিশেষ কোনো জটিল ব্যাপারের তল্লাস প্রভৃতি কাজ করেন ইন্সপেক্টর। এই থানায় সাব্-ইন্সপেক্টর বা দারোগার কাছে লোকে দাঙ্গা, হাঙ্গামা, চুরি-ডাকাতির খবর প্রথম দেয়। থানায় সর্বদাই একজন অভিযোগ শুনিবার জন্য থাকেন। যদি অভিযোগ এমন হয় যে, তখনই পুলিশকে যাইতে হয়, তাহা হইলে সেই শ্রেণীর অভিযোগকে 'cognisable case' বলে ; 'ডায়েরি'তে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করিয়া পুলিশ তখনই তদারকে যান। আর যে অভিযোগ সে শ্রেণীর নয়, সেগুলিকে বলে 'non-cognisable case ; পুলিশ তখনই তদন্ত করিতে যায় না, ফৌজদারি আদালতে নালিশ করিবার জন্য বলে ; এবং নালিশ হইলে ম্যাজিস্ট্রেট্ পুলিশকে তদারক করিবার জন্য নির্দেশ করেন, খানাতল্লাসী করিতে বলেন, গ্রেপ্তার করিতে বলেন। মোট কথা, যে-সব ফৌজদারি ব্যাপার হাতেহাতে পাকড়ানোর মত নয়, সেগুলি ম্যাজিস্ট্রেট্ পুলিশকে অনুসন্ধান করিতে বলেন।

Cognisable বা হাতেহাতে ধরা পড়ার মামলায় পুলিশ স্বয়ং মোকদ্দমা কাছারিতে চালায় ; বাদী সেখানে সাক্ষীর মত। আসামী অবশ্য অব্যাহতি-লাভের জন্য সেখানে উকিল নিয়োগ করিতে পারে। আসামীকে জামিনে মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে ; তবে গুরুতর মামলা হইলে জামিন দেওয়া হয় না। কাছারিতে এইসব মোকদ্দমা পুলিশের তরফ হইতে কোর্ট-ইন্সপেক্টর বা সাব্-ইন্সপেক্টর বা সরকারী উকিল বা Public Prosecutor পরিচালনা করেন। গুরুতর অভিযোগ না হইলে বিচার সেখানেই নিষ্পত্তি হয়।

কিন্তু গুরুতর অভিযোগে ম্যাজিষ্ট্রেট নিজে বিচার করেন না, সেশনসে বা দায়রা জজের কোর্টে তিনি মামলা পাঠাইয়া দেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ও জজের রিপোর্ট হইতে S.P. জানিতে পারেন, তাঁহার নিম্নতন পুলিশ কর্মচারীরা ঠিকভাবে কাজ করিতেছে কি না।

১৯০২ সালে লর্ড কর্জনের সময়ে এক পুলিশ কমিশন বসে; সেই কমিশনের মন্তব্যানুসারে পুলিশ বিভাগের অনেক সংস্কার হয়। এই সময়ে C. I. D. বা ক্রিমিনাল ইন্‌ভেষ্টিগেশন ডিপার্টমেণ্ট্ বা গোয়েন্দা বিভাগ খোলা হয়। এই বিভাগের অন্তর্গত নানারূপ বৈজ্ঞানিক বিভাগ আছে। এই গোয়েন্দা বিভাগ সাধারণ অপরাধের সন্ধান করে। কিন্তু বর্তমানে এছাড়া কেবলমাত্র রাজনৈতিক অপরাধ অনুসন্ধানের জন্য I. B. বা ইন্‌টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ খোলা হইয়াছে। ইহাদের কর্মচারীরা কলিকাতা I. B-র কর্তার দ্বারা পরিচালিত। ইহাদের আদেশে সাধারণ পুলিশ গ্রেপ্তার করিতে পারে।

চৌকিদাররা গ্রামের পুলিশ; ইহাদের বেতন দেয় য়ুনিয়নবোর্ড, শাসন ও পরিচালনা করে পুলিশ বিভাগ; ইহাদের জরিমানা, বরখাস্ত করিবার কোনো ক্ষমতা বোর্ডের নাই। বাঙলাদেশে প্রায় এক লাখ চৌকিদার ও দফাদার আছে; সপ্তাহে একদিন থানায় হাজিরা দিতে হয়। গ্রামের চাষবাস, জন্মমৃত্যুর হিসাব প্রভৃতি সমস্ত খবর রাখা, বদমায়েসদের প্রতি লক্ষ্য রাখা, মদ ধরা প্রভৃতি কাজে পুলিশের প্রধান সহায় ইহারা। য়ুনিয়ন বোর্ডে চৌকিদারের জন্য বৎসরে ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ১৯০৪ সালে বঙ্গ, বিহার-উড়িষ্যায় ১,৫৩,০০০ চৌকিদার ছিল; ইহাদের জন্য ৭৯ লক্ষ টাকা দিতে হইত। বাঙলায় পুলিশের জন্য ২ কোটি ২০ লক্ষ; মোট পুলিশ ও চৌকিদারিতে ২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা বাঙলাদেশে খরচ হয়।

১৮৭০ সালের পূর্বে চৌকিদারদের কোথাও কোথাও চাকরান বা নিষ্কর জমি ছিল; তাহার বদলে তাহারা কাজ করিত। অন্য স্থানে গবর্মেণ্ট ইহাদের বেতনের ব্যবস্থা করিতেন; বেতন শহর বা জেলার লোকে দিত। ১৮৭০ সালে নূতন চৌকিদারী আইন পাশ হয়; এই আইনানুসারে গ্রাম পঞ্চায়েৎ নিযুক্ত হয়; এই পঞ্চায়েতের উপর চৌকিদারি ট্যাক্স নির্ধারণ, আদায়, চৌকিদারদের বেতন দেওয়া প্রভৃতির ভার অর্পিত হয়।

পুলিশ

পুলিশ বিভাগ বাঙলা সরকারের সব থেকে বড় খরচের বিভাগ। বাঙলা দেশ যখন ১৯১২ সালে পুনর্গঠিত হয়, তখন এই বিভাগের ব্যয় ছিল ৮৩ লক্ষ টাকা। কুড়ি বৎসর পরে ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা বেশি হইয়াছে। পরিশিষ্টে এই ব্যয়ের সবিস্তার তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।

১৮৬১ সালে ভারতীয় পুলিশ বিভাগ যথার্থভাবে গঠিত হয়। তখন বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম একত্র ছিল। ১৮৭১ সালে আসামের জন্য পৃথক্ পুলিশ বিভাগ গঠিত হইল। বঙ্গচ্ছেদ পর্যন্ত (১৯০৫) পুলিশ বিভাগের শক্তি তেমন বাড়ে নাই। ১৮৮১ সালে ২৬ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা পুলিশের জন্য খরচ হয়। ১৯০২ সালে ৫৪ লক্ষ ৯০ হাজার। স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে দেশের মধ্যে নানাভাবে অশান্তি প্রসার লাভ করে। ফলে বহু থানা নূতন সৃষ্টি করিতে হয়, পুলিশের সংখ্যাও বাড়াইতে হয়। *

* Mr. R. N. Reid in reply made the following statement showing the annual total expenditure for the detenus for the periods from 1925 to 1934.

Year	Expenditure Rs.
1925-26	47,059
1926-27	1,19,034
1927-28	1,38,159
1928-29	50,976
1929-30	2,211
1930-31	1,50,877
1931-32	9,69,945
1932-33	13,15,622
1933-34	19,77,340
1934-35	21,46,527

The above figures do not include expenditure in jails and on the police, figures of which are not separately available.

The following is a statement showing the annual expenditure for the maintenance of each detention camp from the time of their establishment up to the present time.

কলিকাতার পুলিশ

কলিকাতার পুলিশ ব্যবস্থা মফঃস্বল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। সাধারণ ফৌজদারী দণ্ডবিধি ছাড়া বিশেষ পুলিশ আইন এখানে চলে, যাহা মফঃস্বলে অজ্ঞাত।

কলিকাতার পুলিশ বাহিনীর কর্তাকে বলে 'পুলিশ কমিশনর' * তিনি বাঙলার ইন্সপেক্টর জেনারেলের অধীন নহেন। বাঙলা গবর্মেণ্টের সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষযোগ। কলিকাতার পুলিশ কমিশনরের অনেক ক্ষমতা; ফায়ার ব্রিগেড তাঁহার তত্বাবধানে; কলিকাতার মোটর যান-বাহনের পাশ তাঁহার কাছ হইতে লইতে হয়। অস্ত্র-শস্ত্র রাখায় তাঁহার অনুমতি লইতে হয়। শোভাযাত্রার অনুমতি তিনি দেন; সাধারণ পার্কে সভার অনুমতি তাঁহার কাছ হইতে লইতে হয়। পুলিশ কমিশনরকে সাহায্য করিবার জন্য এসিস্টেণ্ট ও ডেপুটি পুলিশ কমিশনর, ইন্সপেক্টর, সাব্ ইন্সপেক্টর আছেন।

পুলিশ চালানী মোকদ্দমার বিচারের ব্যবস্থাও সাধারণ বিচার হইতে পৃথক্। কলিকাতার ফৌজদারী ও পুলিশচালানী মামলা করেন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্রা; এজন্য একজন চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্ আছেন; তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য কয়েকটি আদালত ও কয়েকজন বেতনভোগী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট্ আছেন। কলিকাতার পুলিশচালানী মামলার বিচার খুব তাড়াতাড়ি হয়। প্রেসিডেন্সী প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট্ অপরাধীকে ছয়মাসের জেল অথবা দুইশ' টাকার জরিমানা সরাসরি করিতে পারেন; তার কোনো আপীল নাই। দুইশ' টাকার কম জরিমানা ও বেত্রদণ্ড দিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্

	1931-32	1932-33	1933-34	1934-35
	Rs	Rs.	Rs.	Rs.
Buxa	2,93,701	1,98,170	1,66,594	1,49,254
Hijli	2,97,642	2,86,395	2,90,267	3,04,000
Berhampore	42,716	3,29,576	4,22,270	4,23,243
Deoli	62,889	1,91,692	7,08,531	7,08,490

* ১৮৫৬ সালের এক আইনের দ্বারা কলিকাতার জন্য পুলিশ কমিশনরের পদ সৃষ্টি হয়; ১৮৬৮ সালে গোয়েন্দা বিভাগ খোলা হয়। ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত কলিকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ও পুলিশ কমিশনর একই ব্যক্তি ছিলেন; ঐ বৎসরে দুইটি পৃথক্ পদ হয়।

A. B. Patrika, 23 Aug. 1925

রায় পর্যন্ত লেখেন না। অন্যান্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নানারূপ ক্ষমতা আছে; তবে তাহাদের কতকগুলি বিচারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে ফৌজদারী সেশনসে আপীল চলে। এ বিষয়ে আমরা অন্যত্র বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি। (শাসন দ্রষ্টব্য)।

কলিকাতার পুলিশ বাঙলার সাধারণ পুলিশ হইতে পৃথক্; ইহাদের শাসন, বেতন সমস্তই বিশেষ। ১৯৩১ সালে কলিকাতা পুলিশের সংখ্যা কিরূপ ছিল দেখা যাক্,—

	সাধারণ	পোর্ট পুলিশ	মোট
কমিশনর, ডেপুটি কমিশনর	৭	১	৮
এসিস্‌টেণ্ট কমিশনর	১০		১০
ইন্সপেক্টর	৬০	৫	৬৫
সাব্‌-ইন্সপেক্টর	১০৯+১	৭	১১৭
সার্জেণ্ট	২০৩	১১	২১৪
এসিস্‌টেণ্ট সাব্‌-ইন্সপেক্টর	১৪৫	৭	১৫২
হেড কনষ্টেবল	৩৬৬+৭	৫৭	৪৩০
সোয়ার হেড্ কনষ্টেবল	৫		৫
কনষ্টেবল পদাতিক	৩৮৮১+৮৩	৫৬০	৪৫২৪
,, জল		৮২	৮২
সোয়ার	৪৮		৪৮
মোট	৪৮৩৪+৯১	+ ৭৩৩	= ৫৬৫৮

এ ছাড়া অস্থায়ী অতিরিক্ত পুলিশ অনেক নিযুক্ত হইয়াছে,—

(১)	স্পেশাল ব্রাঞ্চ গার্ড	১৪
(২)	অতিরিক্ত সশস্ত্র	১৫+৯৬ সিপাই
(৩)	গোয়েন্দা-পোর্টপুলিশ	১+১০ কনষ্টেবল
(৪)	স্পেশাল ব্রাঞ্চে অতিরিক্ত	২৬+৩৮ ,,
(৫)	অতিরিক্ত সার্জেণ্ট	৩১
		২৩১

কলিকাতায় মোট পুলিশ বাহিনী ৫৬৫৮+২৩১=৫৮৮৯।

কলিকাতার ৭জন ডেপুটি কমিশনর নিম্নলিখিত কাজগুলি দেখেন—

(১) শাসন, (২) উত্তর বিভাগ, (৩) দক্ষিণ বিভাগ, (৪) স্পেশাল ব্র্যাঞ্চ বা রাজনৈতিক বিভাগ, (৫) গোয়েন্দা বিভাগ, (৬) পোর্ট পুলিশ, (৭) যান-বাহন বিভাগ : এই বিভাগ কলিকাতার গাড়ীর লাইসেন্স প্রভৃতি দেন।

নিখিল বঙ্গের পুলিশ বাহিনী

	১৯১৩-১৪	১৯২২-২৩	১৯৩১-৩২
ইন্সপেক্টর-জেনারেল	১	১	১
কলিকাতা কমিশনর অব্ পুলিশ	১	১	১
ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল	৪ + ১*	৬ + ১*	৬
সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট	৪৪ + ২*	৫২ + ৬*	৫২ + ৬*
এসিস্‌টেণ্ট সুপার	৪৫	৫২	৪৭
ডেপুটি সুপার	২৩ + ২*	২৮ + ২	২৯ + ৬*
ইন্সপেক্টর	১৬০	২০০	২৫৬ + ৫৪*
সাব্-ইন্সপেক্টর	১৫৭৮	১৭০৯	১৮২৬ + ১২৪*
এসিস্‌টেণ্ট সাব্‌ইন্সপেক্টর ও হেড কনষ্টেবল	১৭৫৬	২৪০৫	২৬১৬ + ৪৩৫*
কনষ্টেবল	১৩৯৮০	১৯০৩৭	১৯৬৮৬ + ১৬৫৪*
চৌকিদার ও দফাদার			৭৩৭৩৩†

ইন্সপেক্টর জেনারেল নিখিল বঙ্গীয় পুলিশের কর্তা। তাঁহাকে সাহায্য করেন ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল। সমস্ত প্রদেশটিকে ৬টি ভাগ করিয়া এক একজনের তত্ত্বাবধানে এক একটি বিভাগ দেওয়া আছে। ইঁহারা হইতেছেন বিভাগীয় কমিশনরের মত।

প্রত্যেক জেলায় একজন করিয়া সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আছেন; তাঁহারাই পুলিশের কর্তা। সাধারণ পুলিশ ছাড়া, রেল পুলিশ আছে। রেলওয়ে

* অস্থায়ী নিয়োগ

† ১৯৩১-৩২ সালে বাঙলাদেশে ৭৬৭৩৩ জন চৌকিদার ও দফাদারের জন্য ৫৬,৮৫,৪৮০ টাকা; ১৯৩২-৩৩ সালে ৭৬,৩১০ জনের জন্য ৬৫,৯৫,৭৯০ টাকা ব্যয়িত হয়।

পুলিশের পৃথক্ ৪৩টি থানা আছে। সাধারণ পুলিশ বিভাগ ছাড়া গোয়েন্দা বিভাগ আছে। ইহা সম্পূর্ণ পৃথক্ প্রতিষ্ঠান; ইহার জন্য নানা বিশেষজ্ঞের দল আছে; যেমন আঙুলের ছাপ, ফটোগ্রাফী বিভাগ, ক্রিমিনাল ইন্-টেলিজেন্স বিভাগ, হাতের লেখা ও পায়ের ছাপ বিশেষজ্ঞ আছে। ইহারই একটি বিশেষ শাখা কেবল রাজনৈতিক অপরাধ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত।

বর্তমানে বঙ্গদেশে ৬০৮টি থানা আছে; এছাড়া ৪৩টি রেলওয়ে পুলিশ থানা আছে; ১৯১২ সালে রেলওয়ে থানা বাদে ৪৫৩টি থানা ছিল।

বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম*

১৮৬১		বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা ১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	বঙ্গদেশ ১৯১১	১৯২১	১৯৩০
১	১। ইন্সপেক্টর জেনারেল	১	১	১		১৫	১৭
৬	ডেপুটি ইন্সপেক্টর	২	২	২			
৫২	২। সুপার, এসিস্টেণ্ট,	৭৩	৭১	৭৫		১৩৬	১৩১
১১১	ডেপুটি সুপার						
৫৭০	৩। ইন্সপেক্টর,	১৪৩	১৫৫	১৬৯		২২৫৭	২২৬৬
৯৩৬	সাব্-ইন্সপেক্টর	৬৯৭	৯০৩	১৩৪৯			
২২৩৪	৪। সার্জেণ্ট, হেড্ কনষ্টেবল	২,১৯১	২৩৫৭	১৭০৪		৩৩৫৫	৩৪৮৭
	৫। সোয়ার পুলিশ					৪৮	৪৮
২৫,০০০	৬। কনষ্টেবল	২০,১৭০	১৮,১২২	২০,৫৫২		২৩,৯৩৭	২৪৪০৬
					মোট	২৯,৭৪৮	৩০৩৫৩
	৭। পুলিশ বিভাগের খরচ	৩৬,৬০,০০০	৪০,৮০,০০০	৫১,৭০,০০০	১,৮৫,২৭,০০০	২,১০,১৫,০০০	৩,৭৩,০০০
	৮। পুলিশের বন্দুকের সংখ্যা					৯৮৪৬	৯৮৯০
	৯। „ রিভলভার „					৯৮৭	১৩৪৯
	১০। মিলিটারী পুলিশ					৮৪৩	৮৪৩
	১১। „ „ খরচ					৪,৩৪,২০৭	৪,৫৯,০৩৮

* ১৮৭১ সালে আসামে পৃথক্ পুলিশ হয়; ১৮৭৪ সালে পৃথক্ প্রদেশ হয়।

কলিকাতার পুলিশ বিভাগ

	১৯০১	১৯৩১
১। পুলিশ কমিশনর ও অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার	১+১	১+৮
২। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট	৮	+১০
৩। ইন্সপেক্টর, সাব্-ইন্সপেক্টর ও য়ুরোপীয় কনষ্টেবল	৫৫ ৭৪	২৮২
৪। সার্জেণ্ট, হেড কনষ্টেবল	২৯১	৮০১
৫। সোয়ার পুলিশ	...	৪৮
৬। কনষ্টেবল, জলপুলিশ	২৪৮৪ ১৩০	৪৬০৬
মোট	৩০৪৪	৫৬০৬
৭। পুলিশের খরচ	৮,৬৬,০০০৲	৪৪,৯০,০০০৲

ত্রিশ বৎসরে ৩৬ লক্ষ টাকার উপর কলিকাতা পুলিশের খরচ বাড়িয়াছে অর্থাৎ ৪৫০% বা ৪½ গুণ বাড়িয়াছে।

বাঙলার পুলিশের খরচ

	১৯৩০-৩১	১৯৩২-৩৩
প্রেসিডেন্সী পুলিশ	৪৪,৯০,৫৭৫৲	৪৩,৬১,০০০
স্থপারিণ্টেণ্ডেন্স বা অধ্যক্ষতা	৩,৬০,৫৩২৲	৩,১৯,০০০
ডিষ্ট্রীক্ট একৃজিকিউটিব ফোর্স	১,৪১,৭৭,৩২৮৲	১,৪১,৬৭,০০০
পুলিশ ট্রেনিং স্কুল	২,৩০,৭৩৬৲	১,৯৭,০০০
স্পেশাল পুলিশ	৬,০৪,৮৮৬৲	৫,৩৫,০০০
রেলওয়ে পুলিশ	৭,৯৬,০৬১৲	৮,২৫,০০০
সি. আই. ডি.	১৩,১০,১১৬৲	১৪,৫৬,০০০
পূর্তকার্য্য	১,১৩,৭০২৲	৮৩,০০০
	২,২০,৮৩,৯৩৬৲	২,১৯,৪৮,০৯৮৲
ইংল্যণ্ডে খরচ	৪,০৫,১৫৭৲	৪,০৮,৯৩৭৲
	৫,১৬১	—১২১৭
	২,২৪,৯৪,২৫৪৲	২,২৩,৫৫,৮১৮৲
চৌকিদার ও দফাদার (য়ুনিয়ন বোর্ডের খরচ: বাঙলার বাজেট অন্তর্গত নহে)		৬৫,৯৫,৭৯০৲
সমগ্র বাঙলায় পুলিশ ও চৌকিদারিতে খরচ		২,৮৯,৫১,৬০৮৲
নিখিল ভারতের খরচ	১৩,৫৬,৬১,৪২৭৲	১২,৮৯,০৪,৯০০৲

	বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যা	নিখিল ভারত
১৮৮১	৩৬,৬০,০০০	
১৮৯১	৪০,৮০,০০০	
১৯০১	৫১,৭০,০০০	
১৯০৫	৬৫,৭২,০০০	

	বাঙলা, বিহার-উড়িষ্যা	নিখিল ভারত
১৯০৮-০৯	৮০,২৬,০০০	
১৯০৯-১০	৮১,৫৮,০০০	
১৯১০-১১	৮৩,১৭,০০০	
১৯১১-১২	৮৭,০৮,০০০	৬·৯০ কোটি
১৯১২-১৩	৮৩,৬০,০০০	৬·৯৮ ,,
১৯১৩-১৪	৯৪,৭১,০০০	৭·২০ ,,
১৯১৪-১৫	১,০৩,৯৬,০০০	৭·৮৫ ,,
১৯১৫-১৬	১,০৯,০৪,০০০	৮·০৩ ,,
১৯১৬-১৭	১,১৬,৩৯,০০০	৮·১৩ ,,
১৯১৭-১৮	১,২৬,১৩,০০০	৮·৪২ ,,
১৯১৮-১৯	১,৩২,২৫,০০০	৯·১৬ ,,
১৯১৯-২০	১,৪৩,৫২,০০০	১০·২৭ ,,
১৯২০-২১	১,৬৫,৪৭,০০০	১২·০২ ,,
১৯২১-২২	১,৯০,৯৮,০০০	
১৯২২-২৩	১,৮৫,২৪,০০০	১২·৬১ ,,
১৯২৩-২৪	১,৭৬,৯১,০০	১২·০২ ,,
১৯২৪-২৫	১,৭৯,৪৩,০০০	১২·১৫ ,,
১৯২৫-২৬	১,৭৯,৪৪,০০০	১২·১৫ ,,
১৯২৬-২৭	১,৮৭,৪২,০০০	১২·৪০ ,,
১৯২৭-২৮	১,৮৫,[illegible]৫,০০০	১২·৫৫ ,,
১৯২৮-২৯	১,৯৫,৮৯,০০০	১২·৩০ ,,
১৯২৯-৩০	২,০৯,১৬,০০০	১৩·১০ ,,
১৯৩০-৩১	২,২০,৮৯,০০০	১৩·৫৮ ,,
১৯৩১-৩২	২,২০,৯৫,০০০	১৩·৪৫ ,,
১৯৩২-৩৩	২,১৯,০২,০০০	১২·৯০ ,,

কুড়ি বৎসর পূর্বে নিখিল ভারতের পুলিশের জন্য যাহা ব্যয়িত হইত, তাহার অষ্টম ভাগ হইত বাঙলায় ; ১৯৩২ সালে তাহা হইয়াছে এক ষষ্ঠাংশ।

পুলিশ থানার সংখ্যা

	১৮৭২	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
বৃটীশ বাংলা	৩৪৭	৩৬৫	৩৭৫	৩৭৮	৩৮৫	৬৫২	৬১৯
বর্ধমান বিভাগ	৭০	৮২	৮২	৮৬	৮৬	১৩৮	১২৩
প্রেসিডেন্সী বিভাগ	১১১	১০৬	১১০	১০৭	১০৪	১৪৩	১৩০
রাজশাহী বিভাগ	৭৮	৮৩	৮৪	৮৭	৮৬	১৬৩	১৫৭
ঢাকা বিভাগ	৫৫	৫৬	৬০	৬১	৭৩	১৪৩	১৪৩
চট্টগ্রাম বিভাগ	৩৩	৩৮	৩৯	৩৭	৩৬	৬৫	৬৬
কুচবিহার	৬	৬	৬	৬	৬	৭	৮
ত্রিপুরা	...	৩	৩	৬	৮	১২	৯

পরিশিষ্ট

বাঙলার শাসন-দায়িত্ব

বাঙলার অভ্যন্তরস্থিত ভারতের কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের অধীন

১। সৈন্য বিভাগ

২। রেলওয়ে

৩। পোষ্টাপিষ, টেলিগ্রাফ, বেতার

৪। জলসেচন ও পয়ঃপ্রণালীখনন

৫। ঋণগ্রহণ ও শোধ

৬। টাকশাল, কারেন্সী

৭। সাধারণ শাসন বিভাগ

৮। শুল্ক (আমদানী, রপ্তানী)

৯। আয়কর

১০। লবণ

১১। আফিম

১২। করদ-রাজকর

১৩। বিবিধ

বাঙলার লাট ও অধ্যক্ষ-সভার হস্তে (রিজার্ভড্) রক্ষিত বিষয়সমূহ

১। শিক্ষা, য়ুরোপীয় ও ইঙ্গ-ভারতীয়দের

২। পূর্ত বিভাগ—

(ক) কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের ব্যবহৃত ইমারত, কাছারি, জেল, বড় বড় পুল ইত্যাদি,

(খ) রোড বোর্ডের অন্তর্গত রাস্তা

(গ) প্রাচীন কীর্তিরক্ষা

(ঘ) প্রাদেশিক রেলপথ

৩। জলসরবরাহ, খাল, পয়ঃপ্রণালী, ড্রেন, বাঁধ

৪। রাজস্ব বিভাগ—

(ক) রাজস্ব নির্ধারণ

(খ) জমিজমার রেকর্ড, সার্ভে, খতিয়ান

(গ) জমি সম্বন্ধে আইন, জমিদার ও রায়তের সম্বন্ধ

(ঘ) কোর্ট অব্ ওয়ার্ড

(ঙ) কৃষি ঋণ

(চ) নূতন জমিতে উপনিবেশ

(ছ) খাসমহল

৫। দুর্ভিক্ষ নিবারণ

৬। ল্যাণ্ড্ একুয়্যিজিশন (Land Acquisition)

৭। বিচার বিভাগ

৮। প্রাদেশিক আইন সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রকাশ

৯। এড্মিনিষ্ট্রেটর জেনারেল ও অফিশিয়াল ট্রাষ্টি

১০। নন্-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্প

১১। খনি—(ইহা ভারত সচিবের অনুমতি সাপেক্ষ)

১২। ফাক্টরী, শ্রম সম্বন্ধে বিবাদ, ইলেকট্রিসিটি, বয়লার, গ্যাস, ধোঁয়া, শ্রমিকদের উন্নতি, ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল বীমা

১৩। ষ্টোর্স, ষ্টেশনারী

১৪। বন্দর

১৫। আভ্যন্তরীণ জলপথ ও জলযান

১৬। পুলিশ

১৭। বিবিধ—

(ক) বাজি ও জুয়া

(খ) জীবের প্রতি নিষ্ঠুরতা

(গ) বন্য পক্ষী ও প্রাণী রক্ষা

(ঘ) বিষ

(ঙ) মোটর যান

(চ) থিয়েটার, সিনেমা

১৮। মুদ্রাযন্ত্র, সংবাদপত্র, গ্রন্থ

১৯। করোনার

২০। ক্রিমিনাল জাতি

২১। য়ুরোপীয় ভিক্ষুক

২২। বন্দীশালা ও রিফর্মেটারী

২৩। গুপ্তধন

২৪। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, ম্যুজিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল; যুদ্ধ মেমোরিয়াল

২৫। সরকারী ছাপাখানা

২৬। ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচন-ব্যবস্থা

২৮। মেডিকেল ও অন্যান্য বৃত্তি বা পেশা

২৯। লোকাল ফাণ্ড অডিট্

৩০। সরকারী চাকুরীর নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থা

৩১। প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের প্রাপ্য রাজস্ব ছাড়া অন্য রাজস্বের ব্যবস্থা

৩২। প্রদেশের জন্য ঋণ গ্রহণ

৩৩। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনানুসারে কোনো জরিমানা আদায় বা শাস্তিদানের ব্যবস্থা

৩৪। নিখিল ভারতের কাজ, (সপার্ষদ বড়লাটের আদেশে প্রাদেশিক শাসনের উপর ন্যস্ত) যথা,—সেন্সাস, গেজেটিয়ার, ষ্ট্যাটিস্‌টিকস্ ইত্যাদি সঙ্কলন।

বাঙলার মন্ত্রীদের হস্তে (ট্রান্সফার্ড) অর্পিত বিষয়সমূহ

১। স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন

২। চিকিৎসা বিভাগ—হাসপাতাল, আতুরাশ্রম ও চিকিৎসাশিক্ষা

৩। স্বাস্থ্য (Public Health & Vital Statistics)—সংক্রামক ব্যাধি সম্বন্ধে নিয়মাবলী ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক পরিগৃহীত আইনানুসারে গঠিত হয়।

৪। বৃটিশ ভারতের মধ্যে তীর্থযাত্রীদের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থা

৫। শিক্ষা (য়ুরোপীয় ও ইঙ্গ-ভারতীয়দের শিক্ষা ব্যতীত।

৬। পূর্ত বিভাগ—

(ক) প্রাদেশিক শাসনের অন্তর্গত গৃহাদি

(খ) প্রদেশের রাস্তাঘাট

৭। কৃষি বিভাগ

৮। পশু চিকিৎসা বিভাগ

৯। মৎস্য বিভাগ

১০। সমবায়

১১। ধন বিভাগ

১২। আবগারী

১৩। রেজিষ্ট্রেশন

১৪। ধর্ম বিষয়ক ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান

১৫। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ রেজিষ্টারী

১৬। শিল্প ও শিল্পোন্নতি

১৭। ষ্টোর্স, ষ্টেশনারী

১৮। ভেজাল খাদ্য

১৯। ওজন ও মাপ

২০। লাইব্রেরী, ম্যুজিয়াম, চিড়িয়াখানা

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

পূর্ত বিভাগ

ভারতবর্ষের সরকারী পূর্ত বিভাগের উৎপত্তির ইতিহাস বৃটীশ শক্তির মিলিটারী ইতিহাসের সহিত যুক্ত। কোম্পানীর রাজ্য ও শক্তি বৃদ্ধির সহিত সৈন্যদের জন্য বারাক্, গতিবিধির জন্য সামরিক পথ ও সেতু প্রভৃতি নির্মাণের জন্য ১৮৪৯ অব্দে একটি মিলিটারী বোর্ড গঠিত হয়। পরে ১৮৫৪ সালে লর্ড ডালহৌসির সময় বাঙলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি পূর্ত বিভাগ খোলা হইল। এই সালে বাঙলাদেশে একজন ছোটলাট নিযুক্ত হন।

এই পূর্ত বিভাগের কাজ ছিল (ক) সরকারী ইমারত নির্মাণ, (খ) পথ-ঘাট-সেতু নির্মাণ, (গ) পয়ঃপ্রণালী খনন, (ঘ) সামরিক বিভাগের নির্মাণ কার্য করা। প্রথম দিকে বিলাতী কোম্পানী রেলওয়ে তৈয়ারী করিত বলিয়া এই বিভাগের উপর সে কার্য ছিল না; কিন্তু অল্প পরেই গবর্মেণ্ট স্বয়ং যখন রেলপথ নির্মাণ করিতে লাগিলেন, তখন এই কার্য তদারক করিবার ভার পড়িল পূর্ত বিভাগের উপর। সে-সময়ে প্রত্যেক প্রদেশে একজন করিয়া চীফ ইঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত হন।

১৮৬৩-৭২ সালের মধ্যে সমর বিভাগের নির্মাণাদি কার্য পূর্ত বিভাগ হইতে পৃথক করিয়া দেওয়া হয় এবং ১৮৮২ সালের মধ্যে হিসাবপত্র সমস্তই পৃথক্ হইয়া গেল। যে-পূর্ত বিভাগের সৃষ্টি সামরিক কাজ লইয়া, সে এখন হইতে সম্পূর্ণ সিবিল বিভাগে পরিণত হইল।

পূর্ত বিভাগের সহিত রেলওয়ের সম্বন্ধ বহুকাল ছিল, যদিও কাজেকলমে পৃথক্ হইয়াছিল অনেক দিন হইতে। ১৯০৫ সালে রেলওয়ে বোর্ড গঠিত হইলে রেলওয়ে সংক্রান্ত সকল কাজ গবর্ণর-জেনারেলের অধ্যক্ষ-সভার অন্তর্গত হইল। কিন্তু বড় বা ট্রাঙ্ক লাইনের কাজ যাইলেও কতকগুলি ছোট রেলওয়ের ভার এখনো বাঙলাদেশে পূর্ত বিভাগের উপর অর্পিত আছে। এই বৎসর টেলিগ্রাম লাইন তৈয়ারীর কাজও বড়লাটের অধ্যক্ষ-সভার

বাণিজ্য বিভাগের সদস্যের হাতে যায়। সুতরাং এই সময় হইতে পূর্ত্তবিভাগ সম্পূর্ণরূপে প্রাদেশিক হইল বলা যাইতে পারে।

মণ্ট-ফোর্ড শাসনসংস্কার প্রবর্তিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত বাঙলার পূর্ত্তবিভাগের উপর নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অর্পিত ছিল, যথা—পথ, সরকারী ইমারত, খাল, জলসেচন, ম্যারাইন (marine), রেলওয়ে এবং বিবিধ পাবলিক কাজ। তখন এই বিভাগ গবর্ণরের অধ্যক্ষ-সভার একজন সদস্যের তত্ত্বাবধানে থাকিত। নূতন শাসন সংস্কারের পর ম্যারাইন্ কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের অন্তর্গত কমার্স বা বাণিজ্য বিভাগের অধীন হইয়াছে, ইহা আদৌ প্রাদেশিক বিষয়ই থাকিল না। অপর বিষয়গুলির কয়েকটি গিয়াছে রিজার্ভ বিষয়ের মধ্যে, সুতরাং অধ্যক্ষ-সভার সদস্যদের হাতে; আর কতকগুলি হইয়াছে 'অর্পিত' বিষয়ের অন্তর্গত; সুতরাং আসিয়াছে দেশীয় মন্ত্রীদের হাতে। এই সময়ে আর একটি পরিবর্তন সাধিত হয়; 'জলসেচন' বিভাগকে ১৯২১ সনের ১লা ডিসেম্বর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বিভাগে পরিণত করা হইল।

জলসেচন বিভাগকে পৃথক্ করিয়া দিবার পূর্বে পূর্ত্তবিভাগের দুইটি শাখা ছিল (১) পথ ও ইমারত এবং (২) জলসেচন। দুই শাখার দুইজন চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার গবর্মেণ্টের সেক্রেটারীর কাজ করিতেন। *

১৯২১ সালে পূর্ত্তবিভাগ নূতনভাবে গঠিত হইলে নিম্নলিখিত কর্মচারী নিযুক্ত হন; যথা—চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার, ইনি গবর্মেণ্টের সেক্রেটারী। ২ জন সহকারী; ৪ জন সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার; এ ছাড়া নিম্নতন কর্মচারী। এ ছাড়া গবর্মেণ্টের একজন 'আর্কিটেক্ট' বা স্থাপত্য শিল্পী আছেন; ইঁহার পদ ১৯০৯ সাল হইতে হইয়াছে। এই শিল্পী, তাঁহার দুইজন সহকারী, একজন ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনীয়ার, একজন ইলেকৃট্রেশিয়ান, প্লাম্বিং-এক্সপার্ট ও একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লাটসাহেবের বাড়ীঘর প্রভৃতি দেখিবার জন্য নিযুক্ত আছেন।

বাঙলাদেশের পূর্ত্তবিভাগের জেলা বা মণ্ডল ভাগ রাজনৈতিক ভাগ বিভাগ

* পূর্ত্ত বিভাগ ও জলসেচন বিভাগের জন্য চীফ ইঞ্জিনীয়ার ২, আণ্ডারসেক্রেটারী ২, সহকারী ১, সুপার ইঞ্জিনীয়ার ৫, এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার ও সহকারী ৩৩। সহকারী ইঞ্জিনীয়ার ৬৫, আপার ও লোয়ার সাবঅডিনেট সার্বিস ২২৬।

হইতে পৃথক্। বাঙলায় চারিটি মণ্ডল বা সার্কেল আছে; এই সার্কেলগুলি এক একজন সুপারেণ্টেণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনীয়ারের অধীন, যথা—

(১) প্রেসিডেন্সী সার্কেল—কলিকাতা, হাওড়া ও ২৪ পরগণা।

(২) নর্দার্ন সার্কেল—দার্জিলিং, রাজশাহী, জলপাইগুড়ি, ডুয়ার্স রোড বিভাগ রাজশাহী কমিশনারের অধীন কাজকর্ম।

(৩) ইষ্টার্ন সার্কেল—ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোহর এবং খুলনা।

(৪) সেণ্ট্রাল সার্কেল—বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগ (খুলনা ও যশোহর ব্যতীত)।

পূর্ত বিভাগের চাকুরী দুই শ্রেণীর; উচ্চতম পদগুলি নিখিল ভারতীয়; পূর্বে ইংল্যাণ্ডের কুপার হিল কলেজ হইতে পাশ করিলে এই চাকুরীতে ভর্তি হওয়া যাইত। ১৯০৬ হইতে সে-কলেজ উঠিয়া যায়। তখন হইতে ভারত সচিব কর্তৃক মনোনীত সুদক্ষ ছাত্রদের জন্য ইহা উন্মুক্ত হয়। অন্যান্য চাকুরী রুর্‌কী ও শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের কৃতি ছাত্রদের দেওয়া হইত। এইসব চাকুরী 'আপার' ও 'লোয়ার' সাব্‌অর্ডিনেট্ সার্বিসে বিভক্ত ছিল। ১৯১৯-২০ সালে ইহা বদলাইয়া যথাক্রমে প্রবিন্সিয়েল ইঞ্জিনীয়ারিং ও সাব্‌অর্ডিনেট্ ইঞ্জিনীয়ারিং সার্বিস্ করা হয়।

বর্তমানে পূর্তবিভাগের উপর নিম্নলিখিত কাজগুলি ন্যস্ত আছে—

১। সরকারী ইমারত নির্মাণ ও মেরামত

(ক) কেন্দ্রীয় সরকারের বাড়ীঘর, যেমন পোষ্টাফিষ, টাকশাল, কলিকাতার দপ্তরখানা, যাদুঘর, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী প্রভৃতি।

(খ) প্রাদেশিক—'রিজার্ভ' বিষয়ের অন্তর্গত ইমারত ও কাজকর্ম।

(গ) প্রাদেশিক 'অর্পিত' বিষয়ের অন্তর্গত যেমন সরকারী স্কুল, কলেজ ইত্যাদি।

২। পথঘাট

(ক) প্রাদেশিক রাস্তাঘাট। ইহার অনেকগুলি জেলাবোর্ডের উপর ন্যস্ত।

(খ) প্রাদেশিক রোড—যেগুলি কেন্দ্রীয় রোড-বোর্ড নির্মাণের জন্য অর্থ দেন।

৩। রেলওয়ে—কয়েকটি লাইট্ রেলপথ।

পূর্ত বিভাগের আয়-ব্যয়

(হাজার টাকা)

	কেন্দ্রীয় আয়	কেন্দ্রীয় ব্যয়	প্রাদেশিক আয়	প্রাদেশিক ব্যয়
১৯১২-১৩	৬৪	১৬,৬৬	৫,২৬	৮৯,৯৫
১৯২১-২২	১,৪৯	১০,১৮	৬,৯৬	১,৪৯,৫৫
১৯২৫-২৬	১,০৯	১১,১০	৫,২৮	১,১০,৩৬
১৯৩১-৩২	২,৮৬	৭,৬৩	১৭,৩৬	৮৮,৪৪
১৯৩২-৩৩	১,০৯	৭,১১	১৫,৭৬	৭৬,২৬

১৯২১ সালের শেষদিকে 'জলসেচন' বিভাগ পূর্ত বিভাগ হইতে পৃথক্ করিয়া গঠিত হয়। এই বিভাগের কর্তা বা চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার গবর্মেণ্টের এই বিভাগের সেক্রেটারীর কাজ করেন। তাঁহার দুইজন সহকারী আছেন; তাছাড়া ২ জন সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার, ১৮ এক্‌জিকিউটিব ও এসিস্‌টেণ্ট এক্‌জি-কিউটিব, ১৩ সহকারী ও ৮৭ জন সাবঅর্ডিনেট আছেন। এই বিভাগে দুইটি সার্কেল আছে—(১) দক্ষিণ-পশ্চিম সার্কেল,—কুশি, দামোদর, নদীয়ার নদী ও মেদিনীপুর।

(২) দক্ষিণ সার্কেল,—খালসমূহ, যশোহর-খুলনার নদীপথ।

বাঙলাদেশ নদীপ্রধান; সে সত্ত্বেও দক্ষিণ বাঙলার নদীপথগুলিকে বালুচর হইতে রক্ষা করিবার জন্য ও এক নদী হইতে অন্য নদীতে যাইবার জন্য খাল করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। সুন্দরবনের খাল, মাদারিপুরের বিলের পথ এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। মেদিনীপুর ও হিজলির খাল প্রায় ১২০ মাইল দীর্ঘ; এই পথ দিয়া নৌকাদি চলিতে পারে; কিয়দংশ জলসেচনের জন্যও ব্যবহৃত হয়। উড়িষ্যার উপকূলে যে খাল আছে, তাহা দিয়া নৌকা যায়। মেদিনীপুর খাল, ইডেন খাল ও বক্রেশ্বর খাল হইতে চাষের সেচ পাওয়া যায়। দামোদর খাল হইতে গত দুই বৎসর জলসেচ চলিতেছে।

বাঙলাদেশের পয়ঃপ্রণালী ও জলসেচন বিভাগের আয়-ব্যয়

	১৯১২-১৩ পর্যন্ত	১৯২১-২২ পর্যন্ত	১৯৩২-৩৩ পর্যন্ত
প্রধান জলসেচন প্রণালী	১,১১,০৮,৪৩১		
অপ্রধান পয়ঃপ্রণালী	১,১৫,৮৩,৬১৭		
মোট	২,২৬,৯২,০৪৮	৩,২৩,৪০,৯৮৮	৫,২০,৭০,০৩৯

আয়-ব্যয়

	আয়	ব্যয়	রাজস্ব
১৯২১-২২	১০,৮১,৮৩০	১৪,৩২,৩০৯	—৩,৫০,৪৭৯
১৯৩২-৩৩	৮,৪৬,২৬০	১৩,০৫,৯৪৯	— ৪,৫৯,৬৮৯

জলসেচন

তিন বৎসরের গড়	মেদিনীপুর খাল একার	এডেন খাল একার	বক্রেশ্বর খাল একার
১৯৩২	৫০,২৩৮	২০,৪৪২	...
১৯৩২-৩৩	২৮,১৩৬	১৮,৫৭৭	৫,৮৬১

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন

ইংরেজ শাসনের প্রথমদিকে শাসনতন্ত্রকে কেন্দ্রীভূত করিবার দিকেই শাসকদের ঝোঁক ছিল বেশী। দেশীয় লোকের কর্মশক্তি ও সততার উপর ইংরেজ শাসকদের আদৌ শ্রদ্ধা ছিল না; অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে, অত্যন্ত ধীরে ধীরে তাঁহারা দায়িত্বপূর্ণ কার্য দিতেন। ফলে কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক ও বিচার শাসন বিভাগের উপর অযথা চাপ পড়িত ও দেশের মধ্যে যে সহজ শাসন ও বিচার পদ্ধতি, সামাজিক শাসন ছিল, তাহা সরকারী কর্মচারীদের অতিরিক্ত মধ্যবর্তিতায় নষ্ট হইয়া গেল; অথচ গ্রামের পঞ্চায়েৎ বা স্বাভাবিক শাসনবিধির পরিবর্তে যে বিচার ও শাসনবিধি প্রবর্তন করিলেন, তাহা না হইল সুলভ, না হইল সরল।

বাঙলার প্রতি একশ' জন লোকের মধ্যে ৭ জন মাত্র শহরের বাসিন্দা, অবশিষ্ট ৯৩ জন গ্রামের লোক। গ্রামের সংখ্যা প্রায় ৮৫,০০০; শহরের সংখ্যা ১১৩; ম্যুন্সিপালিটির সংখ্যা ১১৭ মাত্র। সুতরাং শহরে বসিয়া শাসন কার্য সুচারুরূপে চলিতে পারে না—একথা শাসকরা একদিন বুঝিলেন।

১৮৫৬ সালের পূর্ব্বে কলিকাতা ছাড়া আর কোনো শহর ম্যুন্সিপালিটি ছিল না। ১৮৭১ সালে লর্ড মেয়ো প্রাদেশিক শাসনবিভাগগুলিকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে স্বাধীনতা দান করিলে মফঃস্বলে ম্যুন্সিপালিটি প্রসার লাভের সুযোগ পায়। কিন্তু প্রকৃতি পক্ষে এই ম্যুন্সিপালিটি কাজ নূতন আদর্শের উপর গঠিত হয় লর্ড রীপনের সময়ে। তিনি বলিলেন, স্বায়ত্বশাসনের পূর্ব্বে স্থানীয় স্বায়ত্ব-শাসন অধিকার পাওয়া দরকার।

লর্ড মেয়ো জেলার পূর্তকার্য, মেরামতিকাজ, রাস্তাঘাট, সেতু নির্মাণ ও সংরক্ষণ প্রভৃতি কার্য তদ্বির করিবার জন্য 'ডিষ্ট্রিক্ট কমিটি' গঠন করেন; জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারী ইহার সভ্য; দুই চার জন বে-সরকারী লোককেও এই সভায় সরকার মনোনীত করিতেন। শিক্ষা

বিষয়ে তদারক করিবার জন্য একটি করিয়া কমিটি জেলায় জেলায় এই সময়ে গঠিত হয়। পূর্তকার্য ও শিক্ষাদিবিষয়ে ব্যয়নির্বাহের জন্য ১৮৭০ সালে রোড্ সেস্ বা পথকর আইন পাশ হয়। এই বৎসর চৌকিদারী ট্যাক্স ও পঞ্চায়েৎ প্রথা গ্রামে প্রবর্তিত হয়।

১৮৮৫ সালে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন এক্ট অনুযায়ী জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড ও য়ুনিয়ন কমিটি এই তিন শ্রেণীর সভা গঠিত হয়।

এই আইনানুসারে বাঙলার প্রত্যেক জেলায় 'জেলা বোর্ড', মহাকুমাগুলিতে 'লোকাল বোর্ড' এবং আরও ছোট এলাকায় কতকগুলি 'য়ুনিয়ন কমিটি' সৃষ্টি করা হয়। য়ুনিয়ন কমিটি বহুকাল বিশেষ কোনো কাজের হয় নাই; কারণ, গ্রামের পঞ্চায়েৎ-এর চৌকিদারী ট্যাক্স ধার্য করিবার ক্ষমতা থাকায় তাহারাই গ্রামে প্রবল ছিল।

১৯০৮ সালে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন আইনের কিছু কিছু পরিবর্তন হয়। বিভাগীয় কমিশনরগণের উপর জেলা বোর্ডের তত্ত্বাবধানের ভার পড়ে। শিক্ষার জন্য একটি সহায়ক কমিটি গঠিত করিবার অনুমতি দান ও ব্যয় বিষয়ে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া হয়। চিকিৎসা বিষয়েও অধিকতর দায়িত্ব অর্পিত হয়। য়ুনিয়ন কমিটিগুলিকে লোকাল বোর্ডের হাত হইতে লইয়া জেলা বোর্ডের অধীন করিয়া দেওয়া হইল। এই সময়ে ১৮৫টি য়ুনিয়ন কমিটি বাঙলায় গঠিত হয়।

১৯১৪ সালে গবর্মেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত 'ডিষ্ট্রিক্ট শাসন কমিটি' স্বায়ত্ত শাসন বিষয়ে অধিকতর শক্তি দিবার জন্য সুপারিশ করিলেন; গবর্মেণ্ট কর্মচারীদের অতিরিক্ত মধ্যস্থতা হ্রাস করিবার জন্য, য়ুনিয়ন কমিটি ও পঞ্চায়েৎ প্রথা উঠাইয়া য়ুনিয়ন বোর্ড বা গ্রাম-সমবায় প্রথা প্রবর্তনের জন্য বলিলেন।

১৯১৯ সালে বাঙলা গবর্মেণ্ট স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন সম্বন্ধে পুনরায় আইন পাশ করিলেন। ইতিপূর্বে জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হইতেন সরকারী লোক। এই আইন বলে এখন হইতে বেসরকারী সভাপতি নির্বাচন করিবার অধিকার অর্পিত হইল। ১৯২১ সাল হইতে বাঙলার নূতন শাসন সংস্কারবিধি কার্যকরী হয়; সেই সময় স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগ দেশীয় মন্ত্রীর হস্তে ন্যস্ত

হয় বা হস্তান্তরিত বিষয়ের অন্তর্গত করা হয়, জেলা বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্য-পরিসর বৃদ্ধি পায়; সরকারী কর্মচারীদের তদারক ও খুঁটিনাটি লইয়া বোর্ডকে উত্যক্ত করিবার সুযোগ হ্রাস করা হয়। বোর্ডের বেসরকারী সদস্য-সংখ্যার প্রভুত্ব গবর্মেণ্ট স্বীকার করিয়া লইলেন।

বাঙলাদেশে ২৬টি জেলায় জেলা বোর্ড আছে; এইসব জেলা বোর্ডে আয়তন ও জন-সংখ্যার অনুপাতে ৯০ হইতে ৩২ জন সদস্য আছেন। ছাব্বিশটি বোর্ডের সদস্য-সংখ্যা ৬৮৩ জন; ইহার মধ্যে ১৪৬ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত এবং তাঁহাদের মধ্যে ১০৮ জন মাত্র সরকারী কর্মচারী; নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা ৪২৯। নূতন আইন পাশ হইবার পূর্বে ১৯১১-১২ সালে ৫০৯ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ২০৯ জন নির্বাচিত ছিলেন।

লোকাল বোর্ডের সংখ্যা ৮৪; ইহার মোট সদস্য-সংখ্যা ১৩৫৮; ইহার মধ্যে নির্বাচিত সদস্য ৮৭৪ জন; ৪২৭ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত; এই মনোনীতদের মধ্যে মাত্র ৮৪ জন সরকারী কর্মচারী।

য়ুনিয়ন কমিটি প্রায় উঠিয়া গিয়াছে; ১৯৩২-৩৩ সালে মাত্র ১২টি কমিটি ছিল। ১৯৩১-৩২ সালে য়ুনিয়ন বোর্ডের সংখ্যা ৪৫৬৯; ইহার সদস্য-সংখ্যা ৪০,৭৪১ জন; ইহার মধ্যে মনোনীত সদস্যের সংখ্যা ১৩,৮০৯; সরকারী সদস্য মাত্র ৭ জন। ১৯২১ সালের শেষে বাঙলাদেশে ১৬০০ য়ুনিয়ন বোর্ড ছিল। বাঙলাদেশে মেদিনীপুর ছাড়া সকল জেলাতেই য়ুনিয়ন বোর্ড আছে। মেদিনীপুরের লোকেরা য়ুনিয়ন বোর্ড চাহে না।

উপরিউক্ত সংখ্যা হইতে বুঝা যাইতেছে, গবর্মেণ্ট সত্যসত্যই জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড ও য়ুনিয়ন বোর্ডকে স্বাধীনতা দান করিয়াছেন। তবে সাধারণভাবে জেলা বোর্ডের সকল বিষয় তদারক ও পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আছে। লোকাল বোর্ডগুলিকে দেখিবার অধিকার মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের; এবং য়ুনিয়ন বোর্ডগুলি এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে সার্কেল অফিসারদের দ্বারা চালিত হয়।

২৬টি জেলা বোর্ডের ২৬ জন চেয়ারম্যান বা সভাপতির মধ্যে ২২ জন নির্বাচিত; লোকাল বোর্ডের ৮৪ জন চেয়ারম্যানের মধ্যে ৭৬ জন নির্বাচিত। য়ুনিয়ন বোর্ডের সভাপতিদের ৪১১৯ জন নির্বাচিত বেসরকারী লোক।

৪০৬ জন মনোনীত বেসরকারী, ২৯ জন নির্বাচিত সরকারী ও ৮ জন মাত্র মনোনীত সরকারী সভাপতি।

কিভাবে এইসব বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত ও মনোনীত হয়, তাহা এখন দেখা যাক। প্রথমে প্রত্যেক মহকুমার ভোটারদের একটি তালিকা করা হয়; যে ব্যক্তি বৎসরে অন্তত ১৲ রোড সেস্ বা আয়কর দেয় বা যাহার আয় ২০৲ টাকার কম নহে, সেই ভোট দিতে পারে; এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বা মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যেকোনো ব্যক্তি, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার সকলেরই ভোট দিবার অধিকার আছে। য়ুনিয়ন বোর্ডের সদস্যেরাও ভোটার। প্রত্যেক মহকুমার এই ভোটারগণ প্রতি তিন বৎসর অন্তর নির্দিষ্ট সংখ্যক পদপ্রার্থীকে লোকাল বোর্ডের সদস্য নির্বাচন করেন।

লোকাল বোর্ডের সদস্য হইবার জন্য বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন; অর্থাৎ যিনি অন্তত ৫৲ টাকা পথকর দেন বা এক সহস্র টাকা আয় যাঁহার আছে, তিনিই মাত্র এই পদপ্রার্থী হইতে পারেন। সুতরাং সদস্য হইবার যোগ্যতা সম্পূর্ণ ধনের উপর নির্ভর করে। নির্দিষ্ট দিনে কোনো সরকারী কর্মচারী বা শিক্ষিত ভদ্রলোক নির্বাচন-কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া ভোটারদের মত লিপিবদ্ধ করেন; যাঁহার অনুকূলে অধিক সংখ্যক ভোট হয়, তিনি লোকাল বোর্ডের সদস্য হইলেন। এইরূপে যে কয়টি মহকুমা আছে প্রত্যেকটি হইতে 'লোকাল বোর্ড' গঠিত হয়; যে জেলায় মহকুমা নাই যেমন মালদহ, পাবনা সেখানে এইভাবে জেলা বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হয়।

লোকাল বোর্ডের সদস্যেরা সদরে আসিয়া মিলিত হন; ইতিমধ্যে লোকাল বোর্ডের জন্য গবর্মেণ্ট কর্তৃক মনোনীত সদস্যগণ উপস্থিত হইয়াছেন। গবর্মেণ্ট কর্তৃক মনোনীত সদস্যদের মধ্যে যাঁহারা বেসরকারী তাঁহারা ও লোকাল বোর্ডের নির্বাচিত সদস্যেরা মিলিত হইয়া ভোটের দ্বারা 'জেলা বোর্ডের' সদস্যমণ্ডলী ও চেয়ারম্যান স্থির করেন। এইভাবে জেলা বোর্ড গঠিত হইল। বর্তমানে লোকাল বোর্ডের কাজ মাত্র এই দাঁড়াইয়াছে; অধিকাংশ কাজ জেলা বোর্ড ও য়ুনিয়ন বোর্ড এখন ভাগ করিয়া লইয়াছে। জেলা বোর্ডের সদস্যগণ বা সভাপতি এখন পর্যন্ত পরোক্ষভাবেই নির্বাচিত

হইতেছেন বলা যাইতে পারে। প্রত্যক্ষ নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হয় নাই।

বাঙলাদেশের সমস্ত জেলা বোর্ডের আয় বার্ষিক প্রায় ১½ কোটি টাকা, মাথাপিছু ।৮ পাই হিসাবে কর পড়ে। এই আয় কিভাবে জেলা বোর্ডের হয়, তাহা দেখা যাক্।

জেলা বোর্ডের প্রধান আয় হইতেছে 'সেস্'; জমিদার ও প্রজা উভয়ে মিলিয়া টাকায় আনা করিয়া দেন। রাজস্ব দিবার সময় জমিদারকে এই 'সেস্'ও কলেক্টরীতে জমা দিতে হয়। ১৮৭০ সালে উহা প্রবর্তিত হয় এবং সেই হইতে ১৯১২ সাল পর্যন্ত সেস্ হইতে যে আয় হয়, তাহার অর্ধেক বাঙলা গবর্মেণ্ট লইতেন, অপরার্ধ জেলা বোর্ডকে দিতেন। ১৯১৩ সাল হইতে সেসের সবটাকাই জেলা বোর্ডকে অর্পণ করা হইতেছে; ইহাতে বোর্ডের আয় ৩০ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছিল। ১৯৩১-৩২ সালে লোকাল সেস্ প্রভৃতি হইতে আয় ছিল ৭৬ লক্ষ টাকা; বিশ বৎসর পূর্বে ছিল মাত্র ২৯ লক্ষ। এই বৃদ্ধির কারণ যে কেবল সরকার তাঁহার অর্ধেক সেস্ ছাড়িয়া দিয়াছেন তাহা নহে; জেলা বোর্ড গবর্মেণ্টের সাহায্যে সেটেলমেণ্টের কাগজপত্র ঘাঁটিয়া যথার্থ দেয় সেস্ আদায় করিতেছেন। বর্তমান আর্থিক দুর্গতি দূর হইলে, আশা করা যায়, সেস্‌খাতেই জেলা বোর্ডের আয় বাড়িবে।

জেলায় পাউণ্ড বা খোঁয়াড় ১৯৩১-৩২ সালে ৩০৬৩টি ছিল। আয় ছিল ১,৭৫ হাজার (খরচা বাদে); ১৯২১-২২ সালে ৪২৩২টি খোঁয়াড়, নেট আয় ছিল ২,৪৭ হাজার। খোঁয়াড় বিক্রয় করিবার অধিকার জেলা বোর্ডের ছিল; এখন য়ুনিয়ন বোর্ডের।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালনা ভার কিয়ৎপরিমাণে বোর্ডের উপর আছে। গবর্মেণ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে সাহায্য করেন; কিন্তু সে সাহায্য প্রত্যক্ষভাবে স্থানীয় অবস্থা বুঝিয়া করা গবর্মেণ্টের পক্ষে অসম্ভব; সেইজন্য বাঙলা গবর্মেণ্ট লাখ ২০ টাকা জেলা বোর্ডগুলির হাতে দেন; বোর্ড সেই ২০ লাখের উপর নিজেরা আরও লাখ ১৫।১৬ প্রতি বৎসর দেন। এছাড়া গবর্মেণ্ট

মেডিকেল বিভাগের জন্য লাখ ১৫ টাকা ও পূর্তকার্যের জন্য লাখ ৭ টাকা দেন; মোট কথা, গবর্মেণ্ট প্রায় ৪২।৪৩ লক্ষ টাকা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পূর্তকাজের জন্য জেলা বোর্ডকে দেন। সমস্ত বৃটীশভারতে জেলা বোর্ডের জনপ্রতি কর ছিল ১৯১২-১৩ সালে ।৬ পাই; ১৯২১-২২ সালে ।৶৬ পাই, ১৯৩০-৩১ সালে ॥৵৫ পাই। বাঙলাদেশে ১৯২১-এ ছিল ।১ পাই, ১৯৩০এ ।১১ পাই।

জেলা বোর্ডের আয় ও ব্যয় কিভাবে বাড়িয়াছে দেখা যাক্—

	আয়	ব্যয়
১৯১১-১২	৬৭,২৯,০০০৲	৬৬,২২,০০০৲
১৯২১-২২	১,১৬,৫০,০০০৲	১,২৩,০০,০০০৲
১৯৩১-৩২	১,৪৮,৩৪,০০০৲	১,৩৯,০৪,০০০৲

জেলা বোর্ডের প্রধান খরচ তাহার পূর্তবিভাগ, অর্থাৎ জেলার পথঘাট, সেতু, জেলা বোর্ডের বাড়ীঘর যেমন ডাকবাংলা, হাসপাতাল প্রভৃতি তৈরী বা মেরামতি কাজ। ইহার পর শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিভাগের ব্যয়। জেলা বোর্ড কিভাবে টাকা ব্যয় করেন, তাহা আমরা পরিশিষ্টে দিয়াছি।

জেলা বোর্ডের পক্ষে সমগ্র জেলার প্রত্যেকটি গ্রামের স্বাস্থ্য, পূর্তকার্য তদারক করা সম্ভব নহে। সেইজন্য গ্রাম-সমাহার বা য়ুনিয়ন বোর্ড গঠিত হইয়াছে। কয়েকটি গ্রাম বা ক্ষুদ্র শহর ও চতুষ্পার্শ্বস্থ কয়েকটি গ্রাম লইয়া এক একটি গ্রাম-সমাহার গঠিত হয়। প্রত্যেক য়ুনিয়ন ৭।৮ ওয়ার্ডে বিভক্ত; য়ুনিয়ন বোর্ড বা পরিচালক-সভা ৭ বা ৯ জন সদস্যের দ্বারা গঠিত হয়। এই সদস্যগণ ভোটারদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। প্রত্যেক ওয়ার্ডের ভোটারগণ নিজ নিজ ওয়ার্ডের কোনো এক পদপ্রার্থীকে নির্বাচন করেন; তিন বৎসর অন্তর বোর্ড পরিবর্তিত হয়, প্রাক্তন সভ্যগণ পদপ্রার্থী হইতে পারেন। য়ুনিয়নের যে-সব লোক বাৎসরিক একটাকা য়ুনিয়ন ট্যাক্স দেয়, সেই ভোট দিবার অধিকারী। য়ুনিয়ন ট্যাক্স একরূপ আয়কর; য়ুনিয়নের মধ্যে যে-কেহ আয় করে বা আয় না করিয়া অন্য স্থান হইতে টাকা আনিয়া ব্যয়ও করে, তাহাকেই তাহার আয়ের শতকরা একটাকা হিসাবে কর দিতে হয়। তবে এই কর ৮৪৲ টাকার বেশি আদায় হইতে পারে

না ; অর্থাৎ য়ুনিয়নের এলাকায় থাকিয়া সে যতই আয় করুক ৮৪৲ টাকার বেশি কর কখনো তাহাকে দিতে হয় না। সর্ব নিম্ন কর ছয় আনা। ইহারা ভোট দিতে পারে না। অতি দরিদ্র কোনো ট্যাক্স দেয় না।

বাঙলাদেশের সমস্ত অংশে এখনো য়ুনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হয় নাই। ১৯৩১-৩২ সালে ৪৫৬৯টি গ্রাম-সমাহার ছিল ; প্রায় ৩½ কোটি লোক এই য়ুনিয়নের মধ্যে এখন বাস করিতেছে। ১৯২১ সালে ১০৮৯টি য়ুনিয়ন বোর্ড ছিল ও ১৮৩টি য়ুনিয়ন কমিটি ছিল। বর্তমানে এই অংশের করদাতার সংখ্যা প্রায় ৫৫ লক্ষ ; কিন্তু ভোট দিবার অধিকার আছে ২৪ লক্ষের মাত্র, অর্থাৎ ৫৫ লক্ষ লোকের মধ্যে ২৪ লক্ষ মাত্র এক টাকার উপর কর দিতে সমর্থ।

৪৫২২টি য়ুনিয়ন বোর্ডের মোট আয় (১৯৩০-৩১) ৮২ লক্ষ টাকা ছিল ; পূর্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত তহবিলের ১৫,১৩,৫০০৲ টাকা লইয়া মোট ৯৭·২৩ লক্ষ। ইহার মধ্যে য়ুনিয়ন ট্যাক্স হইতে ৬০ লক্ষ টাকা, ২,৩৯ হাজার টাকা চৌকিদারী চাকরান হইতে, ২,০৯ হাজার খোঁয়াড় ও ফেরি হইতে এবং গবর্মেণ্ট জেলা বোর্ডের দান হইতে ৮·৩৭ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছিল।

ঐ বৎসরে ব্যয় হয় ৮৫ লক্ষ টাকা ; ইহার মধ্যে ৪৬ লক্ষ বা অর্ধেকের উপর চৌকিদার ও দফাদারের বেতন ও পোষাকের জন্য। ট্যাক্স আদায় ও অপিষের খরচ হয় ১১ লক্ষ টাকা। গ্রামের পথঘাট মেরামত, জল সরবরাহ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি কাজের জন্য ৪৫২২টি য়ুনিয়ন বোর্ডে ২৮ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়। অর্থাৎ জনহিতকর কাজের জন্য গড়ে প্রত্যেক য়ুনিয়ন বৎসরে ৬০৯৲র মত পায়, গড়ে এক একটি গ্রাম বা ওয়ার্ড বৎসরে ৬০৷৬৫৲ পাইয়া থাকে। ইহার দ্বারা পথঘাট মেরামতী, পাঠশালার সাহায্য, পুষ্করিণী সাফ প্রভৃতি কাজ সামান্যই হয়।

বাঙলার প্রত্যেক গ্রামে এক বা একাধিক চৌকিদার আছে ; কয়েকজন চৌকিদারের উপর দফাদার থাকে। ১০০ হইতে ১২০ ঘর লোকের শান্তির জন্য একজন চৌকিদার গড়ে পড়ে। চৌকিদার থানার দারোগার অধীন ; গ্রামে চুরি-ডাকাতি হইলে পুলিশে খবর দেওয়া, মদ চোলাই করিলে অপরাধীর বাড়ী হানা দেওয়া, গ্রামের লোকের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখা ও থানায় খবরাদি দেওয়া তাহার কাজ। এ ছাড়া জন্ম-মৃত্যুর খবর থানায়

তাহাকে দিতে হয়। য়ুনিয়ন বোর্ড যদিও ইহাদের বেতন দেয়, তথাপি তাহাদের উপর কোনো এক্তিয়ার বোর্ডের নাই।

কতকগুলি য়ুনিয়ন বোর্ডের উপর ছোট খাটো বিচারের ভার দেওয়া আছে; ইহাতে ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও মুন্সেফের কাজ একটু লঘু হইয়াছে বলিয়া গবর্মেণ্টের বিশ্বাস। ১৯৩০ সালে য়ুনিয়ন বেঞ্চের সংখ্যা ছিল ৮৮৮, য়ুনিয়ন কোর্টের সংখ্যা ৭৭৬। য়ুনিয়ন বেঞ্চে ফৌজদারী মামলার শুনানী হয়; য়ুনিয়ন কোর্টে দেওয়ানী মামলা। উভয় শ্রেণীর কোর্টে ১,৩১,৭০০ মোকদ্দমা হইয়াছিল। ইহার অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের কুড়িটাকা জরিমানা ও সাতদিন মেয়াদ দিবার ক্ষমতা আছে; অবশ্য ইহার বিরুদ্ধে আপীল হয়। কোনো কোনো সময়ে ম্যাজিষ্ট্রেট্ কোনো মোকদ্দমা য়ুনিয়ন কোর্টের উপর বিচারের জন্য দেন।

য়ুনিয়ন বোর্ডের হিসাব-নিকাশ

আয়

	১৯৩০-৩১	১৯৩২-৩৩ (হাজার)
পূর্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত টাকা	১৫,১৩,৫০০৲	১৬,৮৩·১
খোঁয়াড়ের আয়	২,০৭,৯০০৲	১·৭৮
ফেরিঘাট	১,১৮২৲	২·৮
য়ুনিয়ন রেট্	৬০,৬১,৭০০৲	৬৬,৪৬·০
চৌকিদারী চাকরান হইতে খাজনা	২,৩৯,৩০০৲	২,৩৬·৪
গবর্মেণ্ট জেলা বোর্ডের দান	৮,৩৭,১০০৲	৭,৫৮·৯
য়ুনিয়ন কোর্ট ও বেঞ্চ প্রভৃতি হইতে জরিমানা আদায়	৮,৬২,৫০০৲	৯,৯৭৪৲
মোট	৯৭,২৩,১৮২৲	১ কোটি ৮ হাজার

য়ুনিয়ন বোর্ডের ব্যয়

	১৯৩০-৩১	১৯৩২-৩৩
চৌকিদার, দফাদারের পোষাক, বেতন	৫৩,০২,৫৬৩৲	৫৬,১৪,০০০৲
ট্যাক্স আদায়ের খরচ	৪,০৮,৬৫৫৲	৪,৬৮,৭৯৯৲
পাউণ্ড	২,৭৬১৲	৭,২১৯৲
ফেরি	৩৩,৩৭৪৲	২,৭৫৪৲
রাস্তা নূতন	৩,৭৮,৯৭২৲	২,২০,৮৪৮৲
রাস্তা মেরামতি	২,০৯,৫৮০৲	৩,৮৯,৯৮৩৲
জল সরবরাহ	৫,৯৮,৩৮৫৲	৪,৮৯,৩০০৲
জল মেরামতি	৭৪,৯৬৫৲	৬০,৬৩৫৲
ড্রেন নূতন	৪৭,৩২৪৲	৩৮,৩২০৲
ড্রেন মেরামতি	৩১,১৫২৲	৩০,৫১৬৲
মেথরাদি	৫৭,৫৯১৲	৬৩,০৯৮৲
স্বাস্থ্য বিষয়ক	১,১১,১৩২৲	১,২৫,৭৩৯৲
পাঠশালা	৩,৩৭,১৭১৲	৩,৪১,২৬৬৲
ডিসপেন্সারি	১,২৬,০৬২৲	১,২৬,১২২৲
য়ুনিয়ন বেঞ্চ	১৬,৮৩৫৲	১৮,৭৭৩৲
য়ুনিয়ন কোর্ট	৩৩,৮৫৯৲	৬৫,৪৮৯৲
অন্যান্য	২৮,১৫৮৲	২৩,৩৮৪৲
অগ্রিম	২,০৭,৮৭১৲	১,৬০,৭৪৯৲
সুদ ও আসল	২,৫৩,৯৪৩৲	২,৯৩,৫৮৬৲
বিবিধ	২,৯৭,৮৪৩৲	৩,২৬,২০১৲
মোট	৮৫,১৮,৪৯৪৲	৮৮,৬১,৬২১৲
উদ্বৃত্ত	১২,০৫,০১৭৲	১১,৪৭,০৭৫৲
মোট	৯৭,২৩,৫১১৲	১,০০,০৮,৬৯৭৲

১৯৩২-৩৩ সালে আয় ১ কোটি ৮ হাজার ; ব্যয় ৮৮ লক্ষ ৬১ হাজার ; উদ্বৃত্ত ১১ লক্ষ ৪৭ হাজার।

য়ুনিয়ন বোর্ডের কাঠামো—(১৯৩২-৩৩) ৪০,১২০ বর্গ মাইলে য়ুনিয়ন বোর্ড আছে; ৩,৮২,২৯,০০০ লোক বোর্ডের অধীন বাস করে। ৫৭,১২,৩৭০ জন লোক রেট্ বা ট্যাক্স দেয়। ২৫,৭০,০০০ জন লোক মাত্র ভোট দিবার অধিকারী। য়ুনিয়ন বোর্ডের কার্যকরী সভার ৪১,৯২১ জন সদস্য; ইহার মধ্যে সরকারী কর্মচারী ২৭৮ জন মাত্র;

বেসরকারী সদস্য	৩৯,৫৬০ জন
হিন্দু সদস্য	১৮,৫২৭ ,,
মুসলমান সদস্য	২৩,১৯৯ ,,
অন্যান্য	১৯৫ ,,

য়ুনিয়ন বোর্ডের সংখ্যা ১৯৩১-৩২ সালে ৪৫৬৯ ছিল।

মেদিনীপুর ছাড়া ২৫টি জেলায় য়ুনিয়ন বোর্ড প্রথা আছে।

জেলা বোর্ডের আয়

	১৯১১-১২	১৯২১-২২	১৯৩১-৩২
১। ভূমিকর	২৮৭	২২,১৮৪	৯,৮১৯
৬। লোকাল ট্যাক্স	২৯,১৬,৫৬২	৭০,২০,৬৯১	৭৫,৮০,০২৯
১২। সুদ	১৭,১৫০	৪৬,৪৫৪	১,১৮,২৭৪
১৬ ক। আইন ও বিচার	২,১৬৩	৩,৬৮৫	৩২,২১২
১৭। পুলিশ, পাউণ্ড ইত্যাদি	৩,৬২,৪৭৪	২,৬৮,৽০৮	১,৯৮,৬৮১
১৯। শিক্ষা স্কুলফী		১৬,৭১৪	৩৯,৭২১
,, সরকারী ও অন্যান্য দান		১৬,৪৩,১৯৬	২১,৩১,৩৪৮
,, বিবিধ		২৬,১২৯	২০,২১৩
শিক্ষা মোট	৭,২২,২৬২	১৭,১২,৮১৬	২১,৯১,২৮২
২০। চিকিৎসা বিভাগ	৬১,৬৫৯	১,৪৭,৫২৯	১৫,৩২,৮৪৪
(সরকারী দান)		(৩৭,১৭৮)	(১৩,৬৮,৩৫০)
২১। বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য মেলা, পশু চিকিৎসা	১৫,৪৫১	২৪,৭৫৪	২৫,৯১৩

	১৯১১-১২	১৯২১-২২	১৯৩১-৩২
২৩। ষ্টেশনারী প্রিন্টিং	১,৯২৮	৯৮২	৬,৬৯০
২৫। বিবিধ	২,৮৫,৪৫০	৩,০৬,৬২৯	৩,২৫,০৩৫
২৬। রেলওয়ে	৪৬,৩০২	৭৮,৮৬২	৪৫,২৭৩
৩০। খাল	২২,৭৭৩	১,৫৪০	২৬,৩২৪
৩১। পূর্তকার্য	১৫,৪৭,৫৮৮	১২,১৬,৩২২	১৬,৩৭,৬০৩
মোট আয়	৬০,০১,০৪৯	১,০৮,৬৬,৫১৮	১,৩৮,২৪,৯৯৪
ধারগচ্ছিত	৭,২৭,৭০৩	৭,৮৭,৭২৫	১০,০৯,৩৪৭
গত বৎসরের উদ্বৃত্ত	২৩,৪৬,৬৩৫	৩৪,৭১,৬৪০	৩০,৭৮,৯৯৯
মোট	৯০,৭৬,৩৮৯	১,৫১,২৫,৮৯২	১,৭৯,১২,৩৪০

জেলা বোর্ডের ব্যয়

	১৯১১-১২	১৯২১-২২	১৯৩১-৩২
১। রিফাণ্ড বা ফেরৎ জমা	...	৮১৫	৩০
৮। ভূমি রাজস্ব	...	৫৬৯	৩৩৫
১৩। সুদ	...	১,২৪,৩৮৫	১,১৩,৪৮১
১৮। শাসন ব্যবস্থা	২,০৮,৬৬৬	৪,৬০,৭৮৪	৬,৯৬,৯১৯
১৯ ক। আইন, বিচার	১৯৫৭	৮,৮৯৭	২২,৭৫৭
২০। (পুলিশ) পাউণ্ড ইত্যাদি	২৩,৫৮৬	১৯,০২০	২২,৩২৫
২১। পোর্ট ও পাইল্ট	১৫,৪২৭	৭,৩৭৪	১,৭১০
২২। শিক্ষা	১৪,৫২,২৫৬	২৮,৪২,৬৭৩	৩৬,৭৬,৭৯৭
২৪। চিকিৎসা	৩,৫২,৮০১	১৩,৬৭,৭৩২	৩৪,৪৭,৭৩৫
২৬। পশুচিকিৎসা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক ব্যাপার	৬৪,৫২০	২,০৫,৩৪৭	২,৩৫,২৫১
২৯। পেনশন	৫১,১৫৮	৯৭,০০৭	২,০৫,৪২
৩০। ষ্টেশনারী, প্রিন্টিং	২৮,০০১	৫৩,৮৬৩	৪২,৬৮২
৩২। বিবিধ	৩০,৭৭৩	৭৬,২৮৯	১,৪৩,৯৬

	১৯১১-১২	১৯২১-২২	১৯৩১-৩২
৩৩। দুর্ভিক্ষ নিবারণ	...	২০,০৭৫	১,৩১,১৬০
স্থানীয় খালের চার্জ ও ছোট ছোট কাজ	১,০৮,৪১৫	৯৭,০৯৯	৯,৩৯৪
৪৫। পূর্তকার্য	৩৭,৩৭,২৩৪	৫৫,৯৩,৬৬	৫১,৫৪,৯০৯
চলতি আয়ের উপর মোট ব্যয়	৬০,৭৪,৭৯৪	১,০৯,৭৫,৫৯৫	১,৩৯,০৪,৮৯৪
ধার শোধ	৫,৪৮,০৬৩	১১,২৭,৪৬১	১০,২৪,৩৩৩
ডিপজিট ইত্যাদি	৬৬,২২,৮৫৭		
মোট খরচ	...	১,২৩,০৩,০৫৬	১,৪৯,২৯,২২৭

চিকিৎসালয়

	জেলা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত	খরচ	জেলা বোর্ড সাহায্য লাভ করে	টাকা	গড়ে ডিস্পেন্সারী প্রতি দান
১৯২১	৩২২	৬,১৯,৭৫৮	২৪৯	২,৮২,০৯৭	১৫৭৯৲
১৯৩১	৫৮৪	১০,০২,৪৭৭	৩৮৪	৪,০৪,৭১৫	১৪৫৪৲

	মোট ডিসপেন্সারী	জেলা বোর্ডের মোট ব্যয়
১৯২১	৫৭১	৯,০১,৮৫৫
১৯৩১	৯৬৮	১৪,০৭,১৯২

বাঙলাদেশে রাস্তা

	পাকারাস্তা	কাঁচারাস্তা	গ্রামের রাস্তা	
১৯২১	১,১০৬	১৪,২৭৯	১৬,৮৪৫	মাইল
১৯৩১	২,৫৮৯	১৬,৩৪৩	২০,১৭৩	মাইল

মাথাপিছু কর

	১৯২১-২২	১৯৩১-৩২
উদ্বৃত্ত বাদে	৵৮ পাই	৵৭ পাই

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ

ম্যুন্সিপালটি

গত পরিচ্ছেদে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের ইতিহাস বলিবার সময় আমরা ম্যুন্সিপালটির উৎপত্তির কথা বলিয়াছি। কলিকাতাতে প্রথম ম্যুন্সিপালটি স্থাপিত হয়। কলিকাতা ছাড়া বাঙলাদেশে ১১৭টি ম্যুন্সিপালটি আছে। গত শতাব্দীতে অধিকাংশ ম্যুন্সিপালটি স্থাপিত হয়; ১৯১১ সালে ১১১, ১৯২১ সালে ১১৬, ১৯৩১ সালে ১১৭টি ছিল। বর্তমানে সকল বড় শহরে ম্যুন্সিপালটি নাই, যেমন বোলপুর ও রামপুরহাটের মত শহর; আবার পুরাণো ক্ষয়িষ্ণু গ্রাম বা শহরে ম্যুন্সিপালটি আছে—যেমন চাকদহ, বাজিতপুর, গোবরডাঙ্গা।

বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগে ৭৬টি ম্যুন্সিপালটি আছে, ইহার মধ্যে বর্ধমান বিভাগে ২৮টি, প্রেসিডেন্সীতে ৪৮টি, নদীয়ায় ৯টি, হুগলী, মৈমনসিংহে ৮টি করিয়া, ঢাকা, রাজসাহী, পাবনা, বগুড়া, দার্জিলিং ও রঙপুর প্রভৃতিতে ২টি করিয়া, নোয়াখালি, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও বীরভূমে ১টি করিয়া।

২৪পরগণাতেই ২৬টি এবং তাহার মধ্যে বারাকপুর মহকুমায় ১৫টি ম্যুন্সিপালটি আছে। বারাকপুরের অপর পারে শ্রীরামপুর মহকুমা; সেই মহকুমায় ৭টি ম্যুন্সিপালটি। মোটকথা, কলিকাতার কাছে গঙ্গার ধারে মিলমহলে সবথেকে বেশি ম্যুন্সিপাল শহর গড়িয়া উঠিয়াছে।

ম্যুন্সিপালটি পরিচালনার ভার স্থানীয় একটি সমিতির উপর ন্যস্ত। এই সমিতির সদস্যগণ য়ুনিয়ন বোর্ডের ন্যায় বিভিন্ন ওয়ার্ডের ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত হন। সদস্যের সংখ্যা ৯ হইতে ১৮ পর্যন্ত হয়। বর্তমানে প্রায় সকল ম্যুন্সিপালটির সভাপতি বেসরকারী লোক।

ম্যুন্সিপালটির প্রধান কর্তব্য হইতেছে (১) শহরের রাস্তাঘাট, সেতু

নির্মাণ ও মেরামত, (২) রাস্তার আলোবাতি ও ধূলার সময় জল দেওয়া; (৩) শহরের ড্রেন সাফ করা, পায়খানা, নর্দামা পরিষ্কার, ময়লা ও আবর্জনা দূরে ফেলার ব্যবস্থা, (৪) সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বসন্ত ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি প্রতিষেধক ব্যবস্থা, যেমন টীকা দেওয়া; ভেজাল, অপরিষ্কার খাদ্য সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা; (৫) কোনো কোনো স্থানে ম্যুন্সিপালটি-পরিচালিত স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

জেলায় ম্যাজিস্ট্রেট্ ও বিভাগীয় কমিশনর সময়ে সময়ে ম্যুন্সিপালটির কার্যবিধি পরিদর্শন করিয়া থাকেন, প্রয়োজনমতে পরামর্শ দান করেন এবং অব্যবস্থা হইলে গবর্মেণ্টকে জানাইয়া হস্তক্ষেপ করিতেও পারেন।

য়ুনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্সের ন্যায় ম্যুন্সিপালটির মধ্যে বাস করিলে ট্যাক্স দিতে হয়। সম্পত্তির মূল্যের উপর শতকরা ৭৷৷০ টাকা হারে বার্ষিক কর ধার্য হয়; কলিকাতা, হাওড়া ও ঢাকায় উহা দশটাকা পর্যন্ত হইতে পারে। বাড়ীর ট্যাক্স ছাড়া পায়খানার জন্য, জলের জন্য পৃথক্ ট্যাক্স দিতে হয়। ১৯৩১-৩২ সালে ম্যুন্সিপালটির অধিবাসীরা গড়ে মাথাপিছু ৩/২ পাই কর দিত, ১৯২১-২২ সালে ২৮২ পাই। ইহার মধ্যে দার্জিলিঙে সবথেকে বেশি কর দিতে হয় ১৪৷৶১০ পাই, বাজিতপুরে সবথেকে কম, মাত্র ৷৵০ আনা।

১১৭টি ম্যুন্সিপালটির মধ্যে করদাতার সংখ্যা মাত্র ৩,৩৭,৩৮০; মোট বাসিন্দা ২২৷২৩ লক্ষ মাত্র। ১৯৩১-৩২ সালে সমস্ত ম্যুন্সিপালটিতে পূর্ব বৎসরের আয় ও আলোচ্য বর্ষের আয় মিলিয়া মোট আয় হয় ১,২২,৪০ হাজার টাকা; খরচ হয় ১,০৯,০০ হাজার; বৎসরান্তে ১৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। এই উদ্বৃত্ত টাকা সকলের হাতে সমান ছিল না; দার্জিলিঙের হাতে ছিল ২,৪৩,০০০ টাকা, আর বাজিতপুরের হাতে ১৬৲।

পাঁচকোটি লোকের মধ্যে ১৯৩০-৩১ সালে মাত্র ২২ লক্ষ (কলিকাতা ছাড়া) লোক ১১৭টি ম্যুন্সিপালটির মধ্যে বাস করিত। বিশ বৎসর পূর্বে বাস করিত ১৯ লক্ষ; বিশ বৎসরে ৩ লক্ষ লোক মাত্র ম্যুন্সিপালটিতে বাড়িয়াছে।

ম্যুনিসিপালটির আয় ও জন-সংখ্যা

	মোট আয় উদ্বৃত্ত সমেত	খাঁটি আয়	জন-সংখ্যা	মাথাপিছু কর
১৯১১	৯৩,২২,০০০	৫০,৯৯,০০০	১৯,৭৪,৬:৮*	১৮৵৮ পাই
১৯২১	১,১৪,৭৯,০০০	৭৭,১৭,০০০	২১,৬৪,১৭০†	২৮২
১৯৩০	১,৩২,৪১,০০০	৯৭,৯১,০০০	২০,১৪,২০৩‡	৩৷১০
১৯৩১	১,০৯,৮৯,০০০	৮৫,০১,০০০	২১,১৩,৯০৭	৩৶৯
১৯৩২	১,০২,৯৩,০০০	৮৯,৮৪,০০০	২৩,০২,৫৮৭	৩/২
১৯৩৩	৮৭,০৩,২০০	৮৪,৯২,০০০	২২,৯৪;৩০২	১৮৶১১

ম্যুনিসিপালটির ব্যয়

(লক্ষ টাকা)

	মোট ব্যয়	খাঁটি ব্যয়	শাসন কার্য	রক্ষা	স্বাস্থ্য ও পূর্ত্তকার্য	শিক্ষা	বিবিধ
১৯১১	১,১৪,৭৯,০০০	৭৮'৫৮	৬'১৩	৬'৫৭	৫৭'৭২	৩'৩৫	৪'৬৮
১৯২১	১,০৯;৮৯,০০০	৮৪'০০	৮'৩১	৭'২২	৫৭'৯৬	৫'১৫	৫'২৪
১৯৩১	১,২২,৩৭,০০০	৯৪'১৩	৮'১৭	৭'৫০	৬৮'৪২	৫'২৪	৫'২২
১৯৩২	১,১২,৯৮,০০০	৮৮'১৩	৮'১৩	৭'৪৬	৬২'৬৫	৫'০৩	৫'৯৩

---

* Bengal Administration Report, 1912-13, p. 38.

† Report on the working of Municipalities in Bengal, 1921-22, p. 16.

‡ Report on the working of Municipalities in Bengal, 1930-31, p. 14.

কলিকাতা কর্পোরেশন

ইংরেজ শহর হইতে আসিয়া শহরে বাস করে; তাই শহরের শাসনের দিকে সে সর্বাগ্রে দৃষ্টি দেয়। ১৬৯০ সালে কলিকাতার গ্রামে ইংরেজ কুঠি স্থাপন করে। তারপর ধীরে ধীরে সেই জায়গায় একটি শহর গড়িয়া উঠিল; এই শহর স্বতই যেমন খুশী তেমনিভাবে নির্মিত হইতে থাকে। ইহার ফলে প্রাচীন কলিকাতা স্বাস্থ্যের দিক হইতে অত্যন্ত কদর্য স্থান হইয়া উঠে। ১৬৯৬ সালে কলিকাতা ফোর্ট (পূর্বে অন্য জায়গায় ছিল) নির্মিত হয়। ১৭০০ সালে ফোর্ট বড় করা হয় ও ইহার নাম হয় ফোর্ট উইলিয়ম*। এই সালে বাঙলার ব্যবসা-বাণিজ্য পৃথক্ একজন গবর্ণরের উপর অর্পিত হয়; সেই হইতে ফোর্ট-উইলিয়মের গবর্ণরের উৎপত্তি।

১৭২৬ সালে ইংল্যাণ্ডের রাজার চার্টার বা সনদ লইয়া কলিকাতায় লণ্ডন ম্যুন্সিপালটির অনুকরণে মেয়র ও অলডারম্যানের পদ সৃষ্ট হয়; মেয়রের বিচার-সভা গঠিত হয়। ১৭৯৩ সালের সনদ গ্রহণের সময় সর্বপ্রথম প্রেসিডেন্সী শহরগুলিতে ম্যুন্সিপাল শাসনের ব্যবস্থা করিতে নির্দেশ থাকে। ১৮৪০ হইতে ১৮৫৩ সালের মধ্যে ম্যুন্সিপাল শাসনের মধ্যে নির্বাচন বিধি প্রবর্তিত হয়। ১৮৫৪ সালে বাঙলাদেশ ছোটলাটের তত্বাবধানে আসে ও কলিকাতার ম্যুন্সিপালটি একটি 'কর্পোরেট' সঙ্ঘের উপর ন্যস্ত হয়; এই সঙ্ঘ গবর্মেণ্টের তিনজন মনোনীত সদস্য ও বেতনভোগী কর্মচারী দ্বারা গঠিত। ১৮৬১ সালের ভারতীয় কাউন্সিলস্ এক্ট ভারতের সকলবিধ ব্যাপারের সংস্কার সাধন করে—ম্যুন্সিপালটি সম্বন্ধেও বটে। ইহার পর কলিকাতা ম্যুন্সিপালটি বা কর্পোরেশনের উন্নতির জন্য বহু আইন পর পর পাশ হইয়াছে।

কলিকাতার ম্যুন্সিপালটি বিশেষ আইন দ্বারা গঠিত, ইহাকে কর্পোরেশন বলে। ইহার শাসনপ্রণালী ও বিধি-ব্যবস্থা সাধারণ ম্যুন্সিপালটি হইতে পৃথক্। কলিকাতা পূর্বে ২৬টি ওয়ার্ডে, বর্তমানে ৩২টি ওয়ার্ডে বিভক্ত। একটি পরিচালক-সভা ম্যুন্সিপালটির সমস্ত কার্য পরিদর্শন করেন। এই সভার সদস্য-সংখ্যা ৯৬ জন। ইহার মধ্যে ৬৯ জন কমিশনর উক্ত বত্রিশটি ওয়ার্ডের করদাতাগণের দ্বারা নির্বাচিত হন।

* William and Mary তখন রাজারাণী। এই William of Orange-এর নামে ফোর্ট হয়। তিনি জাতিতে ওলন্দাজ ছিলেন; বিবাহসূত্রে রাজা হন।

৬ জন সদস্য বঙ্গীয় বণিক্ সঙ্ঘ (Bengal Chamber of Commerce), ৪ জন কলিকাতা ট্রেডস্ এসোসিয়েশন, ২ জন কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট, ১০ জন বাঙলা গবর্মেণ্ট হইতে মনোনীত হইয়া কর্পোরেশনের কাউন্সিলে আসেন। এই ৯১ জন ছাড়া আরও ৫ জনকে কাউন্সিলাররা নির্বাচন করেন, ইঁহাদিগকে 'অলডারম্যান্' বলে। উপরিউক্ত নির্বাচিত ৬৯ জন সদস্যের মধ্যে ২১ জন কমিশনর মুসলমান হওয়া চাই। কমিশনরদের কার্যকাল তিন বৎসর। প্রতিবৎসর নির্বাচিত সদস্যেরা কর্পোরেশনের সভাপতি ও সহকারী সভাপতি নির্বাচন করেন; ইঁহাদের 'মেয়র' ও 'ডেপুটি মেয়র' বলে। কর্পোরেশনের নূতন আইন ১৯২৩ সালে পাশ হয়; সেই আইনানুযায়ী বর্তমান শাসনকাঠামো গঠিত; চিত্তরঞ্জন দাশ কর্পোরেশনের প্রথম 'মেয়র'। কর্পোরেশনের যাবতীয় কাজকর্ম দেখেন 'এক্‌জিকিউটিভ অফিসার'। ইনি কর্পোরেশনের নিযুক্ত কর্মচারী।

কলিকাতার আয় প্রায় ২½ কোটি টাকা; আয়-ব্যয় হিসাবে আসাম গবর্মেণ্টের সমান। বারো তেরো লাখ লোকের স্বাস্থ্য, আবাস, জল, আলো, খাদ্য, শিক্ষা প্রভৃতির তদারক করা সহজ কথা নয়। এইসব কাজ দেখিবার জন্য কাউন্সিলারদের ছোট ছোট স্থায়ী কমিটি আছে। স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টার ফলে পাঁচ বৎসরে শিশুমৃত্যুহার হাজার করা ৩৪৭ এর স্থলে ২৪১ হইয়াছে; সাধারণ মৃত্যুহার হাজারকরা ৩৩ হইতে ২৫এ কমিয়াছে। স্বাস্থ্যের জন্য প্রতি বৎসর ১৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। শিক্ষার জন্য ব্যয় হয় ১২ লক্ষ টাকার উপর; ২২৯টি অবৈতনিক বিদ্যালয় আছে; ছাত্র-ছাত্রী-সংখ্যা ৩০ হাজার; প্রায় হাজার শিক্ষক (৬২৪ পুঃ, ৩৬২ স্ত্রী) কর্পোরেশনের স্কুলে কাজ করেন। শিক্ষকদের শিক্ষা দিবার জন্যও একটি বিদ্যালয় আছে।

গত ষাট বৎসরে এই বিরাট নগরীর জন-সংখ্যা কিভাবে উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহা নিম্নের সংখ্যা হইতে স্পষ্ট হইবে—

			হ্রাস-বৃদ্ধি
জন-সংখ্যা	১৮৭২	৭,২১,৬২৪	
	১৮৮১	৬,৯৯,১৮২	−৩·১%
	১৮৯১	৭,৬৯,৮১৩	+১০·১%
	১৯০১	৯,৪৯,১৪৪	+২৩·৩%

বৎসর	জন-সংখ্যা	হ্রাস-বৃদ্ধি
১৯১১	১০,৪৩,৩০৭	+৯.৯%
১৯২১	১০,৭৭,২৬৪	+৩.২%
১৯৩১	১১,৯৬,৭৩৪	+১১.১%*

গত ৫০ বৎসরে (১৮৮১-১৯৩১) শতকরা ৬৮.৯% লোক বৃদ্ধি হইয়াছে।

কলিকাতায় পুরুষ ও নারী অধিবাসীর মধ্যে পার্থক্য বড়ই বেশি; ১৯৩১ সালের প্রায় ১২ লক্ষ লোকের মধ্যে ৮,১৪,৯৪৮ পুরুষ এবং ৩,৮১,৭৮৬ নারী।

ইহার কারণ কলিকাতা কর্ম, বাণিজ্য ও শিক্ষাক্ষেত্র; অধিকাংশ লোক তাঁহাদের স্ত্রী-পুত্র গ্রামে রাখিয়া কলিকাতায় কাজ করে। নানাস্থান হইতে কলেজে ছাত্র পড়িতে আসে। তাহাদের অধিকাংশই অবিবাহিত। পশ্চিমা শ্রমিক ও ওড়িয়া মিস্ত্রিরা পরিবার আনে না; এইসব কারণে পুরুষের সংখ্যা অধিক। ইহার ফলে, নানা সামাজিক, স্বাস্থ্য ও নৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে।

কলিকাতা, শহরতলী ও হাওড়া লইয়া জন-সংখ্যা ১৪,৮৫,৫৮২।* হাওড়ায় ১৮৮১ হইতে ১৯৩১ পর্যন্ত ৫০ বৎসরে জন-সংখ্যা শতকরা ৭২.৩% হারে বাড়িয়াছে।

প্রতিদিন কলিকাতায় ও হাওড়ায় ২৬,০০০ লোক ডেলি প্যাসেঞ্জার হিসাবে আসে যায়। ইহাদিগকে কলিকাতার অধিবাসী বলিয়া ধরা হয় না।

১৯৩১ সালে কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠে জন-সংখ্যার মধ্যে কোন ধর্মাবলম্বী কত লোক বাস করিত এবং কিভাবে তাহাদের বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা দেখানো গেল—

		১৯০১ হইতে ১৯৩১ পর্যন্ত বৃদ্ধি	সমগ্র সংখ্যার অনুপাত
হিন্দু	৮,৭১,৯৮৬	৩৫.৬%	৬৮.৭%
মুসলমান	৩,২৩,৬৩৩	৮.৭%	২৬%
খ্রীষ্টান	৪৮,৪৭৩	২৪.৬%	৪%

* ফোর্ট উইলিয়াম, পোর্ট, খাল লইয়া ১১,৯৬,৭৩৪। কলিকাতা, উপকণ্ঠ ও হাওড়া লইয়া ১৪,৮৫,৫৮২।

		১৯০১ হইতে ১৯৩১ পর্যন্ত বৃদ্ধি	সমগ্র সংখ্যার অনুপাত
শিখ	৪,৭১৩	২৮·৯%	
জৈন	৩,১৯৪	১৫৭%	
বৌদ্ধ	৩,১৭৮	৭·১%	
ইহুদী	১,৮৩০	৬·১%	১·৩%
চীনা	১,৬৬৩	৩০·২%	
পার্শী	১,১৯৯	৩০৬%	
আদিম	১,১৪০	...	

কলিকাতায় ১৯০১ সাল হইতে হিন্দুদের সংখ্যানুপাত বাড়িয়াছে, কিন্তু মুসলমানদের সংখ্যানুপাত কমিয়াছে ; হাওড়ায়ও সেইরূপ ঘটিয়াছে।

কলিকাতা ও উপকণ্ঠে ৩৩,৪০৮ জন য়ুরোপীয় ও এংলো-ইণ্ডিয়ান্ বাস করে। ইহারা বৃটীশ প্রজা। অন্যান্য য়ুরোপীয়ের সংখ্যা ১৬৭৫ ; ইহারা বৃটীশ প্রজা নহে। এইসব লোকের মধ্যে সৈন্য আছে, কর্মচারী আছে, ব্যবসায়ী আছে। স্থায়ী বাসিন্দা যে কত, তাহার সংখ্যা পাওয়া যায় না।

কলিকাতার উপকণ্ঠ ও হাওড়া লইয়া জন-সংখ্যা ১৪,৮৫,৫৮২। ইহাদের শিক্ষার অবস্থা নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে—

	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
হিন্দু	১০,৪৫,৫৯৯	৬,৮৮,১০৫	৩,৫৭,৪৯৫
লেখাপড়া জানা	৪,১৩,১৪১	৩,১১,৪২৮	১,০১,৭১৩
ইংরেজি জানা	১,৯১,৭৬৮	১,৬৭,৯৬২	২৩,৮০৬
মুসলমান	৩,৭১,৯১৯	২,৬৮,২৫৪	১,০৩,৬৬৫
লেখাপড়া জানা	১,০২,৯৪৩	৯০,৯০১	১২,০৪২
ইংরেজি জানা	৩১,৪৫৪	২৯,৮৫২	১,৬০২
খ্রীষ্টান	৫০,৯৯০	২৮,২১৭	২২,৭৭৩
লেখাপড়া জানা	৩৬,০১৩	২০,০৯৫	১৫,৯১৮
ইংরেজি জানা	৩২,৪৫১	১৭,৯৭৬	১৪,৪৭৫

পার্শীদের ১২৮৩ জনের মধ্যে ৭৫৬ জন লেখাপড়া জানে; ইংরেজি জানে ৭০২।

ব্রাহ্ম সমাজের লোক ১৫৫৪; পুরুষ ৮৮০, স্ত্রী ৬৭৪; ১২১৮ জন (পুঃ ৭১২, স্ত্রী ৫০৬) লেখাপড়া জানে।

দেশীয় খ্রীষ্টানদের মধ্যে ৭,৮৫৩ (পুঃ ৪৩২৭, স্ত্রী ৩৫২৬) জন লেখাপড়া জানে ইহার মধ্যে ৫,৮৩১ (পুঃ ৩১৯৫, স্ত্রী ২৬৩৬) ইংরেজি জানে।

কলিকাতার জন-সংখ্যা

১৭১০		১২,০০০	
১৭৫২	হলওয়েলের আন্দাজ	৪,০৯,০০০	
১৭৮২	ম্যাকইন্টিশের ,,	৫,০০,০০০	
১৭৮৯	গ্রাণ্ড্প্রির ,,	৬,০০,০০০	
১৮০০	পুলিশ কমিশনের ,,	৫,০০,০০০	
১৮০২	প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের ,,	৬,০০,০০০	
১৮১৪	স্যার ই. হাইডের ,,	৭,০০,০০০	
১৮১৫	ইষ্ট ইণ্ডিয়া গেজেটিয়ার	৫,০০,০০০	
১৮২১	এসেমার ,,	২,৩০,০০০	
১৮৩১	কাপ্তেন ষ্টীলের ,,	৪,১১,০০০	
১৮৩৭	কাপ্তেন বার্চ-এর ,,	২,৩০,০০০	
১৮৪০	সিম্-এর ,,	৩,৬১,০০০	
১৮৫০	প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের ,,	৪,১৩,০০০	
১৮৭২	প্রথম সেন্সাস ,,	৬,৩৩,০০০	উপকণ্ঠ বাদ
১৮৮১	দ্বিতীয় ,,	৬,১২,২০০	,,
১৮৯১	তৃতীয় ,,	৬,৮২,৩০০	,,
১৯০১	চতুর্থ ,,	৮,৪৭,৭৯৬	,,
১৯১৩	পঞ্চম ,,	৮,৯৬,০৬৭	,,
১৯২১	ষষ্ঠ ,,	৯,০৭,৮৫১	,,
১৯৩১	সপ্তম ,,	১১,৭৮,০৫৪	,,

কলিকাতার বর্গফল প্রায় ৪৫ বর্গ মাইল বা প্রায় ২৮,৭০০ একর। কলিকাতার মধ্যে বসতবাটীর সংখ্যা ৩,০৩,২৩১।

কর্পোরেশনের আয়-ব্যয়

(হাজার টাকা)

	আয়	ব্যয়
১৯০০-১৯০১	৫৩,৩৪	৫২,১৩
১৯১০-১৯১১	৮৬,৯৭	৮১,০৮
১৯২০-১৯২১	১,৫২,০৩	১,৬১,৬২
১৯৩০-১৯৩১	২,৪৫,০৪	২,৩৫,৬৩
১৯৩১-১৯৩২	২,৪৩,৫৫	২,৪৬,০৭

কলিকাতা সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য

কলিকাতায়	৩২.৯৬	মাইল
হাওড়ায়	৪.৭৫	,,

মোট ৩৭.৭০ মাইল ট্রাম লাইন আছে।

গঙ্গার উপর 'হাওড়ার পুল' ১৮৭৪ সালে খোলা হয়। উহা ১৫৩০ ফুট দীর্ঘ।

কশাইখানা (১৯৩২-৩৩)

শূকর	৯,৪৯০
মহিষ	১১,০৮১
গোরু	৯৯,৩৯২
বাছুর	৩,০২৮
ভেড়া	১,১৫,৮৭৩
ছাগল	১,৮৯,১২৯

বাতি

পথের জন্য গ্যাস আলো	১৮,৮৬৪
,, কেরোসিন আলো	৯৮৯
,, বিজলি বাতি	২,৮৮৮

ত্রিশ বৎসর পূর্বে মোট বাতির সংখ্যা ছিল ১১,০০০
দৈনিক পরিষ্কার জল প্রায় ৬ কোটি গ্যালন
,, ময়লা জল ,, ৫ ,, ,,
কলিকাতার তলায় ড্রেন ২৬০ মাইল

প্রতিদিন ১,১৭০ টন্ ময়লা কলিকাতা হইতে গাড়ী করিয়া ধাপার মাঠে ফেলা হয়। সেখানে শব্জীক্ষেত আছে।

কর্পোরেশনের নিজের বাজার আছে ৪টি; ইহার বাৎসরিক আয় ১২ লক্ষ টাকা।

পানীয় জলের জন্য টালার যে ট্যাঙ্ক আছে, তাহাতে ৯০ লক্ষ গ্যালন জল ধরে; শোনা যায়, পৃথিবীর মধ্যে ইহাই বৃহত্তম ট্যাঙ্ক।

কলিকাতায় ৪৪,৬১৫ মোটর গাড়ী, বাস ও লরী আছে। প্রাচ্যে এত গাড়ী আর কোথাও নাই।

কলিকাতা ম্যুন্সিপালটি ৩২টি ওয়ার্ডে বিভক্ত। পুলিশের ২৪টি থানা আছে এবং বন্দরে ২টি থানা আছে। ২৫টি দাতব্য চিকিৎসালয়, ৪৯টি উদ্যান আছে। ওয়ার্ডের মধ্যে সবচেয়ে বড় গার্ডেন্‌রীচ—৩৭১২ একর, সবচেয়ে ছোট বামনবস্তি, ১২৮ একর। জন-সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি মুচিপাড়া ওয়ার্ড ৮০,৬০৪ জন; জন-সংখ্যায় কম বামনবস্তি, মাত্র ২৬৭৯ জন। ঘনবসতি একর প্রতি কলুটোলা ওয়ার্ডে ২১৯ জন, ট্যাংরা ওয়ার্ডে মাত্র ১২ জন।

কলিকাতায় ৮,২২,৮৬১ জন লোক বাঙলা ভাষা বলে; হিন্দী বলে ৫,৩৫,০২৩। সুতরাং কলিকাতা যেমন বাঙালী জাতির প্রধান শহর, হিন্দীভাষীদের তেমনি প্রধান শহর; ভারতের আর কোন শহরে পাঁচলক্ষ লোক হিন্দী বলে না। কলিকাতা যেমন হিন্দুর প্রধান শহর, মুসলমানদেরও প্রধান শহর। খ্রীষ্টানদের ইহা দ্বিতীয় শহর, মাদ্রাজ খ্রীষ্টানদের প্রধান শহর। ওড়িয়াদের দ্বিতীয় শহর কলিকাতা। কলিকাতায় শতকরা ৫৪·৩% এবং হাওড়ায় ৫৩·৯% লোকের মাতৃভাষা বাঙলা; হিন্দী যথাক্রমে ৩৬·৩ ও ৪০·৪ জনের মাতৃভাষা।

কলিকাতায় কোন জাতের কত লোক বাস করে, তাহার তালিকা দেওয়া গেল—কায়স্থ (১,৬০ হাজার), ব্রাহ্মণ (১,৫৯), মাহিষ্য (৪৬', সুবর্ণবণিক্ (৩৩),

গোয়ালা (৩০.৭), রাজপুত (৩০.৬), চামার (২৪), তাঁতি (২০), বৈশ্য (১৭), বাহার (১৭), কলু (১৫), বৈষ্ণব (১৩), সদ্‌গোপ (১৩) নাপিত (১২), মুচি (১২.৯), সাহা (১১.৬), বোবা (১১.২), গন্ধবণিক্ (১০)।

মাড়োয়ারী ভাষা কত লোক বলে তাহা দ্বারা কলিকাতার মাড়োয়ারীর সংখ্যা, শক্তি ও প্রতিপত্তির ওজন বুঝা যায় না। কলিকাতায় প্রায় বিশ হাজার মাড়োয়ারী আছেন; ইঁহাদের অনেকে এখানে জন্মিয়াছেন। ইঁহাদের সমাজ পৃথক্। ইঁহাদের নিজেদের চারিটি হাইস্কুল আছে; তাহাতে বাঙলা পড়ানো হয় না; তাঁহাদের চতুষ্পাঠী, পাঠাগার ও দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। ইঁহাদের ৮।১০টি ব্যবসায়ী সঙ্ঘ আছে। ব্যবস্থাপক সভায় ইঁহাদের ব্যবসায়ী সঙ্ঘ বিশেষ সভ্য নির্বাচনের ক্ষমতা পাইয়াছেন। বাঙলাদেশের কাপড়ের ব্যবসায়, শেয়ার বাজার প্রভৃতি অনেক ব্যবসায়ই ইঁহাদের হাতে। ইঁহারা বাঙলাদেশ হইতে প্রতি বৎসর বহু কোটি টাকা উপার্জন করেন, কিন্তু বাঙলাদেশকে নিজের দেশ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই বলিয়া বাঙালীর সহানুভূতি হারাইতেছেন।

কলিকাতার পরিধি পূর্বের থেকে অনেক বড় হইয়াছে। সুতরাং কলিকাতার অনেকখানি শাসনবিষয়ে ২৪-পরগণার অন্তর্গত; ফোর্ট উইলিয়মের কলিকাতার শাসনব্যবস্থা পৃথক্। দুই হাজার টাকার উপরের দাবীদাওয়ার দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার হয় হাইকোর্টের অন্যতম জজের দ্বারা; মোট কথা, বড় বড় সকলপ্রকারের দেওয়ানী মামলা তিনিই করেন। এই অরিজিনাল মামলায় ব্যারিষ্টার ও এডভোকেটরা ওকালতী করিতে পারেন। দুই হাজার টাকার কম দাবীর মামলা হয় 'স্মল কজ কোর্টে'; সেখানে পাঁচজন জজ আছেন। এসব আদালত হাইকোর্টের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে।

বাড়তি-কলিকাতার বিচার হয় শিয়ালদহ ও আলিপুরে—মুন্সেফের আদালতে। তাঁহারা সব বিষয়ে ২৪-পরগণার জেলাজজের অধীন।

ফৌজদারী বিচার হয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটদের আদালতে। এ ছাড়া ম্যুন্সিপাল আইনভঙ্গের বিচারের জন্য অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট্ আছেন কয়েকজন। চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্ সকলের কর্তা।

হাইকোর্ট এইসব আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে আপীল শোনেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

জমি বন্দবস্ত ও রাজস্ব

রাজস্ব ছাড়া রাষ্ট্র চলিতে পারে না; এই রাজস্ব রাষ্ট্র বা গবর্মেণ্ট নানাভাবে সংগ্রহ করেন; এই অর্থের উদ্দেশ্য, সমগ্রভাবে দেশের রক্ষার ব্যবস্থা: দেশের শাসন ও শৃঙ্খলা, প্রজার শিক্ষা স্বাস্থ্য শিল্পোন্নতি বিষয়ে সহায়তা। প্রজা ব্যক্তিগত ও বিচ্ছিন্নভাবে যাহা করিতে অক্ষম, তাহাই প্রজার উদ্বৃত্ত অর্থসংগ্রহ হইতে সঙ্ঘবদ্ধভাবে রাষ্ট্র করিতে সমর্থ।

রাষ্ট্রের বিচিত্র ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রজার নিকট হইতে নানাভাবে অর্থ সংগ্রহ করা হয়; একই ব্যক্তি নানারূপে ও নানাভাবে রাজস্ব দিয়া থাকে। এইসব রাজস্বের মধ্যে কতকগুলি খাজনা, কতকগুলি শুল্ক, কতকগুলি ট্যাক্স। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন অর্থাৎ য়ুনিয়ন বোর্ড বা ম্যুন্সিপালটি, জেলা বোর্ড, প্রাদেশিক শাসন বিভাগ, ভারত গবর্মেণ্টের ব্যয়, ইংল্যাণ্ডে ইণ্ডিয়া অফিসাদির ব্যয় বহন করিবার জন্য এইসব অর্থের প্রয়োজন।

ভারতের বারআনি লোক চাষী, বাঙলায় তার থেকেও বেশি। সুতরাং জমির খাজনা রাষ্ট্রের একটা বড় রকম আয়। চিরকাল কৃষক তাহার উৎপন্নের অংশ রাজাকে দিয়াছে; রাজা তাহার পরিবর্তে দেশকে অশান্তি, আক্রমণ, ব্যাধি প্রভৃতির উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন; এক হিসাবে ইহা একটা সর্ত। হিন্দু রাজারা জমির ফশলের ⅙ অংশ সাধারণত লইতেন। মুসলমান যুগে শেরসাহ ও পরে আকবর জমির বন্দবস্ত একটা প্রণালীর মধ্যে আনেন। জমিদার বলিতে জমির খাজনা সংগ্রহর্তা বুঝাইত; জমির উপর তাঁহাদের কোনো স্বত্ব হইত না; জমির মালিক ছিল কৃষক, তাহার প্রভু ছিলেন রাজা। ইংরেজ আমল হইতে জমির মালিক হইলেন জমিদার;

জমির উপর হইতে প্রজার স্বত্ব গেল। ইংরেজ আমলে বহুকাল রাষ্ট্র জমিদারকেই চিনিতেন, প্রজার অধিকার, প্রজার সুবিধা-সুযোগকে বহুকাল পরে গবর্মেণ্ট স্বীকার করিয়াছেন।

১৭৬৫ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে-সম্রাট্ দ্বিতীয় শাহ্ আলমকে এলাহাবাদ ও কোরা জেলা অর্পণ করেন ও বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন। এই অনুগ্রহের বিনিময়ে বাদশাহের নিকট হইতে কোম্পানী বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ লাভ করেন। দেওয়ানের কাজ রাজস্ব সংগ্রহ। ১৭৭১ সাল পর্যন্ত কোম্পানী রাজস্ব সংগ্রহ সম্বন্ধে নিজে তেমন কোনো ব্যবস্থা করেন নাই। ইহার পরেও প্রায় কুড়ি বৎসর রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে কোনো সুব্যবস্থা হয় নাই; কখনো প্রাচীন জমিদার বা রাজস্ব আদায়কারীদের সহিত পাঁচবৎসরের ঠিকা, কখনো এক বৎসরের ঠিকায় জমিদারী বিলি করা হইত। ইহাতে প্রজাদের দুরবস্থার সীমা-পরিসীমা ছিল না; জমিদাররা ভীষণ পীড়ন করিয়া রাজস্ব আদায় করিতেন, অথচ কোম্পানী একটা স্থায়ী আয় সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারিতেন না। এ অবস্থায় ১৭৮৯ অব্দে দশসালা বন্দবস্ত করিবার জন্য বাঙলার আর্থিক অবস্থা ভাল করিয়া পর্যবেক্ষণ সুরু হয়; ১৭৯১ সালে রাজস্ব বিষয়ে জমিদারদের সহিত দশসালা বন্দবস্ত হইল। তৎকালীন বড়লাট লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ছিলেন ইংরেজ আভিজাত্য সম্প্রদায়ের লর্ড; তাঁহার ইচ্ছা হইল ইংরেজ লর্ডদের মত বাঙলায় একদল অভিজাত সম্প্রদায় গড়িয়া উঠে। সেই উদ্দেশ্যে তিনি চিরস্থায়ী বন্দবস্তের প্রস্তাব করিলেন ও বিলাতের ডিরেক্টারদের সহিত দুই বৎসর লেখালেখির পর ১৭৯৩ সালে জমিদারদের সহিত চিরস্থায়ী বন্দবস্ত করিলেন। তখন শ্রীহট্ট ও গোয়ালপাড়া বাঙলার মধ্যে ছিল। এই সময়ে রাজস্ব ধার্য হয় ২·৮৬ কোটি টাকা। অনুমান মোট আদায়ের শতকরা ৯০ ভাগ রাজস্ব হিসাবে জমিদারকে দিতে হইত। স্যর জন শোর অনুমান করিয়াছিলেন মোট উৎপন্ন শস্যের ৪৫ ভাগ গবর্মেণ্ট পাইতেন, ১৫ ভাগ জমিদার রাখিতেন ও ৪০ ভাগ রায়ত লইত। ১৭৯৩ সালের মোট খাজনা ধরা হয় ৩·১৪ কোটি; একশ' দশ বৎসর পরে ১৯০৩ সালে মোট খাজনার পরিমাণ ১৪ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা ছিল;

আর গবর্মেণ্টের রাজস্ব প্রাপ্তি হয় ২.৮৬ কোটি স্থানে ৩.২৩ কোটি; অর্থাৎ ১৯০৩ সালে মোট আদায় রাজস্বের শতকরা ২৪ ভাগ মাত্র গবর্মেণ্ট পাইতেন, ১৭৯৩ সালে পাইতেন ৯০ ভাগ। ১৯০৩ সাল হইতে বাঙলার আয়তন অনেক কমিয়া গিয়াছে; এখন তাহার রাজস্ব ৩ কোটির কিছু উপর। কিন্তু জমিদারদের আয় ধরা হয় সাড়ে ১৬ কোটি টাকা; সুতরাং এখন গবর্মেণ্ট পান মোট আদায়ের মাত্র ১৮ ভাগ; অর্থাৎ ১৭৯৩ সালে যেখানে গবর্মেণ্ট পাইতেন জমিদারদের আদায়ের শতকরা ৯০ ভাগ, একশ' চল্লিশ বৎসর পরে পান জমিদারদের আদায়ের ১৮ ভাগ, অর্থাৎ এক পঞ্চমাংশ মাত্র। শ্রীহট্ট ও গোয়ালপাড়া আসামের অন্তর্গত হওয়ায় (১৮৭৪ সালে) বাঙলা গবর্মেণ্ট চিরস্থায়ী বন্দবস্ত খাতে ৪½ লক্ষ টাকা বার্ষিক কম পাইতেছে।

১৭৯৩ সালের পর বাঙলায় যে-সব জায়গা অধিকৃত হইয়াছে, সেখানে আর চিরস্থায়ী বন্দবস্ত প্রসার লাভ করে নাই। দার্জিলিং জেলার নানা অংশ সিকিমের কাছ হইতে ১৮৩৫ ও ১৮৫০ সালে এবং ভুটানের কাছ হইতে ১৮৬৪ সালে পাওয়া যায়; পশ্চিম ডুয়ারস্‌ও ভুটানের কাছ হইতে আদায় করা হয় এই সময়ে। চট্টগ্রাম জেলায় রাজ্য বিস্তার ধীরে ধীরে হইয়াছে। এইসব জায়গায় গবর্মেণ্ট অস্থায়ী বন্দবস্ত করিয়াছেন; অর্থাৎ এখানকার রাজস্ব বৃদ্ধি প্রায় ৩০ বৎসর পর করা হয়।

কোম্পানীর নূতন ব্যবস্থায় নানাশ্রেণীর জমিদার হইলেন; প্রাচীন বীরভূম, বিষ্ণুপুর, ত্রিপুরা, কোচবিহারের রাজারাও জমিদার, আবার সাধারণ রাজস্ব আদায়কারী জমিদারও জমিদার; নূতন আইনের চোখে সকলেই সমান। খাজনা চিরস্থায়ী হইল বটে, কিন্তু তাহার আদায়-উশুল এতই কড়াকড়িভাবে হইতে লাগিল যে, প্রাচীন জমিদারশ্রেণী অল্পকাল মধ্যেই লোপ পাইল। যাঁহাদের নগদ টাকা ছিল তাঁহারাই পুরাতন জমিদারী কিনিয়া লইতে লাগিলেন; কারণ, তখন আসল আদায়ের প্রায় শতকরা ৯০% ভাগ রাজস্ব দিতে হইত।

কোম্পানী জমিদারদের সহিত চিরস্থায়ী বন্দবস্ত করিলেন বটে, কিন্তু মাটির সঙ্গে যাহার নিত্য সম্পর্ক, সেই চাষীর স্বার্থের প্রতি বহুকাল দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। কিন্তু বাঙলার প্রজা তখনও দুর্ধর্ষ; সহজে সে বশ

মানে না, এবং তাহাকে বশ মানাইবার কলকাঠিও জমিদারদের হাতে তখন যথেষ্ট ছিল না; ফলে অনাদায়ের দরুণ জমিদারী বিক্রয় হইয়া যাইতে লাগিল; নদীয়া, রাজসাহী, দিনাজপুর, বিষ্ণুপুরের রাজাদের বড় বড় জমিদারী সময়মত রাজস্ব দিতে না পারায় নিলামে বিক্রয় হইল; বীরভূমের প্রকাণ্ড জমিদারী একেবারে লোপ পাইল।

১৭৯৯ সালে লর্ড ওয়েলেসলি গবর্ণর-জেনারেল; যুদ্ধের খরচের জন্য টাকার দরকার; অথচ জমিদারদের এই দশা। তখন জমিদারদিগকে কৃষকের কাছ হইতে খাজনা আদায় করিবার জন্য প্রভূত শক্তি দান করা হইল। আদালতের সাহায্য ছাড়া প্রজার শস্য, গোরু-বাছুর, স্থাবর সম্পত্তি সমস্তই জমিদার ক্রোক করিতে পারিতেন। শুধু তাহাই নহে, কেহ যদি জমিদারের বিরুদ্ধে অত্যাচারের জন্য নালিশ করিয়া যথেষ্ট প্রমাণ দেখাইতে না পারিত, তাহা হইলে দেওয়ানী আদালতের সাহায্যে তাহার কাছে ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া দিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইল। মোট কথা, রাজস্ব আদায় হইতে লাগিল।

১৮২২ সালের এক রেগুলেশনে গবর্মেণ্ট জমিদারদের অত্যাচারের নিন্দা করিলেন ও বাকিখাজনার জন্য প্রজার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক দিবার পূর্বে তাহাকে নোটিশ দিবার ব্যবস্থা করিলেন; এই আইনে ভাল ভাল অনেক কথা ছিল। কিন্তু তবুও জমিদারের হাতে নানা আইনের এত অমোঘ অস্ত্র ছিল যে, রায়ত সম্পূর্ণরূপে তাঁহার করায়ত্ব থাকিত।

রায়তের দুঃখ কিয়ৎ পরিমাণে দূর হয় ১৮৫৯ সালের আইনের দ্বারা। ছেষট্টি বৎসর পরে সরকার এদিকে দৃষ্টি দিলেন। রাজস্ব অনাদায়ের দরুণ জমিদার বদল হইত; নূতন জমিদারের সহিত প্রজার একমাত্র সম্বন্ধ ছিল খাজনা আদায়। ১৮৫৯ সালের প্রজাসত্ব আইনানুসারে রায়তকে তিন ভাগে ভাগ করা হইল; (১) যাহারা চিরস্থায়ী বন্দবস্তের সময় হইতে কায়েমি খাজনা দিতেছে বা মকররী মৌরসী; (২) যাহারা বারো বৎসরের উপর জমি দখল করিয়া আছে বা দখলিস্বত্ববিশিষ্ট; (৩) যাহারা বারো বছরের কম জমি ভোগ করিতেছে বা দখলিস্বত্বশূন্য। প্রজার সহিত জমিদারের নিত্য বিবাদের প্রধান কারণ খাজনা বৃদ্ধি ও প্রজার সত্ব সম্বন্ধে জমিদারের তাচ্ছিল্য।

সেইজন্য জমিদার প্রজাকে প[ট্টা] ও প্রজা জমিদারকে কবুলতি দিয়া নিজ স্বত্ব স্থিরীকৃত করিবার অধিক[ার] লাভ করিল। বারো বছরের সত্ব অনেক সময়ে আদালতে প্রজার পক্ষে প্রমাণ করা কঠিন হইত; আবার বারো বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই জমিদার নূতন লোককে জমির বন্দবস্ত দিয়া দোষ খণ্ডাইয়া লইতে লাগিলেন। সুতরাং জমিদার-প্রজায় অশান্তির শেষ হইল না।

১৮৭১ সালে রোডসেস্ অর্থাৎ রাজস্বের উপর টাকায় একআনা অতিরিক্ত কর ধার্য হয়।

১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইনই বর্তমান যুগ পর্যন্ত চলিয়াছে। এই আইনানুসারে দেশাচার অনুযায়ী প্রজার দখলি স্বত্ব স্বীকার করা হইল; শস্যের জমির মূল্যবৃদ্ধিজনিত লাভের অংশ জমিদারের ন্যায্য পাওনা বলিয়া পরিগণিত হইল; আর প্রজা ও জমিদারের সম্বন্ধ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আইন লিপিবদ্ধ হইল। ইহারই ফলে Bengal Tenancy Act বিস্তারে লিখিত হয়। এই সময়ে প্রজাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়, প্রথম মধ্যস্বত্ববান্, দ্বিতীয় রায়ত, তৃতীয় কোরফা-রায়ত। মধ্যস্বত্ববান্ প্রজা রায়তের নিকট হইতে খাজনা আদায়ের অধিকার লাভ করে।

তেতাল্লিশ বৎসর পরে ১৯২৮ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন নূতন করিয়া লিখিত হয়। কিছুকাল হইতে মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার, প্রজার অধিকার লইয়া আলোচনা দেশময় চলিতেছিল। নূতন বিধি অনুসারে কোনো জমি হস্তান্তর হইলে জমিদারের সেলামী টাকা রেজিষ্টারী আপিসে দলিলাদি করিবার সময়ই দিবার নিয়ম হইয়াছে। পূর্বে এই সেলামী টাকা কত দিতে হইবে, তাহার কোনো স্থিরতা ছিল না; শতকরা ১০৲ টাকা হইতে পারিত, ৫০৲ টাকা হইলেও কোনো বাধা ছিল না; সেই টাকা না দিলে জমিদারের সেরেস্তাতে নূতন ক্রেতার নাম উঠিত না; বর্তমানে সেলামী শতকরা ২০৲ টাকায় ধার্য হইয়াছে। কিন্তু জমিদার যদি ইচ্ছা করেন দামের উপর শতকরা ১০৲ হারে টাকা বিক্রেতাকে দিয়া নিজে জমি খাস করিতে পারেন। নূতন আইনানুসারে নিজ জমিতে গাছ কাটিবার, পাকাবাড়ী নির্মাণ করিবার অধিকার প্রজা পাইয়াছে। স্থিতিবান্ প্রজাকে

উচ্ছেদ করা বর্তমানে কঠিন। পূর্ব হইতে প্রজার কতকগুলি অধিকার বাড়িয়াছে।

জমিদার ও রায়তের মধ্যে বহুশ্রেণী মধ্যস্বত্ববান্ প্রজা আছে। চিরস্থায়ী বন্দবস্ত করিয়া কোম্পানী জমিদারদের উপর রাজস্ব আদায় প্রভৃতির যাবতীয় দায় দিয়া বার্ষিক নির্দিষ্ট একটা আয়ের উপসত্বভোগ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। জমিদার দেখিলেন, তিনি তাঁহার জমিদারীর এক একটা অংশ এক একজনের হাতে সমর্পণ করিতে পারিলে বিনা কষ্টে মুনফাটা পাইবেন। এই ধরণের প্রথম মধ্যস্বত্ববান্‌কে পত্তনিদার বলে; ১৮১৯ সালের ৮ম রেগুলেশন অনুসারে ইহাদের অধিকার গবের্মণ্ট স্বীকার করিয়া লইলেন; কারণ, পত্তনিদার সময়মত জমিদারকে খাজনা না দিলে জমিদারও সরকারী খাজনা কলেক্টরীতে দিতে পারেন না; সেইজন্য উপরিউক্ত অষ্টম রেগুলেশন অনুসারে খাজনা অনাদায়ী থাকিলে জমিদার পত্তনিদারের পত্তনি কাড়িয়া লইতে পারিবেন স্থির হইল; সেইজন্য জমিদারী সেরেস্তায় 'অষ্টম করা' কথাটি প্রচলিত আছে।

পত্তনিদারের স্বত্ব চিরস্থায়ী, কিন্তু ইজারাদারের স্বত্ব অস্থায়ী। কিন্তু ইজারা দেওয়া এখানেই শেষ হইল না; পত্তনিদার বা ইজারাদার তাহার পত্তনি বা ইজারা-মহল আরও কয়েকজন দর-পত্তনিদারকে দিলেন। দর-পত্তনিদার পুনরায় সে-পত্তনিদারদের মধ্যে বন্দবস্ত করিয়া দিলেন; প্রত্যেকেই কিছু কিছু লাভ মাঝখানে পাইতেছেন। এইভাবে বহু মধ্যস্বত্ব সৃষ্ট হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দবস্তের পূর্ব হইতে কতকগুলি মৌজা লইয়া কয়েকটি তালুক এদেশে ছিল; তাহারা তালুকদার নামেই চলিল।

বাঙলার জেলায় জেলায় আচার-ভেদে এই প্রজাস্বত্ব নানা রূপ লইয়াছে; মধ্যস্বত্ব চরমে উঠিয়াছে বাখরগঞ্জে। এই জেলার কোনো কোনো স্থানে ১৮ দফা মধ্যসত্ব হইয়াছে! এই সব মধ্যস্বত্ববান্ প্রজারা পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করে; ক্রয়, বিক্রয়ের সম্পূর্ণ অধিকার ইহাদের আছে। রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি, মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে রায়তের অধিকার পূর্ব হইতে অনেক বাড়িয়াছে।

পূর্বে রাজা ও জমিদাররা নানা চাকরান দিতেন, যেমন বীরভূমের পশ্চিমে

পাহাড়ের 'ঘাট' আগ্‌লাইবার জন্য 'ঘাটোয়ার'দিগকে জমি চাকরান দেওয়া হইত; চৌকিদারী চাকরান ইত্যাদিও তদ্রূপ। সরকার সেসব জমি অনেকক্ষেত্রেই খাশ করিয়া লইয়াছেন। লাখরাজ জমি সরকার স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে ১৭৬৫ সালের পূর্বের সনদ দেখাইতে হইয়াছে। যাহারা স্বত্ব দেখাইতে পারে নাই, তাহাদের জমি সমস্তই খাশ করিয়া লওয়া হইয়াছে ও পুনরায় বিলি করা হইয়াছে।

বর্তমানে গবর্মেণ্ট সরকারী কাজের জন্য, সাধারণের উপকারের জন্য জমি 'একোয়ার' (Land Acquisition) করেন; সেসব জমির জন্য জমি সংগ্রহকারী একবারের মত টাকা জমিদারকে দিয়া দেন, পরে আর কোনো খাজনা দিতে হয় না; ইহা পরে লাখরাজের সামিল হয়।

জেমস রেনেল (১৭৬৪-৭৬) সর্বপ্রথম বাঙলাদেশের একটা সার্ভে করেন; তাঁহার তৈয়ারী মানচিত্র ও রিপোর্ট ছাপা হইয়াছিল; ইহাই বাঙলার প্রথম মানচিত্র বলা যাইতে পারে। তারপর চিরস্থায়ী বন্দবস্ত হইয়া যাইবার পর গবর্মেণ্টের জানা প্রয়োজন হইল, কোথায় কোন জমিদারী আছে,— কত খানি তার পরিধি, কোন কোন গ্রাম জমিদারীর অন্তর্গত। এইসব তথ্য জানিবার জন্য মোটামুটিভাবে সার্ভে হয়। কিন্তু ১৮৫১ সালের পূর্বে যেসব ম্যাপ হয়, সেগুলি তেমন হুসিয়ারি ভাবে করা হয় নাই। কিন্তু পরের ম্যাপগুলি অনেকটা ভাল; এই সব সার্ভে ম্যাপের মধ্যে সব থেকে বিখ্যাত হইতেছে রেভেন্থ সার্ভের ম্যাপ; ৪৩ বৎসর ধরিয়া এই কাজ চলে।

১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনানুসারে স্থির হয় যে, প্রজা ও জমিদারের স্বত্ব, জমিজমা, খাজনা প্রভৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করিয়া খতিয়ান (Record of rights) ও ১৬-ইঞ্চি-মাইল ম্যাপ করিয়া তাহাতে প্রত্যেকটি মাঠের প্ল্যান করিতে হইবে; ইহাকে বলে সেটেলমেণ্ট। ১৮৮৮ সাল হইতে একার্য আরম্ভ হইয়াছে। চট্টগ্রাম, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, জলপাইগুড়ি, মৈমনসিং, ঢাকা, মেদিনীপুর, নোয়াখালি, রাজসাহী, ত্রিপুরা, যশোহর, বাঁকুড়া, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূমের সেটেলমেণ্ট রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এসব জেলার প্রত্যেক প্রজার কাছে তাহার জমির ম্যাপ, পর্চা আছে; গবর্মেণ্ট ও জমিদারের কাছেও এইসব থাকে। সুতরাং এখন প্রত্যেক প্রজা ও

জমিদার নিজ নিজ অধিকার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ বলা যাইতে পারে। বর্তমানে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের এলাকায় যে দেশ আছে, তাহার শতকরা ৮৫% ভাগে এখন সেটলমেণ্ট শেষ হইয়াছে (৫৫,৬৬১ বর্গ মাইল)।

মাঝে নদীর ধার ও চর সার্ভে করিবার জন্য দিয়ারা সার্ভে বিভাগ খোলা হয়; কয়েকটি কাজ তাহারা করে; কিন্তু বর্তমানে উহাকে সেটেলমেণ্ট বিভাগের অন্তর্গত করা হইয়াছে। এই সেটেলমেণ্ট রিপোর্টগুলি হইতে বাঙলাদেশের চাষীদের যথার্থ অবস্থা কি, তাহার একটু আভাস পাওয়া যায়।

বাঙলাদেশের সমস্ত জমিই চিরস্থায়ী বন্দবস্তের অন্তর্গত নয়। ১৭৯৩-এর পর দার্জিলিঙ, ডুয়ার্স, চট্টগ্রাম পার্বত্য প্রদেশ ইংরেজ অধিকারে আসিয়াছে; সুতরাং সেসব দেশের জমি গবর্মেণ্টের খাস। যে-সব জমি নদীর চরে, নদীর মুখে দ্বীপে, সুন্দরবনে পাওয়া গিয়াছে সেগুলি খাসমহল; তৃতীয়ত, রাজস্ব প্রভৃতি অনাদায়ে গবর্মেণ্ট যে-সব জমিদারী স্বয়ং ক্রয় করিয়া লইয়াছেন, তাহাও খাসের অন্তর্গত। এ-সব জমির কতকগুলিতে সরকার অস্থায়ী বন্দবস্ত করিয়াছেন, উহার সংখ্যা ৪,৪৪৬। খাসমহলের সংখ্যা ৩১৮০, উহার আয় ৬০ লক্ষ টাকা। সুন্দরবনে ধীরে ধীরে অনেক লোক গিয়া বাস করিতেছে; বাখরগঞ্জ-সুন্দরবনে উপনিবেশের ২৬তম বৎসর ও ২৪ পরগণার সুন্দরবনে ১৮শ বৎসর চলিতেছে। গবর্মেণ্ট এ পর্যন্ত এই স্থানগুলিতে মনুষ্য বাসোপযোগী করার জন্য যথাক্রমে ২৭,৭৩,০০০৲ ও ৩৪,৭৪,০০০৲ টাকা ব্যয় করিয়াছেন; উভয় স্থান হইতে গবর্মেণ্টের ৭ লাখ টাকার উপর রাজস্ব আদায়।

গবর্মেণ্টকে ১৯৩২-৩৩ সালে ১১৩টি জমিদারীর অছিত্ব করিতে হইয়াছে; অধিকাংশ ক্ষেত্রে জমিদারগণ দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছেন, অথবা নিজেরা জমিদারী চালাইতে অপারগ; পাওনাদারের ও গবর্মেণ্টের মোটা টাকা তাঁহাদের কাছে পাওনা। এইসব জমিদারীর মোট দেনা ২,৮৬,৬৫,০০০৲ টাকা; এইসব জমিদারদের মোট খাজনা পাওনা ৪ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা (বকেয়া ২,৫১ লক্ষ ধরিয়া)। ইহার মধ্যে আর্থিক দুর্গতির জন্য মাত্র শতকরা ৩৪% আদায় হইয়াছিল। ১৯১১ সালে ৫৯টি, ১৯২১ সালে ৬৬টি, ১৯৩১ সালে ১০৬টি ও ১৯৩২-৩৩ সালে ১১৩টি জমিদারী 'ওয়ার্ড' এষ্টেট ভুক্ত হইয়াছিল।

গবর্মেণ্টের নিজ জমিদারী পরিচালনার খরচ পড়ে শতকরা ১০% র কম। (Bengal Ad. Report, 1932-33, p. 32-33).

রায়তের নিকট হইতে জমিদারের গোমস্তা বার্ষিক তিন বা চারি কিস্তিতে খাজনা আদায় করে; গোমস্তার তহুরী প্রজা দেয়। বাকি খাজনার সুদ টাকায় চারি আনা—গবর্মেণ্ট তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। জমিদারকে বৎসরে চার দিনে রাজস্ব স্থানীয় কলেক্টরীতে পাঠাইতে হয়; যথা— ২৮এ জুন, ২৮এ সেপ্টেম্বর, ১২ই জানুয়ারী, ২৮এ মার্চ। নির্দিষ্ট দিনে জেলার কলেক্টর সাহেবের অফিসে খাজনা জমা না হইলে জমিদারী লাটের নিলামে উঠে; এই আইনকে সূর্যাস্ত আইন বলে, কারণ সূর্যাস্তের পর খাজনা লওয়া হয় না। ইহার পর জরিমানা দিয়া খাজনা দেওয়া যায়, তবে তাহা কলেক্টর সাহেবের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। পূর্বের থেকে জমিদাররা এখন অনেক সময়নিষ্ঠ হইয়াছেন।

রাজস্ব বিষয়ে 'কলেক্টর' বা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব দায়ী; তিনি রাজস্ব বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনর সাহেবের অধীন। কমিশনর নিজ বিভাগের কাজ দেখেন; কিন্তু সমগ্র বাঙলাদেশের রাজস্ব ও ভূমি সংক্রান্ত সকল ব্যাপার 'রেভেন্যু বোর্ডের' উপর ন্যস্ত। এই বোর্ডে একজনমাত্র সভ্য সাধারণত থাকেন; এই বোর্ড কমিশনর ও কলেক্টরদের কার্য পরিচালনা ছাড়া জমি সংক্রান্ত সকল বিষয়েরই নিষ্পত্তি করেন, যেমন—নাবালকের সম্পত্তি রক্ষা, ঋণগ্রস্ত জমিদারদের সম্পত্তি তদারক, সরকারী খাস মহলের ব্যবস্থা; রাজস্ব অনাদায়ে জমিদারী বিক্রয়, জমিদারীর পার্টিশন প্রভৃতি কার্য এই বোর্ডের কর্তব্য।

জমি সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র, সেটেলমেণ্টের পরচা, ম্যাপ প্রভৃতি রাখিবার জন্য সরকারী প্রকাণ্ড অফিস আছে; ইহাকে Land Records বিভাগ বলে। রাজস্ব বিভাগের যাবতীয় তথ্যের সন্ধান এই অফিস দিয়া থাকেন।

বাঙলাদেশের মোট আয়তন ৮৫ হাজার বর্গ মাইল; ইহার মধ্যে ৭৭,৫২১ বর্গ মাইল খাস বৃটীশ; অবশিষ্ট দেশীয় রাজ্যের অন্তর্গত। কিন্তু ইহার সবটাই প্রজাবিলি হয় নাই; নদী আছে, বন আছে, সেসব বাদ।

নানা ধরণের জমিদারীর অন্তর্গত জমি হইতেছে ৬৯,৩৮৬ বর্গ মাইল; নানা-ধরণের জমিদারী বলিলাম, কারণ চিরস্থায়ী জমিদারী ছাড়া গবর্মেণ্টের খাস জমিদারী ও অস্থায়ী ধরণের জমিজমা অনেক আছে। পূর্বেই বলিয়াছি, চিরস্থায়ী বন্দবস্তের পর দার্জিলিঙ, জলপাইগুড়ি, ডুয়ার্স, চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশ ইংরেজের অধীন হইয়াছে; নানা জমিদারী বিক্রয় হওয়ায় গবর্মেণ্টের খাস হইয়াছে। গবর্মেণ্টের এই সব নূতন জমিদারীতে এবং কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন প্রযোজ্য নহে। এই আইন প্রযোজ্য ৬৫,৯৬০ বর্গ মাইলে।

সরকারী অস্থায়ী বন্দবস্ত জমির উপর চাহিদা ছিল ৩৩২ লক্ষ টাকা; গবর্মেণ্ট পাইয়াছিলেন ২৩'৪ লক্ষ।

১৯৩২-৩৩ সালের মোট দাবী ৩ কোটি ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দবস্তাধীন জমিদারীর নিকট হইতে দাবী ছিল ২,১৫,৫৩,১৩১ টাকা; এছাড়া ২৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা পূর্বের অনাদায়ী ছিল। কিন্তু এই ২ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকার মধ্যে মাত্র আদায় হয় ২ কোটি ৬ লক্ষ, অর্থাৎ ৮৪'৫% ভাগ মাত্র। পূর্বে প্রায় ৯৯% আদায় হইত।

এছাড়া সরকারী খাসমহল আছে; সেখান হইতে চাহিদা হইতেছে ১,১৬,১৬,৮৯৪ (ইহার মধ্যে ১৯৩২ সালের চাহিদা ৬৪ লক্ষ, পূর্বের পাওনা ৫২ লক্ষ)। কিন্তু আদায় হইয়াছে মাত্র ৪৬ লক্ষ, পাওনা থাকিয়া গেল ৬৮ লক্ষ।

গত কয়েক বৎসরের আর্থিক দুর্গতি হেতু বাঙলার রাজস্ব ও জমিদারের খাজনা নিয়মমত আদায় হইতে পারিতেছে না।

১৯৩২-৩৩ সালে বাঙলা সরকারের মোট দাবী ভূমিরাজস্ব বাবদ ছিল ৩'০৫ কোটি টাকা। কিন্তু পূর্ব বৎসরের অনাদায়ী রাজস্ব পাওনা ছিল ৮৭'৯৬ লক্ষ; মোট পাওনা হয় ৩'৯৩ কোটি। ইহার মধ্যে আদায় হয় ২'৭৬ কোটি, অর্থাৎ ১৯৩২-৩৩ অব্দের শেষে ১'১৫ কোটি টাকা তখনো পাওনা ছিল; মোট পাওনার মাত্র ৭০'৬৯% ভাগ আদায় হইয়াছিল। বকেয়া বাকির তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—

	মোট বকেয়া বাকি	মোট চাহিদার শতকরা আদায়	বার্ষিক চাহিদার শতকরা আদায়
১৯৩২-৩৩	৮৭,৯৬,২২১ টাকা	৭০'২৫	৯০'৪৯
১৯৩১-৩২	৫৯,৭৫,০০২ ,,	৭৫'৯১	৯০'৮৬
১৯৩০-৩১	৩৬,৪৩,৯০২ ,,	৮২'২৩	৯২'১৬
১৯২৯-৩০	২২,৬২,৪৪৭ ,,	৯০'০৮	৯৬'৮৮
১৯২৮-২৯	১৯,৮১,৬৫২ ,,	৯২'৮০	৯৮'৯৯
১৯২৭-২৮	১৬,১৫,৯৫৯ ,,	৯৩'৭৯	৯৮'৯৬
১৯২৬-২৭	১৪,৫৯,৫২৫ ,,	৯৪'৬৪	৯৯'৩৯
১৯২৫-২৬	১৫,৭৪,২২৪ ,,	৯৪'৮	১০০'১
১৯২৪-২৫	১৭,৬৬,০৬৩ ,,	৯৪'৫	১০০'৩
১৯২৩-২৪	১৮,৩২,৫০৩ ,,	৯৩'৯	৯৯'৮
১৯২২-২৩	১৮,৩০,৯৬০ ,,	৯৪'০৪	৯৯'৯
১৯২১-২২	১৬,১৮,৪৫০ ,,	৯৪'০৫	৯৯'৪
১৯১২-১৩		৯৬'২৬	১০০'০৩

উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে ১৯২৮-২৯ অব্দ পর্যন্ত বকেয় বাকি ১৪ হইতে ১৯ লাখের মধ্যে ছিল। তারপর হইতে বকেয়া হুহু করিয় বাড়িয়া চলিয়াছে; ১৯২৯-৩০ সালে ২২ লাখ ছিল, ১৯৩২-৩৩ সালে ৮ লক্ষ। কিন্তু এ বৎসরের পাওনা ও পূর্বের বকেয়াও শেষ হয় নাই সুতরাং ১৯৩৩-৩৪ সালে ভূমি রাজস্বের সরকারী পাওনা হইয়াছে ১,১৫,৯১,১০০ টাকা। ইহার ফলে জমিদারী সূর্যাস্ত আইনানুসারে নিলামে উঠিতেছে ১৯৩২-৩৩ সালে অনাদায়ের দায়ী হন ২৬,৭৫৫ জন, ও নিলামে চড়ে ১,৩৪ জনের জমিদারী। দশ বৎসর পূর্বে অনাদায়ের দায়ী ছিলেন ১৩,২৮২ নিলামে যায় ১,২৩৮টি জমিদারী।

রায়তের কাছ হইতে সার্টিফিকেটের সাহায্যে টাকা আদায়ের নিয়ম আছে ইহার ফলে ১৯২২-২৩ সালে ৬৮,৪৪৮ জনের উপর ডিক্রি হয়, ১৯৩২-৩ সালে হয় ১,৫৫,২৮০। অনেকেই শেষ কালে টাকা দেয়; কিন্তু পারে নাই শেষকালে জমি নিলামে যায় তাহাদের সংখ্যা ছিল ১৯২২-২৩ সালে ৪,১৩৪

১৯৩২-৩৩ সালে এই সংখ্যা উঠিয়াছে ১২,৮৩৪। এই চাষীদের অনেকেই বোধহয় ভূমিহীন দিন-মজুরের দলে ভর্তি হইয়াছে। ১৯২১ সাল হইতে ১৯৩৩ পর্যন্ত এই বারো বৎসরে বাঙলাদেশে ৫৭,৬০৩ জোত নিলামে গিয়াছে। প্রতিবৎসর বহুহাজার লোকের নামে সার্টিফিকেট বাহির করিতে সরকার বাধ্য হন, এবং শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেন যাহাতে কাহারো জমি নিলামে না যায়, উদ্ধারের আশা দূর না হইলে জমি বিক্রয় হয় না; চিরস্থায়ী জমিদারীর খাজনা বৃদ্ধি হয় না।

১৮৭১ সালে গবর্মেণ্ট রাস্তা ও অন্যান্য পূর্তকার্য করিবার জন্য একটা কর বা সেস্ জমিদারদের উপর ধার্য করেন। প্রাপ্য খাজনার উপর টাকায় এক আনা হইতেছে এই সেস্। সেসের দুই পয়সা দেন জমিদার, দুই পয়সা দেয় প্রজা। সেই সময়ে গবর্মেণ্ট জমিদারদের নিজ অংশের প্রাপ্য খাজনার একটা হিসাব প্রস্তুত করেন, সেই টাকা হইয়াছিল ৭,৭৬,৮৩,৫৯০৲ টাকা। সেই হইতে গবর্মেণ্ট এই সেস্-এর হিসাব করিবার জন্য জমিদারের আয় সম্বন্ধেও তথ্য ও হিসাব সংগ্রহ করিয়া রাখেন।

১৯৩২ সালে বাঙলার মোট খাজনা সকল শ্রেণীর প্রজার নিকট দাবী হয় ১৬,৫০,৩৫,৮৪০৲ অর্থাৎ ষাট বৎসরে জমিদারদের আয় ৮·৭৪ কোটি টাকা বাড়িয়াছে। জমিদারের আয়ের অনুপাতে সেস্ আদায় হয়, ১৯৩২ সালে বাঙলাদেশে ১,০১,৫৯৪টি জমিদারী ছিল, এছাড়া ৬১,৪১০টি নিষ্কর ভূমি হাট প্রভৃতি ছিল, শেষোক্ত মৌজা হইতে রাজস্ব পাওয়া যায় না, কিন্তু সেস্ ধরা হয়, সে সেস্ জমিদারকেই দিতে হয়। ১৯৩২-৩৩ সালে সেসের দাবী ছিল ৮৮,৭০,৮৭৩৲, পূর্বের পাওনা ছিল ৪৪লক্ষ ১৮ হাজার টাকা, মোট ১,৩২,৮৯ হাজার টাকা সেস্ বাবদ পাওনা হয়। কিন্তু জমিদারদের দুরবস্থা বলিয়া মাত্র ৭৬ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা আদায় হয়, এখনো বাকি প্রায় ৫৬ লক্ষ টাকা।

১৯২১-২২ সালে সেস্ ছিল ৭০·২০ লক্ষ টাকা; ১৯৩০-৩১ সালে ৭৬·৬৫ লক্ষ। ১৯৩২-৩৩ সালে ৮৮·৭০ লক্ষ টাকা। কিন্তু সেস্ আরও বাড়িতেছে। গত কয়েক বৎসর হইতে কয়েকটি জেলায় সেটেলমেণ্ট হইয়া যাওয়ায় এবং জমিব্যবস্থা সংক্রান্ত কাগজপত্রের সুব্যবস্থা হওয়ায় সেসের

নূতন মূল্য নিরূপণ (Re-valuation) হইতেছে। সকলপ্রকার বন্দবস্তী জমির সেস্ ধরিলে ১৯৩২-৩৩ সালে সেস্ হইবে ৯৩·৫ লক্ষ টাকা। (Land Revenue Administration, 1932-33, p. 19.)। রাজস্বদায়ী জমি ১,০৯,৭৬০ ; রাজস্ব-মুক্ত জমি ৩১,০৬৩ ও নিষ্কর ভূমি ২১,৩২৭টি। ৫৭,৯১,৩৬৪ জন রায়ত সেস্ দিত।

বাঙলার কৃষক ১৯৩১-৩২ সালে মোট খাজনা দেয় ১৬ কোটি ৫০ লক্ষ ; ইহার মধ্যে জমিদারের নিজস্ব ছিল ১৩,৪৫,০৬,০০০৲ টাকা ; অবশিষ্ট সরকারের প্রাপ্য ৩,০৫,২৮,০০০৲। এ ছাড়া ১৯৩২-৩৩ সালে সেলামী * ৩২,১৬,০০০৲ টাকা পান। বাঙলার কৃষক দিতেছে ১৬ কোটি, আর মাদ্রাজের কৃষক দিতেছে ৪ কোটি ৮৮ লক্ষ, বোম্বাই ৪ কোটি ৭৪ লক্ষ, আগ্রা-অযোধ্যা ৬ কোটি ৪৭ লক্ষ। জন-সংখ্যা বাঙলার পাঁচকোটি, মাদ্রাজের ৪ কোটি ৬৭ লক্ষ ; সংযুক্ত প্রদেশের ৪ কোটি ৮৪ লক্ষ।

চিরস্থায়ী বন্দবস্তের অধীন বাঙলার কৃষকের জমির উন্নতি বিধান হইয়াছে কি-না, তাহা দেখা দরকার ; জমিদারের দিক হইতে খাজনা আদায়ই যে প্রধান উদ্দেশ্য, তাহার প্রমাণ এত রকমের মধ্যস্বত্ব-সৃষ্টি। বাঙলা গবর্মেণ্ট ছাড়া প্রায় প্রত্যেক প্রদেশই খাল ও জলসেচনের জন্য কিছু টাকা ব্যয় করেন ; মাদ্রাজ ১২ কোটি, বোম্বাই ১৯ কোটি, আগ্রা-অযোধ্যা ২৩ কোটি, পাঞ্জাব ৩০।৩২ কোটি টাকা এ পর্যন্ত পয়ঃপ্রণালী খননে ব্যয় করিয়াছে, আর বাঙলা-দেশে ব্যয় হইয়াছে ৬৭ লক্ষ টাকা মাত্র।

এখন দেখা যাক্ বাঙলাদেশের চাষী অন্য প্রদেশের তুলনায় কম না বেশি খাজনা দেয় ; খাস বাঙলার জন-সংখ্যা ৫,০১ লক্ষ ; সমগ্র বৃটিশ বাঙলার মোট রাজস্ব ১৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। এই মোটা হিসাবে প্রত্যেক বাঙালীর মাথাপিছু জমিদারী খাজনা ৩।১০। মাথাপিছু না ধরিয়া পরিবার পিছু ধরা যাক ; প্রত্যেক পরিবারে গড়ে পাঁচজন করিয়া লোক আছে ধরিলে এক কোটি পরিবার হয় ; ও সেই এককোটি পরিবার সাড়ে ষোল কোটি টাকা খাজনা দেয় ; সে-হিসাবে প্রত্যেক গৃহস্থ ১৬॥০ করিয়া বার্ষিক খাজনা দিয়া থাকে।

---

* সেলামীর টাকার উপর জমিদারকে আয়কর দিতে হয়, জমিদারীর আয়ের উপর দিতে হয় না।

বোম্বাই-এর সঙ্গে তুলনা করা যাক। সেখানে রায়ত সরাসরি সরকারকে খাজনা দেয়। ২,০৬ লক্ষ লোক ৪ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা খাজনা দেয়। মাথাপিছু হিসাবে বোম্বাইতে খাজনা পড়ে ২।৴৬ পাই। কিন্তু সরকারী হিসাবে দেখানো হয় বাঙলা গবর্মেণ্ট যে রাজস্ব পান সেই ধরিয়া,—অর্থাৎ পাঁচ কোটি লোক তিন কোটি টাকা রাজস্ব দেয়, অর্থাৎ দশ আনারও কম! মোট কথা, বাঙলার চাষী ও গৃহস্থ যে অন্য প্রদেশ হইতে খাজনা কম দেয়, সে কথা সত্য নয়; তবে বাঙলা গবর্মেণ্ট সে পরিমাণ রাজস্ব পান না, যা অন্য প্রদেশ পাইয়া থাকে। অন্য প্রদেশের সহিত প্রধান তফাৎ এই যে, বাঙলায় গবর্মেণ্ট সমস্ত টাকা গ্রহণ করিতে পারেন না বলিয়া মধ্যস্বত্ব ও জমিদার প্রভৃতির হাতে কিছু টাকা উদ্বৃত্ত থাকে, অন্য প্রদেশে সেই একটি শ্রেণীর হাতে কিছুই থাকে না। তারা কেবলমাত্র তহশীলদার। কাহারো কাহারো মতে নয়া বাঙলার আর্থিক গোড়াপত্তন হইয়াছে বাঙালী জমিদারদের উদ্বৃত্ত ধন-সঞ্চয় হইতে। কিন্তু বোম্বাই ও গুজরাট যেখানে চিরস্থায়ী বন্দবস্তের ফলে একটি অবসরপ্রাপ্ত সম্প্রদায় গড়ে নাই, সেখানেই লোকে যথার্থ ধনোৎপাদন করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ একখানি পত্রে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমরা উদ্ধৃত করিয়া এই নিবন্ধ শেষ করিতেছি। তিনি লিখিতেছেন, "বাঙলার বল চাকরিতে ও জমিদারিতে এই জন্য তাহা বড় ম্লান। জমিদারির সম্পদ বদ্ধ জলের মত, তাহা কেবলি ব্যবহারে ক্ষীণ ও বিলাসে দূষিত হইয়া থাকে। তাহাতে মানুষের শক্তির বিকাশ দেখি না, তাহাতে ধনাগমের নব নব তরঙ্গলীলা নাই।" (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮৩৪ শকাব্দ, পৃঃ ৬৬)।

জমিদারীর আয়

	১৯১১-১২	
চিরস্থায়ী জমিদারী	৯১,২৯৬	২,১৬,২৫,০০০৲
খাসমহল	২,১৯৯	৩৮,৭৬,১৭১৲
অস্থায়ী বন্দবস্ত	২,৯০৬	১৪,৭১,১২২৲
সরকারী মোট ভূমিকর	...	২,৬৯,৫১,১৯২৲

	১৯২১-২২	
চিরস্থায়ী	৯২,৫০৮	২,১৭,২৮,০০০
খাস	২,৬৫১	৪৮,৭১,০০০
অস্থায়ী	৩,৮৮৬	১৮,৭৮,৩০০
সরকারী মোট ভূমিকর	...	২,৮৪,৬১,৪৯০

	১৯৩১-৩২	
চিরস্থায়ী [৫৯,৫১২ বর্গমাইল]	৯১,৯৩২	২,১৫,৫৬,৯২৫
খাস [৪৯৭২ ,,]	৩,০৫৮	৬২,৩০,৩০৪
অস্থায়ী [৩,৪৫৫ ,,]	৪,৪৫৩	২৫,৪৯,১৯৫
সরকারী মোট ভূমিকর	...	৩,০৩,৩৬,৫২৪

	১৯৩২-৩৩	
চিরস্থায়ী [বর্গমাইল ৫৯,৩৪০]	৯৩,৯৬৮	২,১৫,৫৩,১৩৯
খাস [,, ৫,১৭৫]	৩,১৮০	৬৪,১৫,৮১৯
অস্থায়ী [,, ৪,৮৭০]	৪,৪৪৬	২৫,৬০,০০০
সরকারী মোট ভূমিকর	...	৩,০৫,২৯,০০০

বাঙলার রাজস্ব ও সেস্

	গ্রোস্ রেণ্ট	রাজস্ব	আদায়	রেণ্টের শতকরা
	(হাজার টাকা)		সেস্	রাজস্ব
১৮৭১	৭৭,৬৮৩			
১৯১২-১৩	১১,২৫,২৭	২,৭০,৮৮	৬১,৩৫,৬৫৮	২৪·০৭
১৯১৬-১৭	১২,৪৯,৬০	২,৫০,০০	৭৭,৩৪,১৫২	২০·
১৯২০-২১	১৩,৫৮,৫৭	২,৭৮,৫৭	৮৩,৩১,৫৫৯	২০·৫
১৯২১-২২	১৮,০৫,৯৫	২,৮৪,৪৭	৮৬,৫০,৯৪০	২০·২
১৯২২-২৩	১৪,৪১,১৩	২,৯১,৬০	৮৯,৫৪,৭৬৬	২০·২
১৯২৩-২৪	১৪,৬৮-৩৯	২,৮৭,২৮	৯১,৭৯,৯৬৩	১৯·৬
১৯২৪-২৫	১৪,৭৫,৪৯	২,৮৮,৬০	৯৪,৪২,৫২০	১৯·৫

	গ্রোস্ রেণ্ট (হাজার টাকা)	রাজস্ব	আদায় সেস্	রেণ্টের শতকরা রাজস্ব
১৯২৫-২৬	১৪,৭৯,৭৭	২,৭৮,৮১	৯৫,৯৫,০৭৭	১৮·৫
১৯২৬-২৭	১৪,৭০,৬৯	২,৯০,৯৬	৯৬,৮৭,৬৫৩	১৯·৮
১৯২৭-২৮	১৫,১৯,২৭	২,৯৩,২০	৯৯,০৩,২৯৩	১৯·২
১৯২৮-২৯	১৪,৯৬,৮৪	২,৯৭,১০	১,০০,৮৪,৭৯০	১৯·৮
১৯২৯-৩০	১৫,১৫,৫৯	২,৯৯,৭৪	১,০৪,০১,৩৪১	১৯·৭
১৯৩০-৩১	১৫,৯৮,৭১	৩,০১,৬৩	১,১১,০১,৭৯৪	১৮·৮
১৯৩১-৩২	১৬,৩৩,৭৭	৩,০৩,২২	১,২৪,৫১,৫৩২	১৮·৫
১৯৩২-৩৩	১৬,৫০,৩৬	৩,০৫,১৬	১,৩৯,৪৩,৪৫৮	১৮·৪

রায়তের উপর সার্টিফিকেট

	সেন্স সার্টিফিকেট	সেল্	অনাদায়	জমিদারী সে
১৯৩২-৩৩	১,৫৫,২৮০	১২,৮৪৩	১৬,০৫৫	১,৩৪৪
১৯৩১-৩২	১,৪০,১৫৬	৮,৮০৭	১৯,৯২০	১,১৭৭
১৯৩০-৩১	৯,২৫,৫৫১	৬,৯৭০	১৬,১২২	১,৪২২
১৯২৯-৩০	৯৪,৩৪৪	৩,৭১৭	১৪,২০৫	১,৩৪২
১০২৮-২৯	৭৭,৫৫২	২,৯৮৭	১৭,১৮২	১,১১৫
১৯২৭-২৮	৭৭,৩৮৩	২,৯৪৬	১১,৫৬৮	১,০০১
১৯২৬-২৭	৭২,৬৩৮	২,৩৫৭	১০,৯৮০	৯২১
১৯২৫-২৬	৬৬,১৫২	২,৮০৩	১১,৪৮২	১,০২৩
১৯২৪-২৫	৮৩,৪৫১	৩,৩৪৯	১২,১৮১	১,১৬৩
১৯২৩-২৪	৮২,৭১৯	৩,৫৬৪	১২,০১৬	১,১৭১
১৯২২-২৩	৭৭,২৭৯	৪,১৩৪	১৫,২৮৩	১,২৩৮
১৯২১-২২	৬৮,৪৪৮	২,৯৪৬	১৪,৩৬৯	১,০৯৮
১৯২০-২১	৫৭,৪১৮	৪,৩১৩	১২,৪৬৬	১,০৯৭
১৯১৯-২০	৫৩,৫২২	৪,৩৫৭	১২,০৯৮	১,২২৪
১৯১৮-১৯	৬৩,২৩৫	৪,১৩৮	১৪,৭১৮	১,৩১৯
১৯১২-১৩			৯,৮৯৫	৯২০
১৯১১-১২	৪৩,৫৫৬		১০,৫৪৬	৮৭৮

সেল্ অনাদায়ে সেল্

সার্টিফিকেট

১৯৩২-৩৩	৫৫,৮১৮*	
১৯৩১ ৩২	৫২,৪৭২	
১৯৩০-৩১	৪৭,২৪১ ●	
১৯২৯-৩০	৪২,২১৮	
১৯২৮-২৯	৪৩,২২০	
১৯২৭-২৮	৪৪,৪০৪	৬৫৯
১৯২৬-২৭	৩৯,৭০৫	৬৬৮
১৯২৫-২৬	৪১,৭৭০	৭৬৭
১৯২৪-২৫	৪২,৬১৩	১০২৮
১৯২৩-২৪	৪৭,৭৩১	৯৬৫
১৩২২-২৩	৪২,৭০৭	৩৬৪
১৯২১-২২	৪৮,৪৫৯	১১৫৩
১৯১২-১৩	৫৪,১৯১	৮৬৩
১৯১১-১২	৫৪,৪৭৭	

* পূর্বের সেল্ লইয়া ৮১,৭০১ হয়। ইহার মধ্যে ৩৮,৬৮৯টির সেল্ হয় ; ৪৩,০১২ মুলতুবী।